লোকসাহিত্যে ঈশপ

ডঃ সুধীর করণ, এম. এ., ডি. ফিল

অশোক পুস্তকালয়
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬৪, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা—৯

প্রকাশক
শ্রীঅশোককুমার বারিক
৭৪, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ
স্বাধীনতা দিবস : ১৯৬০

মুদ্রাকর :
শ্রীপশুপতি কর্মকার
শ্রীমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৫।১এ কালিদাস সিংহ লেন
কলিকাতা—৯

লোককথা

পৃথিবীব সমস্ত আদিম সমাজে, লোককথার নায়ক হিসাবে মনুষ্যেতর প্রাণীর প্রাধান্য। পশুপাখি-সরীসৃপবিধৃত অরণ্য-প্রান্তর সেই কাহিনীর সাধারণ পটভূমি। মানুষের কল্পনাশক্তি তখনও তার ঘনিষ্ঠ পরিবেশ-প্রতিবেশ ছাড়িয়ে অলৌকিক হওয়ার দিকে পদক্ষেপ করেনি। অরণ্যের সঙ্গেই তখন মানুষের দৈনন্দিন সম্পর্ক; আরণ্যক প্রাণী তার ক্ষুন্নিবৃত্তির উপাদান; আরণ্যক প্রাণীই তার অপঘাত মৃত্যুর কারণ। অন্যদিকে, এই অরণ্যচারী প্রাণীকে বশীভূত করেই মানুষের গৃহস্থালীর সূত্রপাত। শুধু তাই নয়, মানুষের নানাবিধ জৈবপ্রবৃত্তি তখন পশুপ্রবৃত্তির কাছাকাছি বর্তমান; ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগেই মানুষের মনে যখন কাহিনীর উদ্ভব ঘটে, তখন সে কাহিনীর স্বাভাবিক নায়কত্ব আরোপিত হয়, সিংহ-ব্যাঘ্র-শৃগাল-বৃষ প্রভৃতি প্রাণীর উপর। এই সব আরণ্যক-কাহিনী রচনার অনেক পরে প্রাকৃতিক শক্তিকে অবলম্বন করে অলৌকিক কাহিনীর উদ্ভব ঘটে; এরও অনেক পরে কাহিনীর মধ্যে মানুষই নিজে নায়ক সেজে বসে। তখন সে আদিমতা থেকে অনেক বেশী এগিয়ে গেছে।

পৃথিবীর সর্বত্র—এখনও আদিম সমাজ যেখানে যত বেশী অপরিবর্তিত, সেখানে তত বেশী পশু-সম্পর্কিত লোককথার প্রচলন। অগ্রসরমান, পরিবর্তিত সমাজে এখনও এইসব কাহিনী শিশু মনোরঞ্জনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই সব কাহিনীর অনুকরণে এখনও কাহিনী-রচনা অব্যাহত; কিন্তু যে আদিম বিশ্বাসের উপর একদিন তার প্রতিষ্ঠা ছিল, বর্তমানে সেই বিশ্বাস বিলুপ্ত। শিশুমনে সেই বিশ্বাস কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই আশ্রয় খুঁজে পায়; তাই শিশু সাহিত্যই প্রাণী সম্পর্কিত লোককথার নির্ভর-ভূমি।

ইংরাজী animal tales-এর বাঙলা প্রতিশব্দ হিসাবে সাধারণতঃ উপকথা শব্দটি প্রচলিত। জীবকথা, পশুকথা, প্রাণীকথা প্রভৃতি শব্দ

প্রয়োগ ক'রে animal tales-এর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা যায় না। ভাষাতাত্ত্বিক অভিমতে উপকথা যদিও রূপকথার রূপান্তর, তবু উপকথা এবং রূপকথার জাতিভেদ ঘটে গেছে। উপকথা নিছক animal tales নয়, এবং উদারতার বিচারে উপকথা, লোককথারই (folktale) নামান্তর মাত্র। তবু লোককথা শব্দটিকে বিভিন্ন ধরণের লোককাহিনীর আশ্রয়স্থল হিসাবে ধরে উপকথাকে প্রাচীন লোককথা বলে ধরে নেওয়া যায়। কারণ, উপকথার মধ্যে মানুষের প্রাগৈতিহাসিক সমাজের এবং অরণ্য-নির্ভর সমাজের চিত্রই বেশী পরিমাণে পরিস্ফুট। সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওরাওঁদের উপকথা এবং পৃথিবীর সর্বত্র আদিম সংস্কৃতির ধারক যে কোন জাতির লোককথার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে, সে সব কাহিনীতে কাহিনীর প্রাথমিক স্তরের চিত্র অনেক বেশী। উপকথা শব্দটির মাধ্যমে আমরা এখনও আদ্যিকালের কাহিনীর আদিমতার সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারি। লোককথার বৃহত্তর ক্ষেত্রে উপকথাই প্রাথমিক স্তরের, তাই animal tales-এর সঙ্গে তার মিল অনেক। তবু একথা নিশ্চিতরূপেই বলা যায় যে animal tales এবং উপকথা যথার্থভাবে এক নয়। তাই শব্দদৈন্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য আমরা animal tales-এর বাঙলা প্রতিশব্দ 'আদি উপকথা' শব্দ গ্রহণ করতে পারি; কারণ, আরণ্যক প্রাণীই উপকথার আদি নায়ক।

Animal tale বা আদি উপকথাই লোককথার আদিতম ও প্রাচীনতম রূপ। জলচর-স্থলচর-খেচর প্রাণীরাই এই জাতীয় লোককথার মুখ্য চরিত্র। একমাত্র মানুষ নিজেই তাতে গৌণ।

বর্তমানকালে, এই জাতীয় কাহিনীকে চারটি প্রশস্ত ভাগে ভাগ করা যায়। পাশ্চাত্ত্য জগতের গবেষকগণই এই বর্গীকরণ করেছেন। এই চারটি বর্গের নাম :—সাধারণ আদি উপকথা (Simple animal tales); পুরাবৃত্তিক আদি-উপকথা (animal myth); নীতি-ধর্মী আদি উপকথা (fables) এবং পশু-পুরাণ (beast epic).

বলাবাহুল্য, এ ধরণের বর্গীকরণে সবাই বিশ্বাসী নন। অনেকে পুরাবৃত্তিক আদি উপকথাকে animal tales-এর বা আদি উপকথার

পর্যায়ভুক্ত করার বিরোধী। কারণ, সাধারণতঃ এগুলি মানুষের সামাজিক ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। পুরাবৃত্তিক আদি উপকথার প্রাণী-চরিত্র স্বভাব ধর্মে সাধারণ হ'লেও, তা'তে অসাধারণত্ব বর্তমান। ভারতীয় পুরাণে উল্লেখিত বাসুকী নাগ, গরুড়, হনুমান প্রভৃতির কাহিনী কিংবা দেবতাবাহন সিংহ, বৃষ, মহিষ প্রভৃতির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সাধারণ পশুর মত নয়। তবুও এই সব কাহিনীকে animal tales-এর পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে ; কারণ এগুলি সাধারণ আদি উপকথার (Simple animal tales-এর) পৌরাণিক রূপায়ণ মাত্র। যদিও Simple animal tales, এর অনেক পরবর্তী সংস্করণ। পশু-পাখীর সঙ্গে সাধারণ পরিচয়কে যখন আদিম অলৌকিক লোক-বিশ্বাস, কল্পনারঞ্জিত করে বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চাইল, তখনই পুরাবৃত্তিক আদি উপকথার জন্ম। পরবর্তীকালে মানুষের পৌরাণিক ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে অনায়াসে সংযুক্তি লাভ করে এগুলি পৌরাণিক কাহিনীর উদ্ভব ঘটায়।

নীতিধর্ম, আদি উপকথাও (fables) সাধারণ আদি উপকথার নৈতিক রূপায়ণ (ethical version) মাত্র। দেশভেদে, ফেব্‌ল্‌স্‌-এর প্রাণী চরিত্রগুলি কোথাও স্বাভাবিক আচরণে মনুষ্যেতর প্রাণীমাত্র, কোথাও তাদের চরিত্র মনুষ্য সমাজের বিশিষ্ট চরিত্রের অনুসারী। ঈশপের ফেব্‌ল্‌স্‌ এবং পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

পশু-নায়ক সম্পর্কিত পরম্পরাগত কাহিনী পশু-পুরাণ বা beast epic-এর উদ্ভাবক। পৃথিবীর সর্বত্র কোন কোন বিশেষ পশুকে অবলম্বন করে সংখ্যাহীন কাহিনী কালে কালে গ্রথিত হয়। সর্বত্র সেই বিশেষ পশুর নামোল্লেখ হয়তো থাকে না, কিন্তু তার স্বভাব চরিত্রগত কাহিনী অন্যান্য সব প্রাণীর কাহিনীকে অতিক্রম করে যায়। ভারতবর্ষে এবং প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে 'শৃগাল' এই নায়কত্বের অধিকার লাভ করেছে।

পাশ্চাত্য দেশের রেইনার্ড দি ফক্‌স্‌ (Reynard the fox)-এর কাহিনী beast epic-এর অন্যতম উদাহরণ। রাশিয়াতে এবং বাল্টিক উপসাগরীয় অঞ্চলেও এই ধরণের beast epic বর্তমান।

বলাবাহুল্য, beast epic, লোককথার জগতে কোন একটি বিশিষ্ট ধারা নয়,—সাধারণ আদি উপকথা বিস্তৃতি লাভ করতে করতে এক সময় বিশেষ একটি পশু-সম্পর্কিত সংখ্যাহীন কাহিনীকে পারম্পর্য রক্ষা করে গ্রথিত করেছে মাত্র।

Karı pe অনুমান করেন, "That the beast epic pre-supposes both the fable and the epic, and that the beast epic, the 'Reynard the fox' tales clearly in mind, is a bourgeois caricature of the aristocratic troubadourish epics themselves."

সাধারণ আদি উপকথায় বা Simple animal tales-এর মধ্যে মনুষ্যেতর প্রাণীর স্বভাব-চরিত্র এবং আচার-আচরণকে সহজভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। এই কাহিনীর নায়ক একান্তভাবেই animal আদিম গল্পকারগণ, এর মাধ্যমে পশুজগৎ সম্পর্কে তাঁদের সমষ্টিগত অভিজ্ঞতাকে কাহিনীব আকারে স্থাপন করেছেন। পশু-চরিত্র বিশ্লেষণের মূলে এ ক্ষেত্রে কোন উদ্দেশ্য প্রবণতা নেই। বিভিন্ন প্রাণীর হিংস্রতা, ভীরুতা, ধূর্ততা প্রভৃতি সম্পর্কেই এ সব কাহিনী রচিত। পশু-চবিত্রের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটেছে দিনের পর দিন ; সেই পরিচয়ের কথাই গল্পাকারে বর্ণিত হয়েছে। এই সব কাহিনী রূপকও নয়, নীতি-প্রচারের আধারও নয়। গল্পের খাতিরেই, পশুর মুখে মানবিক ভাষা সংযুক্ত করতে হয়েছে। তার মন পশুর নয়--মানুষের।

বলাবাহুল্য, শুধুমাত্র স্বভাব, চরিত্র, আচার-আচরণ প্রকাশ করার মধ্যে গল্পের plot থাকা সম্ভব নয়। 'সিংহ হিংস্র প্রাণী, সে অন্যান্য পশুদের হত্যা করে'—'এই সংবাদটি গল্প নয়, কিন্তু 'সিংহ পশুর রাজা' এই বাক্যের মধ্যে কাহিনীর প্রারম্ভিক উপাদান রক্ষিত। আদিম মানুষ তার প্রাত্যহিক অরণ্য-অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছিল যে, শৌর্যে-বীর্যে সাহসে-হিংসায়, সৌন্দর্যে অন্য যে কোন পশুর চেয়ে সিংহই শ্রেষ্ঠ। তাই কাহিনীতে তার স্বাভাবিক বাস্তব চরিত্রই গল্পের মুখ্য বস্তু হয়ে দেখা দিল এবং গল্পরসের আমন্ত্রণে অন্যান্য আরণ্যক প্রাণী তার চারদিকে এসে ভীড় জমাল।

বলা যেতে পারে যে, এই সব কাহিনীর উদ্ভাবকগণই আদি গল্পকার

এবং এই সব আদি উপকথাই পরে পৌরাণিকদের বিশ্বাসে, পশুকুলের অলৌকিক এবং অবাস্তব দেবত্বের নানা উপকরণ জুগিয়ে দেয়। পৌরাণিক দেবদেবীর বাহন সম্পর্কিত কাহিনীগুলি আমাদের এ ধারণার সমর্থন করে।

পৃথিবীর সর্বত্রই পশুপক্ষী সম্পর্কিত কতকগুলি আদি জিজ্ঞাসাও Simple animal tales-এর কুক্ষীভূক্ত, কিন্তু সেগুলি ক্রমশঃ animal myth-এর দিকে অগ্রসরমান। কাকের রং কালো কেন, বাদুড় দিবালোকে মুখ লুকিয়ে থাকে কেন, হাতীর পা গোদা কেন, প্রভৃতি প্রশ্নসূচক কাহিনীগুলিতে মানুষের ক্রমবিকশিত কল্পনার সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। এগুলি Simple animal tales ও animal myth-এর মাঝামাঝি পর্যায়ের কাহিনী এবং বাস্তবিক পক্ষে এগুলি animal myth-এর প্রাথমিক স্তরের কাহিনী।

পরবর্তীকালে সাহিত্যিক লোককথার (literary folktales) সঙ্গে সাধারণ আদি-উপকথার বা simple animal tales-এর সম্পর্কগত দূরত্ব পরিলক্ষিত হলেও এদের গোত্রগত সম্পর্ক আমাদের অবিদিত থাকে না। পঞ্চতন্ত্র, জাতক, হিতোপদেশ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে সাহিত্যধর্মী আদি-উপকথা বিশিষ্টতা লাভ করেছে এবং গ্রীসদেশে ঈশপের কাহিনীতে moral বা নীতি অংশ সাধারণ আদি উপকথার সঙ্গে সংযুক্তি লাভ করে নীতিধর্মী গল্পে পরিণত হয়েছে। এ সবই সাধারণ আদি-উপকথার সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করেছে।

সাধারণ আদি উপকথার মাধ্যমে অবসর বিনোদন করা হত। সারাদিনের পরিশ্রমের পর এসব কাহিনী শ্রম অপনোদনের উদ্দেশ্যে কথিত হত। এ কথার অর্থ অবশ্যই এ নয় যে, আদি গল্পকারগণ সজ্ঞানে মনোরঞ্জকের ভূমিকা গ্রহণ করতে গিয়ে এসব কাহিনীর উদ্ভাবন ঘটিয়েছেন। বলা যেতে পারে, এ সব কাহিনী, তাঁদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাকে, দৈনন্দিন বিস্ময়কে, অবসর সময়ে গোষ্ঠীর কাছে প্রকাশ করেছে মাত্র। সম্ভবতঃ এ কথাও বলা যেতে পারে, আরো প্রথমে এইসব কাহিনী আদিম যাদু প্রক্রিয়ার মন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সিংহ শিকারে যাবার পূর্বে সিংহের কাহিনী, কিংবা আরণ্যক প্রাণীকুলের কাহিনী বলে শিকারে শুভফল কামনা করা হয়ে থাকতে পারে।

ক্রমশঃ মনুষ্য সমাজ ও মনুষ্য চরিত্র পশু চরিত্রের উপর আরোপিত হয়ে পশুকুলকে নায়কত্ব দান করছে। শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়, পঞ্চতন্ত্র, জাতক প্রভৃতি গ্রন্থে পশু-পাখিরা মানুষের মতই বিশিষ্ট নামের এবং বিশিষ্ট চরিত্রের অধিকারী হয়ে Simple animal tales বা সাধারণ আদি উপকথাকে সাহিত্যিক লোককথার চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছে।

ফেবল

' The fable as fable, th: short animal tale pointed w ith a stated moral."

ফেব.ল-শব্দটির বাঙ.লা প্রতিশব্দ নেই। অ্যানিমেল টেল্‌স-এরও বাঙ.লা প্রতিশব্দ নেই। 'উপকথা' নামেই এই জাতীয় কাহিনীগুলি অভিহিত। অ্যানিমেল টেল্‌স্-কে যদি 'আদি-উপকথা'-য়, প্রতিশব্দিত করা যায়, তা'হলে ফেবল্-কে বলতে পারি- -'নীতিগর্ভ আদি-উপকথা।' বলা-বাহুল্য, ফেবল্, অ্যানিমেল টেল্‌স্ বা আদি-উপকথা নামক লোককথারই (folk tales-এর) অন্তর্গত। মনুষ্যেতর প্রাণী হচ্ছে এ'র মুখ্য •চরিত্র। কিন্তু ফেবল্‌গুলির চরিত্র বৈশিষ্ট্য একমাত্র মনুষ্যেতর প্রাণীর উপরই নির্ভর-শীল নয়। উদ্দেশ্যমূলকতাই এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। লোকরঞ্জন নয়, লোকশিক্ষাই এগুলির মৌলিক ধর্ম। উপকথা এখানে একান্তভাবে গৌণ, নীতিকথাই মুখ্য।

ঈশপের কাহিনীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় অল্প নয়। লক্ষ্য করা গেছে, কাহিনীর পরিশেষে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে একটি নীতিবাক্য সংযোজিত থাকে। এই নীতিবাক্যগুলি মূল গ্রীকে যে ভাবেই সংযুক্ত থাকুক না কেন, ইংরাজী অনুবাদের মাধ্যমে প্রায় প্রবাদবাক্য রূপে যে সব বাক্যাংশ আমরা লাভ করেছি,—সেগুলি হয়তো সম্পূর্ণরূপে সংযোজন· মাত্র। আঙর বড় টক, পর্বতের মূষিক প্রসব, একতাই বল, প্রভৃতি বাক্যগুলি এক একটি সংক্ষেপিত কাহিনীর সংক্ষেপিত নির্যাস-বাক্য মাত্র। ঈশপ যখন এ সব কাহিনী বলতেন, তখন কাহিনীর 'মর‍্যাল অংশটুকু প্রকাশ করার জন্যই বলতেন ; তা'তে কাহিনী গৌণ। 'নীতিবাক্য'গুলি সংযোজিত হয়েছে বলেই—অনুমান করা যেতে পারে। সংকলকগণই মুখ্যতঃ পররর্তী-কালে এর প্রয়োগকর্তা।

ফেব্‌ল্ বা নীতিগর্ভ আদি-উপকথার চরিত্রগুলি মনুষ্যেতর বাস্তব জগতের প্রাণী। দৈত্য-দানব, হুরী-পরী, রাক্ষস-খোক্কশ, ভূতপ্রেত প্রভৃতি ঐ সব কাহিনীর উপজীব্য নয়। ঈশপের কাহিনীতে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে,—সিংহ, শৃগাল, মূষিক, গর্দভ, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি প্রাণীদের আচার-আচরণ স্বজাতিক বৈশিষ্ট্যকে অতিক্রম করেনি। তাদের মুখের ভাষাই শুধু মানবিক, কিন্তু চরিত্রধর্মে তারা বন্যপ্রাণী বা গৃহপালিত প্রাণী মাত্র। পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশ-জাতক প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় কাহিনী-গ্রন্থের মধ্যে যে-সব পশু-পক্ষী বর্তমান,—তাদের চরিত্র কিন্তু প্রায়শঃই মনুষ্যচরিত্রের ও মনুষ্যসমাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ভাষায়, আচার-আচরণে তাদের পশুত্ব বা অনুরূপ স্বধর্ম, গৌণ হয়ে গেছে।

ঈশপের গল্পে, প্রাণীদের স্বভাবধর্মই মুখ্য ; তবে কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের মনুষ্যবৎ আচরণ করতে দেখা গেছে ; এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে মনুষ্য-সমাজকে ব্যঙ্গ করাই তাদের উদ্দেশ্য বলে মনে হতে পারে। সম্ভবতঃ এ সব গল্পে ভারতীয় প্রভাব বেশী পরিমাণেই পড়েছে।

ফেব্‌ল্-এর বাহ্যিক রূপটি লোককথার ; কিন্তু লোককথার সাজসজ্জায় বহির্জগতে প্রকাশিত হলেও, তার প্রাণস্পন্দনে লোককথার বৈশিষ্ট্য নেই। সাজসজ্জার আড়ালে, বাহ্যিক চেহারার অন্তরালে যে সত্তাটি বর্তমান, তা হচ্ছে নীতির। বুদ্ধিদীপ্ত 'উইট'—তার সঙ্গী--যার পরিণাম প্রবাদবাক্যে বিধৃত।

যাকে আমরা নিছক অ্যানিমেল টেলস্ নামে অভিহিত করি, তার উদ্দেশ্য—গল্পকথন ছাড়া আর কিছু নয় এবং তাতে অকৃত্রিম লোককথার বিশিষ্টতা খুঁজে পাওয়া যায়। মনুষ্যসমাজ সম্পর্কে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিমানস এই অ্যানিমেল টেলস্‌কে বা আদি উপকথাকে সুকৌশলে একটি ব্যক্তিত্ব প্রদান করে এবং এমন একটি উদ্দেশ্যসাধনের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে যে, সেগুলি ফেব্‌ল্‌স্-এ রূপান্তরিত হয়। তখন এই ফেব্‌ল্ বা নীতিগর্ভ আদি উপকথাকে অকৃত্রিম লোককথার অন্তর্ভুক্ত করা বিতর্কিত বিষয়ের মধ্যে পড়ে যায়। খাঁটি লোককথার মধ্যে ব্যক্তিত্ব মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না ; কিন্তু জাতক, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, ঈশপীয় কাহিনীর

মধ্যে ব্যক্তিমানসের উদ্দেশ্য প্রবলভাবে উপস্থিত। লোক-উপাদান যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে এবং বিশেষভাবে মনুষ্যেতর প্রাণীকে গল্পের চরিত্র হিসাবে অবলম্বন করার ফলে ফেবল্স-এর চেহারাতে পশুকাহিনীর সাধারণত্ব বর্তমান, কিন্তু উপসংহারে কিংবা বক্তব্যে অসাধারণত্ব পরিস্ফুট। জাতক-পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থের কাহিনীতো সাহিত্যিক গুণে পুরোপুরি লোকায়তিক অবস্থাকে অতিক্রম করে গেছে। এ কাহিনী, একটি যুক্তিসূত্র অবলম্বন করে লক্ষ্যে উপনীত। অর্থাৎ ফেব্‌ল্ বা নীতিগর্ভ আদি উপকথার গল্প লোকায়ত, কিন্তু বক্তব্যের মধ্যে সুসংস্কৃত মানসের পরিচিতি। ফেব্‌ল—হচ্ছে, জ্ঞানগর্ভ নীতিবাক্য।

খাঁটি লোককথার চারিত্র্য হিসাবে ফেব্‌ল্গুলির মধ্যে যুগান্তরের প্রবহমানতা, শ্রুতিধর্ম, মৌলিকতা এবং অকৃত্রিম সারল্য লক্ষণীয়। কিন্তু এর কাহিনী নয়, কেবল তার নির্যাসটুকুই গ্রাহ্য।

ফেব্‌ল্ সম্পর্কে ডঃ জনসনের সুপরিচিত অভিমত হচ্ছে:

"A fable or apologue seems to be its genuine state, a narrative in which beings irrational and sometimes inanimate are for the purpose of moral instruction feigned to act and speak with human interests and passions."

অর্থাৎ ফেব্‌ল্ হচ্ছে এমন একটি বর্ণনাত্মক রচনা, যাতে মনুষ্যেতর প্রাণী এমন কি অচেতন পদার্থও মানুষের মত কথা বলে এবং মানবিক আচরণ করে। নীতি-প্রচারই ফেব্‌ল-এর ধর্ম।

ঈশপের ফেব্‌ল্ থেকে আর একটি ধারণাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ফেব্‌ল্-এর আকৃতি নিরলংকার এবং দীনতম—অন্তর কিন্তু মনীষাদীপ্ত।

লোককথাবিদ্ এবং বিখ্যাত ফরাসী রচনাকার লা ফতেঁর (Teande-la-Fontain) একটি কাব্যায়িত বক্তব্যেও এই কথাই বলা হয়েছে:

"Fables in sooth are not what they appear ;
Our moralists are mice and such small deer.
We yawn at sermons but are gladly turn
To moral tales and so amused we learn."

অর্থ—ফেব্‌ল্‌ দেখতে যেমন, নয়-কো মোটেই তেমন তারা ;
মুষিক এবং ছোট্ট হরিণ আমাদের নীতি-গুরু।
মহাজন-বাণী শুনলেই হাই ওঠে ;
কিন্তু কাহিনী নীতিগর্ভিনী হলে –
শিক্ষা এবং আনন্দ দুই মেলে।

লা ফতেঁ, বিশ্লেষণ করে আরও বলেছেন যে ফেব্‌ল্‌ বা নীতিকথার দুটি ভাগ। এক ভাগে তার দেহ, আর এক ভাগে আত্মা। দেহ হচ্ছে কাহিনী, আত্মা হল নীতি।

এদিক থেকে মৌলিক অ্যানিমেল টেল্‌স্‌-এর সঙ্গে ফেব্‌ল্‌-এর পার্থক্য হচ্ছে এই যে,—অ্যানিমেল টেল্‌স্‌ হচ্ছে গল্পের জন্য গল্প, আর ফেব্‌ল্‌ হচ্ছে—নীতির জন্যই গল্প।

প্রসঙ্গতঃ, মনে হতে পারে যে রূপক, বা অ্যালিগরি-র সঙ্গে নীতি-কাহিনীর একত্ব আছে। ঈশপের নীতি-কাহিনীগুলিকে রূপকধর্মী বলে অভিহিত করা যায় কিনা এ বিষয়ে মতান্তর আছে। রূপকের স্ব-ধর্মেও কাহিনী গৌণ হয়ে যায়, বক্তব্যই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মুখ্য হয়ে উঠে। কেউ কেউ beast epic-কে রূপকধর্মী বলে মনে করেন, কিন্তু সাধারণতঃ নীতি-কাহিনী রূপক নয়।

রূপক হচ্ছে, একধরণের আর্ট ; যাতে কাহিনীগুলির অভ্যন্তরে আর একটি অর্থ বর্তমান এবং সেই অর্থই আসল। রূপকে, যে কোন কাহিনী, ভাব এবং চরিত্র বা অন্য কিছু প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। লা ফতেঁ-র 'দেহাত্মাবাদ' এ ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে পারে। লা ফতেঁ-র এই থিওরী সম্পর্কে দ্বিমত হওয়ার অবকাশ অল্পই কিন্তু এর অর্থ সম্পর্কে সতর্ক থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ, রূপক সম্পর্কে দেহ ও আত্মার পারস্পরিক সম্পর্ক যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত, নীতিকথার মধ্যে দেহ ও আত্মার সম্পর্ক ঠিক সেরূপে প্রকাশিত নয়। ফেব্‌ল বা নীতিকথার আত্মা তার দেহের মধ্যে নয়, তার পায়ের তলায়। ফেবল্‌-এর শেষ কথা—'অতএব সাবধান।" রূপকে এ ধরণের উদ্দেশ্য গুপ্ত থাকতে পারে, উচ্চারিত থাকে না।

ইংরাজীতে যাকে প্যারাবল্‌ বলে তার সঙ্গে রূপকের সম্পর্ক বরং কিছুটা

ঘনিষ্ঠ। এমন কি আকস্মিকভাবে ফেবল্-এর সঙ্গেও তার আকৃতিগত মিল পরিলক্ষিতও হতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখলে উভয়ের পার্থক্যটি ধরা পড়ে। এ বিষয়ে Neander-এর অভিমতটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ

"In the fable human passions and actions are attributed to beasts ; in parable the lower creation is employed only to illustrate the higher life and never transgresses the laws of its kind."

অর্থাৎ, নীতিকথায় মনুষ্যচরিত্র মনুষ্যেতর চরিত্রে আরোপিত, কিন্তু প্যারাবল্ নামক নীতিগর্ভ কাহিনীতে, মনুষ্যেতর চরিত্রগুলি, শুধু মাত্র মনুষ্যচরিত্রকে প্রকাশ করার জন্যই ব্যবহৃত।

ফেব্ল্-এর সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীর সম্পর্কও খুব ঘনিষ্ঠ নয়, যদিও গোত্রগত ভাবে উভয়ের আকস্মিক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হতে পারে। কিন্তু তাদের চরিত্র পৃথক। Animal myth নামক আদি উপকথা এবং পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে তার একটি যোগসূত্র আছে বটে, কিন্তু animal myth, animal tales-এর একটি বিশেষ শাখা মাত্র এবং নীতিগর্ভ আদি-উপকথা বা ফেবলস্-ও অন্য আর একটি শাখা মাত্র। ভাষার সঙ্গে তুলনা করে বক্তব্যটিকে আরও স্বচ্ছ করা যায়। সংস্কৃত ভাষা আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষার জননী হলেও আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করা যায় না। তেমনি, animal tales এর বংশজ হলেও নীতিকথা এবং animal myth-এর স্বাতন্ত্র্য অনেক।

Myth বা পৌরাণিক কাহিনী স্বরূপতঃ একটি জাতির বা উপজাতির অথবা বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাসের মাধ্যমে উদ্ভূত কাহিনী। এই সব কাহিনী যুগের পর যুগ প্রায় প্রতিষ্ঠিত সত্যের আকারেই প্রবহমান এবং এইভাবেই ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। কালক্রমে তা ধর্ম বিশ্বাসের অঙ্গীভূত হয়ে যায়। পৌরাণিক কাহিনীগুলির বেশ কিছু অংশ, মানুষের অতিপ্রাকৃত বিশ্বাসের উপর অধিষ্ঠিত থাকে এবং প্রায়শঃই অবৈজ্ঞানিক উপায়ে, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের বিশ্লেষণ করারও চেষ্টা করে।

পৌরাণিক কাহিনীকে তাই বিশিষ্ট সাহিত্যকৃতি না বলে, প্রবহমান প্রাচীন উপকথারূপেও গণ্য করা যেতে পারে। এই সব উপকথাকে অবলম্বন করেই পুরাণের বৃহদংশ রচিত হয়েছিল। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াদ, ওদিসি প্রভৃতি উপকথার উপর ভিত্তি করেই রচিত। পৃথিবী ও জীবজগতের সৃষ্টি, সূর্যের তেজোৎপত্তি, চন্দ্রের কলংক, রামধনুর রঙ, প্রভৃতি নানা বিষয়ে, আদিকাল থেকেই মানুষের মনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল এবং এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে মানুষ বিচিত্র কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। সেই সব কল্পনা, কোন জাতির বীবপুরুষ বা মহাপুরুষদের প্রবহমান কাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বিভিন্ন পুরাণের এবং পৌরাণিক মহাকাব্যের সূত্রপাত করে। সাধারণতঃ দেবদেবী এবং অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের কাহিনীই পুরাণে প্রকাশিত হয়।

পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বিশ্লেষণের যে প্রয়াস তা আমাদের কাছে অবৈজ্ঞানিক মনে হলেও, একথা বলা যেতে পারে, প্রাক-বিজ্ঞান যুগের মানুষ এই জাতীয় বিজ্ঞানের সাহায্যে নানা প্রশ্নের সমাধান করতে চেয়েছিল। পুবাকাহিনীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Sir G. L. Gomme যথার্থই বলেছেন—"Myths explain matters in this science of a pre-scientific age."

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেবতার অলৌকিক ক্ষমতা বা ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর না করে, শুধুমাত্র সব কিছুর মধ্যে অলৌকিক আত্মায় বিশ্বাস স্থাপন করে, যে সব সৃষ্টিকাহিনী রচিত, সেগুলিকে আমরা ফোক টেলস্ বা লোককথা হিসাবেই গ্রহণ করতে পারি। দেবনির্ভর সৃষ্টিকাহিনী আদিম সমাজে উদ্ভূত হয়নি এবং ঈশ্বর-বিশ্বাস সভ্য মানুষেরই বিশ্বাস। ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে প্রকৃতি-সৃষ্টির কাহিনী তাই যথার্থরূপে লোককাহিনী নয়।*

Myth এবং Folk tales-এর মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বলা হয়েছে—"Thus Myths tell of the creation of man, of animal, of landmarks; they tell why a certain animal has its characteristics (e.g. why the bat is blind or flies only at night), why or how certain natural

আদিম সমাজে মনুষ্যেতর প্রাণীদের অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে করা হত। যাদুবিদ্যার উপরেও মানুষের গভীর বিশ্বাস ছিল। এমন কি পশু-পাখিকেও যাদু-জ্ঞানের অধিকারী বলে বিশ্বাস করা হত। ফলে পশু-জগৎকে স্বয়ংসৃষ্ট এবং অলৌকিক হিসাবে গ্রহণ করার দিকেও প্রবণতা ছিল। আদি উপকথায় এই বিশ্বাসের প্রাধান্য।

মোটের উপর, পৌরাণিক উপকথা, সমষ্টিগত ভাবে একটি জাতিব বা গোষ্ঠীর বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে উদ্ভূত। কোন বিশেষ শিল্পীর রচনা হিসাবে তা গ্রাহ্য হ'তে পারেনা। পৌরাণিক উপকথা, সজ্ঞান মানস-চর্চার ফসল নয়; আদিম মানসিকতার অন্ধ অজ্ঞানতার মধ্যে এর জন্ম—"Spontaneous and unconscious product of primitive fancy." পরিশেষে কোন ঐতিহাসিক বীর-কথা (legends) বা প্রাকৃতিক ঘটনার আশ্রয়ে, পরিপূর্ণ পুরাণরূপে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে।

ফেব্‌ল এর সঙ্গে তাই মিথ-এর পার্থক্য, স্বাভাবিক ভাবেই দৃষ্টিগ্রাহ্য। ফেব্‌ল্ বা নীতিকথার আদিতে কোন ফ্যান্সি বা উদ্ভট কল্পনা নেই। আদিম মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে, সভ্য সমাজে তার রূপায়ণ। পশু-পাখির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং অরণ্য সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা থেকেই এগুলির সূত্রপাত; এর মধ্যে অলৌকিক বিশ্বাসের কোন স্থান নেই। নিছক গল্প হিসাবেই এগুলি প্রাথমিক ভাবে উদ্ভূত; পরিশেষে সামাজিক নীতি প্রচারের উদ্দেশ্যে তার প্রয়োগ।

আদি উপকথার সঙ্গে নীতিসংযোজনের পরিণামে, ফেব ল্-এব জন্ম।

phenomena came to (e g. why the rainbow appears or how the constellation Orion got to the sky), how and why ritual and ceremonies began and why they continue. Not all origin stories are myths however; the myths must have a religious background in that its principal actor or actors are deities; the stories are thus systematised at least to the extent that they are related to a corpus of other stories in which the given god is a member of a pantheon, where such nter relation does not occur and where the gods or demigods do not appear, such stories properly classified as folktales."

—*Encyclopaedia of Folklore Legend and Myth.*

প্রবাদ ও ফেবল্

এদিক থেকে, প্রবাদ-প্রবচনের সঙ্গে নীতিকথার অন্তরঙ্গ সমগোত্রতা বর্তমান। প্রবাদ-প্রবচন অবশ্য কোন কাহিনী নয়, অভিজ্ঞতালব্ধ বাক্য মাত্র ; তার সীমার মধ্যে কিন্তু অসীম অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি।

অবশ্য, যে কোন প্রবাদেরই মৌলিক কাহিনী থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু কাহিনীর উপর প্রবাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল নয়। ঈশপের অনেক কাহিনীর পরিশিষ্টই প্রবাদরূপে গৃহীত ; ভারতীয় প্রবাদবাক্যের আদিতেও কাহিনী অনেক। বলা চলে,—প্রবাদ প্রায়শঃই নীতিকথার ঘনীভূত এবং চূড়ান্ত পরিণাম।*

কিন্তু প্রবাদ প্রবচনের ক্ষেত্রে এই কথাই যে শেষ কথা তা' বলা যায় না, তবে এই কথাই বিশিষ্ট কথা। কাহিনীর সংগে সম্পর্কহীন, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতালব্ধ সংখ্যাহীন বাক্য বা বাক্যাংশ প্রবাদ-প্রবচন রূপে গৃহীত হয়েছে। নিছক ঘটনাশ্রয়ী-কথাও এর মধ্যে স্বীকৃতি লাভ করে। বাঙ্‌লা ভাষায় প্রচলিত 'খনার এবং ডাকের বচন' থেকেই এই বক্তব্য প্রমাণিত হয়। হিতোপদেশ-পঞ্চতন্ত্র-ঈশপীয় নীতিকথা প্রভৃতির কাহিনী থেকে উদ্ভূত সংখ্যাহীন প্রবাদবাক্য অবশ্যই কাহিনীনির্ভর।

নীতিকথাগুলি, কোনক্রমেই প্রবাদবাক্যের বিশ্লেষিত রূপ নয়, নিয়ম সূত্রের মাধ্যমে একটি পরিণত বাক্য মাত্র। অর্থাৎ প্রবাদ হচ্ছে শুধু পরিণাম ; ফেব্‌ল্ বা নীতি কথা হচ্ছে—ঘটনাসংযুক্ত পরিণাম। উভয়ের মিলও পরিণামে।

বলাবাহুল্য, এ ভাবেও বিচার করা যেতে পারে যে, অনেক প্রবাদবাক্যই পরে অনেক কাহিনীর জন্ম দান করেছে। প্রাথমিক ভাবে যা ছিল অভিজ্ঞতার বক্তব্য, পরিশেষে তাই আবার নতুন কাহিনীকে আহ্বান করে তার জাত্যন্তর ঘটিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ঈশপীয় নীতিকথার একটি কাহিনীকে

* A proverb is often condensed or fossilized fable.

অবলম্বন করে এই অভিমতের পোষকতা করা যেতে পারে। এই নীতিকথাটির 'মর‍্যাল' বা উপদেশ—একতাই বল। অভিজ্ঞতালব্ধ এই সত্যটি আদিম মানুষেরই আবিষ্কার, এমন কি পশুযূথের মধ্যেও এই অভিজ্ঞতা সত্য রূপেই বর্তমান।—একতার মধ্যে, সংহতির মধ্যে—যে শক্তি, তা বোঝানোর জন্য সাধারণতঃ কোন কাহিনীর প্রয়োজন হয় না। তবু, এই অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকে প্রমাণিত করার জন্য একটি কাহিনীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে যে, একগুচ্ছ লাঠিকে একত্র করে ভাঙা যায় না, কিন্তু একটিমাত্র লাঠিকে অনায়াসে ভেঙে ফেলা যায়।

সম্ভবতঃ, এই ভাবেই প্রবাদবাক্যকে সমর্থন করার জন্য, পরবর্তীকালেও অনেক নীতিকথা সংযোজিত হয়ে থাকবে।

প্রবাদ এবং নীতিকথা আর এক দিকেও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। উভয়ের বক্তব্যের মধ্যে সাধারণ অভিজ্ঞতাই প্রকাশিত হয়ে থাকে, যা সমাজরক্ষণের জন্য প্রয়োজন; কোন মহৎ আদর্শবাদের কথা যতদূর সম্ভব না বলাই উভয়ের ধর্ম।

'ক্রীতদাস ঈশপ,—দাঁড়িয়ে নয়,—বাঁ পা ছড়িয়ে এবং ডান হাঁটু ভেঙে দরজার গোড়ায় ব'সে গল্প শোনাচ্ছেন। ভেনিসে মুদ্রিত উডকাটের একটি ছাপ থেকে এই দৃশ্যটি অনুমান করা যেতে পারে। মুদ্রণতিথি—২৭শে মার্চ, কাল ১৪৯২ খৃষ্টাব্দ। আরও অনুমান করা যেতে পারে যে, ক্রীতদাস ঈশপ গ্রীক অন্তঃপুরিকাদের কাছে সেই সব নীতিগল্পই শোনাচ্ছেন, যে-গুলি ঈশপের ফেব্‌ল নামে পৃথিবীর সর্বত্র সুপরিচিত এবং সমাদৃত। যে কয়েকজন গ্রীক অন্তঃপুরিকা এ গল্প শোনায় রত, তাঁরা অবকাশ-নিবেদনে লিপ্ত নন, কর্মব্যস্ত। ওঁরা ঈশপকে ঘিরে বসে নেই; দূরত্বের ব্যবধান রেখে—সবাই দাঁড়িয়ে আছেন। ওরা গ্রীক অন্তঃপুরের কর্ত্রী না হয়ে দাসীও হতে পারে, অন্ততঃপক্ষে সাজসজ্জা দেখে ওদের কোন আভিজাত্য আমাদের চোখে পড়বে না। যাই হোক্, ঈপশের গল্প শোনার জন্য, ধীরে-সুস্থে গুছিয়ে বসার প্রয়োজন হয় না; কারণ, ঈশপের গল্প আরব্য রজনীর উপন্যাস নয়। 'পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশের নীতি-কাহিনী নয়, রামায়ণ মহাভারতের পৌরাণিক উপাখ্যান নয়, গ্রীস দেশের দৈবকথা, কিংবা বীর-

গাথাও নয়। স্বরূপতঃ ঈশপীয় কাহিনী বাক্যালাপের অন্তর্গত এক জাতীয় উদাহরণের নীতিকথা। আয়তনে অতি ক্ষুদ্র—ঈশপীয় কাহিনীগুলি দেশালাই কাঠির মত, অগ্নির সম্ভাবনায় জমাট,—ঘর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠে এবং তাতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠে মানুষের চরিত্র ও তার সমাজ।

ঈশপ এখন কিংবদন্তী। তাঁর জীবৎকালের হিসাব কস্‌তে গিয়ে, সে হিসাব শেষ পর্যন্ত মেলেনি। তার ফলে, ঈশপ নামে কোন ব্যক্তি এই পৃথিবীতে সাকার অবস্থায় ছিলেন কিনা, ইতিহাস-সম্মতভাবে সে বিষয়ে মতান্তর আছে। ঈশপ, এসিয়া মাইনরের ঈশপাস নদীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিনা সে বিষয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ঈশপাস নদী-বিধৃত অঞ্চল থেকে কাহিনীগুলি গ্রীস দেশে আসে—ঈশপাসের নামে প্রচলিত হয়েছে বলে, যাঁরা মনে করেন, তাঁরা বলেন, গ্রীস দেশে ঈশপের নাম ঈশপ নয়, ঈশপাস। যাই হোক—বাল্মীকি সশরীরে ছিলেন কিনা, ইতিহাস নীরব থাকলেও,—তাঁর রামায়ণ এখনও বর্তমান; ঈশপ নামে কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব ছিল কি না, সে বিষয়ে অকারণ গবেষণায় আত্মনিয়োগ না ক'রে বলা যায়,—যে, কাহিনীর মাধ্যমেই ঈশপের অস্তিত্ব বর্তমান এবং সেগুলির দপ্‌ ক'রে জ্বলে ওঠার ক্ষমতা এখনও অসাধারণ।

তা বলে ঈশপের অবস্থিতি এবং জন্মমৃত্যুর হিসাব যে কষা হয়নি, তা নয়, কিন্তু উত্তরে গরমিল আছে; একের হিসাবের সঙ্গে আর একজনের হিসাব মেলে নি। কেউ বলেন, তিনি ছিলেন গ্রীসের সামোস দ্বীপে, কেউ বলেন—লিজিয়ার অন্তর্ভুক্ত সার্দিসে। অন্য অভিমতে বলা হয়, তিনি ছিলেন থ্রেসের অন্তর্গত মেসেম্বিয়াতে অথবা ফ্রিজিয়ার কোন স্থানে অর্থাৎ তৎকালীন বহুধাবিভক্ত গ্রীসদেশের যে-কোন রাষ্ট্রে তাঁর জন্ম হয়েছিল।

কেউ কেউ অংকের হিসাব মিলিয়ে বলেছেন,—ঈশপের জন্ম হয়েছিল খৃষ্ট পূর্ব ৬২০ অব্দে এবং মৃত্যু হয়েছিল ৫৬৪ খৃষ্ট পূবাব্দে। ভারতবর্ষে তখনও বুদ্ধদেবের নাম এবং চীনে তখনও কনফ্যুসিয়া ও লাওৎসের নাম শ্রুত নয়। ঈশপের চেয়ে অর্ধশতাব্দীর ছোট—অথবা ঈশপের শেষ বয়সে এঁরা সবাই কিশোর বালক।

প্রচলিত কাহিনী অনুসরণ করে বলা যায় যে, ঈশপ কমপক্ষে দুজনের দাসত্ব করেছেন। প্রথম মালিকের নাম জান্‌থোস (Xanthos) এবং দ্বিতীয় মালিকের নাম ছিল আয়াদ্‌মন (Iadmon)। জান্‌থোসের নাম ঈশপ প্রসঙ্গে গৌণ, আয়াদমনই বৈশিষ্ট্য। আয়াদ্‌মনের রসবোধ ছিল এবং নাগরিক রুচি ও আভিজাত্য ছিল; প্রতিভার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল এবং প্রতিভা-বিচারের ক্ষমতা ছিল, প্রতিভাকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের মানসিকতাও ছিল।

কবি রামপ্রসাদ গান রচনা করে হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করতেন বলে সহৃদয় জমিদার কবিকে জমিদারী-সেরেস্তার কাজ থেকে নিষ্কৃতি দান করেন, শুধু গানরচনা করে তাঁর কাল কাটাবার জন্য। তাঁর মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন—নবদ্বীপের অধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র।. ঈশপের প্রসঙ্গে তাই আয়াদ্‌মনের নাম বিশেষ স্মরণীয়। আয়াদ্‌মনই ঈশপের বুদ্ধি-প্রখরতায় এবং সুদীপ্ত ভাষণে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে দাসত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন। সহৃদয় আয়াদ্‌মন বুঝেছিলেন যে, তাঁর ক্রীতদাস সাধারণ ভৃত্য নয়, অসাধারণ মনীষী; বুঝেছিলেন, ঈশপের কাজ দাসত্ব করা নয়, সাধারণ মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া।

মুক্তিলাভের অল্পদিনের মধ্যেই ঈশপের বুদ্ধিপ্রাখর্য ও উইট-এর কথা নিশ্চয়ই গ্রীস দেশের সর্বত্র ক্রমে ক্রমে ছড়িয়ে পড়েছিল। সার্দিসের অধিপতি ক্রীসাস (Croesus)-এর কানেও ঈশপের কথা পৌঁছেছিল। তিনি ঈশপকে তাঁর প্রাসাদে আমন্ত্রণ করেছিলেন কিনা জানা যায় নি কিন্তু ঈশপ ক্রীসাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। ক্রীসাস তাঁর শ্রুতকীর্তি সপ্ত সভারত্নের সঙ্গে ঈশপকেও যোগ্য সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন।

ক্রীসাসের সপ্ত সভারত্ন তখন গ্রীসের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ব্যক্তি। তাঁদের নাম ছিল বিয়াস (Bias), চিলন (Chilon), ক্লিওবুলুস (Cliobulius), পেরিয়ানডার (Periander), পিট্টাকস (Pittacus), সোলোন (Solon), ও থেল্‌স (Thales)—এঁদের মধ্যে সোলোন ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত।

প্লুটার্ক এই সপ্ত রত্নের সঙ্গে আরও একটি রত্ন সংযুক্ত করে অষ্ট রত্নের কথা উল্লেখ করেন নি বটে, কিন্তু তিনি Symposium of the Seven

Sages-নামক তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে ঈশপের নাম উল্লেখ করে বলেছেন যে, ঈশপ ক্রীসাসের পরম শ্রদ্ধাভাজন অতিথি হিসাবে গৃহীত হয়েছিলেন এবং সপ্ত রত্নের সঙ্গে একত্রে পানাহারে যোগদানের মর্যাদাও লাভ করেছিলেন। এইভাবে ভূলুণ্ঠিত একজন ক্রীতদাসের প্রতিভা স্বীকৃতি লাভ করে গ্রীসের মহিমাকেই বৃদ্ধি করেছিল এবং একদা নগণ্য ক্রীতদাস ঈশপ তাঁর স্বকৃত মহিমায় কৃতার্থ করেছিলেন সার্দিসের বিদ্যোৎসাহী অধিপতি ক্রীসাসকে।

ঈশপ সম্পর্কে ক্রীসাস বলেছিলেন, এই ফ্রিজিয়াবাসী মানুষটি গুণে অতুলনীয়; এর মত বাচস্পতি দুর্লভ। ঈশপের বাকচাতুর্যে মুগ্ধ হয়েই নাকি, ক্রীসাস তাঁকে দেবপীঠ ডেলফি-তে পাঠিয়েছিলেন। ডেলফি তখন অ্যাপোলোর মন্দির এবং এই মন্দির দৈববাণীর জন্য বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল। এই ডেলফির অধিবাসীরাই ঈশপকে নাকি পর্বতশৃঙ্গ থেকে নিক্ষেপ করে তাঁর মৃত্যু ঘটায়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক হেরোডেটাস, ঈশপের মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা বলেছেন কিন্তু ডেলফি অধিবাসীদের এই নির্মমতার কারণ সম্পর্কে তিনি নীরব।

কথিত আছে, ঈশপের হাতে প্রচুর ধনরত্ন প্রদান করে ক্রীসাস তাঁকে পাঠিয়েছিলেন ডেলফিতে, ডেলফির অধিবাসীদের মধ্যে সেই অর্থ বণ্টন করতে। ঈশপ নাকি ওদের লুব্ধ আচরণ দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে মৃদু তিরস্কার করে বলেছিলেন, তোমরা নাগরিক নামের অযোগ্য। ঈশপ ওদের বিপথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য দু চারটি নীতিগল্পও যে না শুনিয়ে থাকবেন তা নয়; কিন্তু তাতে ওরা কর্ণপাত করেনি। ঈশপের মৃত্যুর কাহিনী থেকে ইহা প্রমাণিত হয়। ঈশপের নীতি-গল্প শোনার পরেই হয়তো ওরা আরও উত্তেজিত হয়ে ঈশপকে এক পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে নীচে ফেলে দেয়।

পরবর্তীকালে অনেকে অনুমান করেছেন, ঈশপের ব্যঙ্গাত্মক শাণিত বাক্যই তাঁর মৃত্যুর কারণ। আবার কেউ কেউ এও অনুমান করেছেন যে, ডেলফি থেকে ঈশপ নাকি একটি রৌপ্য পাত্র চুরি করেছিলেন; তাই ডেলফির অধিবাসীরা তাঁকে এই শাস্তি দিয়েছিল। সম্ভবতঃ, এরা ঈশপের কোন কোন নীতি-গল্প থেকে অস্ত্র আহরণ করে এবং সেই অস্ত্রে ঈশপকেই

এই ভাবে হত্যা করেছেন। কয়লার ময়লা ধুলেও যায় না—ক্রীতদাস ঈশপের চৌর্যবৃত্তি থাকাও অসম্ভব নয়।

যাইহোক এও কথিত আছে, ডেলফির অধিবাসীরা ঈশপকে হত্যার করারফল স্বরূপ প্রচণ্ড এক দৈবিক শাস্তিও লাভ করেছিল। প্লেগের মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ডেলফির অধিবাসীরা বিশ্বাস করেছিল, ঈশপকে হত্যার জন্যই দৈব রোষ। ওদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ওরা ঈশপের আত্মীয়-স্বজনদের প্রচুর অর্থ দান করতে চেয়েছিল। কিন্তু ঈশপের কোন আত্মীয়স্বজন বা উত্তরাধিকারীর সন্ধান পাওয়া যায় নি। তা হলে, দৈব রোষ থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায়! অর্থদণ্ড দিয়ে আত্মশুদ্ধি। কিন্তু অর্থ নেবে কে? অন্ততঃপক্ষে এমন একজন চাই, যার সঙ্গে ঈশপের কোন না কোনরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। শেষ পর্যন্ত আয়াদ্‌মনের স্ব-নামিত পৌত্র আর এক আয়াদ্‌মন ঈশপের নামে সেই অর্থ গ্রহণ করেছিলেন।

ঈশপ সম্পর্কিত এই কাহিনী জনশ্রুতিমাত্র, প্রমাণনির্ভর নয়। তবে —সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টোটল্‌, প্লুটার্ক, হেরোডেটাস প্রভৃতি মনীষীরা ঈশপের নাম উল্লেখ করেছেন। সক্রেটিস ঈশপীয় কাহিনীগুলির পদ্যানুবাদ করেছিলেন এবং প্লেটো সেগুলির সপ্রংশস উল্লেখ করেছেন। অ্যারিস্টোফেন্‌স্‌ও ঈশপের নাম এবং তাঁব কাহিনী উল্লেখ করে গল্পগুলি উদ্ভট বলে অভিহিত করেছেন।

ঈশপীয় কাহিনীগুলি, এথেন্সেই প্রথম প্রচারিত হয় বলে অনুমিত হয়েছে। পেইসিসট্রেটাস-এর রাজত্বকালে ঈশপ এথেন্সে যান এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। কথিত আছে, এথেন্সের নাগরিকগণ পেইসিসট্রেটাসকে রাজ্যচ্যুত করে অন্য কোন এক ব্যক্তিকে সেই পদে অধিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। পেইসিসট্রেটাসের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশতঃ ঈশপ নাগরিকদের ঐ কাজে বিরত করার চেষ্টা করে সফলতা লাভ করেছিলেন। বলাবাহুল্য, ঈশপ ভেককুলের রাজা-প্রার্থনা নামক নীতি-কাহিনী বলেই এথেন্সবাসীদের মনে পরিবর্তন আনতে পেরেছিলেন। কাহিনীটি ছোট, কিন্তু তাঁর বক্তব্য এথেন্সবাসীদের অভিভূত করেছিল নিশ্চয়ই। কাহিনীটি উদ্ধৃত করা হল:

অনেককাল আগের কথা। জলাশয়ে তখন, ভেকসমাজ বেশ স্বাধীন-ভাবেই বসবাস করতো। ব্যক্তি স্বাধীনতা খুব বেশী ছিল, যে-যার খুশীমত কাজ করতো। কিন্তু এ ধরণের স্বতন্ত্রতা ওদের নিজেদের মনে বিরক্তি উৎপাদন করলো। তখন ওরা স্বর্গাধিপ জুপিটারের কাছে সম্মিলিতভাবে এক আবেদনপত্র পাঠালো। তাতে বললো, আমরা বড্ড বেশী স্বাধীন হয়েছি, ফলে আমাদের মধ্যে কোনরূপ শৃঙ্খলাবোধ নেই। আমরা বুঝতে পারছি, আমাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা দরকার। আমরা যাতে আরো সৎ হতে পারি, তার জন্য একজন রাজা দেওয়া হোক। রাজার কর্তৃত্বের মধ্যে থাকলেই আমাদের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা আছে, তা আর থাকবে না।

জুপিটার বুঝতে পারলেন যে, ব্যাঙের দল খুব অহঙ্কারী হয়েছে; রাজার জন্য তাদের প্রার্থনার আসল কারণ, তাদের নিজেদের খুব উন্নত শ্রেণীর জীব মনে করার ফলশ্রুতি মাত্র। তাই দেবরাজ জুপিটার ওদের অহঙ্কার চূর্ণ করার জন্য বিরাট এক কাঠের গুঁড়ি জলাশয়ে নিক্ষেপ করলেন। প্রচণ্ড এক শব্দ হল, ফলে ব্যাঙের দল ভয়ে হতচকিত হয়ে, যে যেখানে পারল, কেউ জলের তলায়, কেউ পাঁকের নীচে, কেউবা অন্য কোথাও লুকিয়ে পড়ল। ঐ কাঠের গুঁড়ির কাছে আসবার সাহস কারুরই হল না। অবশ্য, শেষ পর্যন্ত এক সাহসী ব্যাঙ জলের উপর মাথা তুলে, বেশ দূর থেকেই তাদের নতুন রাজাকে ভালো করে একবার দেখে নিল। তারপর, অনেকেই সাহস করে রাজার কাছাকাছি এল। যখন দেখলো, যে তাদের রাজা অনড়, অচল, মুখ ফুটে কথাও বলে না, তখন তারা এক এক লাফে রাজার উপর চড়ে দাপাদাপি লাফালাফি সুরু করে দিল।

নাঃ—এ রাজা কোন কাজের নয়, বলে আবার সবাই জুপিটারের কাছে আবেদন জানাল, একজন সুদক্ষ, প্রাণবান, চঞ্চল এবং রাজার মত রাজা চাই, এ রাজা ভালো নয়। জুপিটার বললেন, বেশ! একজন সুদক্ষ রাজাই পাঠাচ্ছি।

এবারে, এক বককে তিনি ওদের রাজা করে পাঠালেন। এই রাজা

সত্যিই খুব কর্মদক্ষ। সে এসেই তার কাজ সুরু করে দিল। একে একে ব্যাঙদের ধরে গবগব করে গিলতে লাগল। পালিয়েও ওরা নিস্তার পেল না। শেষপর্যন্ত ওরা যখন বুঝতে পারলো যে, এ রাজার হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভের উপায় নেই, তখন ওরা মার্কারীর কাছে গিয়ে অনেক কাকুতি-মিনতি করে বললো, আমাদের রক্ষা করুন। মার্কারী বললেন, আমি কি করবো—আমি তো জুপিটারের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারি না। ব্যাঙেরা বললো, আপনি অনুগ্রহ করে একবার জুপিটারের কাছে যান—তাঁর কাছে আমাদের প্রার্থনা জানিয়ে দিন, তিনি যেন আমাদের অপরাধ ক্ষমা করেন আর আমাদের প্রতি যেন করুণা করেন।

জুপিটার তাদের প্রার্থনা শুনে বলেছিলেন, শিক্ষা হল তো, যারা স্বাভাবিকভাবে থাকতে চায় না, ভালোমন্দ বিচার-বিবেচনা না করেই কাজ করে, এই হচ্ছে তাদের শাস্তি।

এই কাহিনী শোনার পর, এথেন্সের অধিবাসীরা নাকি অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, পেইসিসট্রেটাসকে সরিয়ে আর কাউকে সিংহাসনে বসানোর ইচ্ছা ত্যাগ করেছিল।

এ সবই ঈশপ সম্পর্কে জনশ্রুতিমূলক কাহিনী।

ঈশপের চেহারা কেমন ছিল, সে বিষয়েও জনশ্রুতি অনেক। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে ম্যাক্সিমাস প্লেনুদেস্ নামক এক যাজক ঈশপীয় কাহিনীগুলিকে সঙ্কলিত করে প্রকাশ করেছিলেন। তাতে ঈশপের কথা বলতে গিয়ে তিনি ঈশপের কুৎসিত কদাকৃতির কথা বলেছেন। রোমের ভিলা আলবানীতে ঈশপের যে কাল্পনিক মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে মূর্তিটিও কুৎসিত।

অন্যদিকে, এথেন্সের অধিবাসীরা পরবর্তীকালে ঈশপের যে মর্মর-মূর্তির প্রতিষ্ঠা করে, তা কিন্তু মোটেই কুৎসিত নয়। প্লুটার্ক তাঁর Symposium of the Seven Sages নামক গ্রন্থে, ঈশপের প্রাক-দাসত্বের কথা তুলে একটু পরিহাস করেছেন, কিন্তু ঈশপ যে কদাকার ছিলেন, তিনি তা বলেন নি।

ঈশপের জন্ম, মৃত্যু, আকৃতি, প্রকৃতি সম্পর্কে নানাবিধ জনশ্রুতি আছে

বলেই, শেষ পর্যন্ত একদল পণ্ডিত ঈশপকে নিরাকার বলেই ধরে নিয়েছেন। অর্থাৎ, ঈশপের ফেবল আছে, কিন্তু ঈশপ নামে কোন ব্যক্তি কোন কালেই ছিলেন না। আমাদের খনার বচনের খনার মত ঈশপ এক কিংবদন্তী মাত্র। একদল পণ্ডিত তাঁকে নিরাকার বলেই ধরে নিয়েছেন এবং আর একদল তাঁকে ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করতে বদ্ধপরিকর হয়ে, তাঁর জন্মকাল ঘোষণা করেছেন ৬২০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ এবং মৃত্যুকাল ৫৬৪ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ। এ বিষয়ে বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করেও একটি বিষয়ে আমরা স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হতে পারি যে, ঈশপীয় কাহিনীগুলি সুপ্রাচীন। তা ছাড়া ঈশপের নামের সঙ্গে জড়িত হলেও কাহিনীগুলি জনশ্রুতি পরম্পরায়, ঈশপের জন্মের অনেক কাল আগে থেকেই প্রচলিত ছিল, কাহিনীর চরিত্র থেকে তা অনুমান করা যেতে পারে। ঈশপের মুখে সম্ভবতঃ ঐ সমস্ত গল্প অধিক পরিমাণে প্রচারিত হয়ে থাকবে এবং ঈশপ নামক কোন ব্যক্তির নিজস্ব কিছু কিছু রচনাও তার মধ্যে সংযোজিত হয়ে থাকবে। বাঙলা ভাষায় প্রচলিত কালিদাসের গল্প ও খনার বচনের দিকে মনোনিবেশ করলে এ বিষয় অসন্দিগ্ধ হওয়া যেতে পারে।

প্লেটোর গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, সক্রেটিস্ ঈশপের কাহিনীগুলিকে গদ্য থেকে পদ্যে রূপান্তরিত করেছিলেন। অ্যারিস্টোফেনস্ বলেছেন যে ঈশপের ফেবলগুলি অনেক বক্তাই ভাষণ দানের সময় প্রয়োগ করতেন। বস্তুতঃ, যে ব্যক্তি বা যে বক্তা যত বেশি ঈশপীয় কাহিনী প্রয়োগ করতে পারতেন, তিনি তত বেশি বৈদগ্ধ্যের অধিকারী বলে সম্মানিত হতেন। কয়েক শতাব্দী এইভাবে মুখে মুখে আশ্রয়লাভ করেই অবশেষে খ্রীষ্ট পূর্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীতে ফেবলগুলি ডিমেট্রিয়াস-এর দ্বারা সর্ব প্রথম গদ্য ভাষাতেই সঙ্কলিত হয়। পরবর্তীকালে অবশ্য এই সঙ্কলনের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। সম্ভবতঃ, তা বিনষ্ট হয়ে থাকবে। এরপর যে সমস্ত প্রাচীন সঙ্কলনের কথা জানা যায়, সেগুলি কাব্যাকারেই উপস্থাপিত। কবিদ্বয় ফায়েদ্রাস ও আভিয়ান্স্ ল্যাটিন ভাষায় এবং ব্যাবরিয়াস গ্রীক ভাষায়, খ্রীষ্ট পূর্ব ২০০ অব্দে কাহিনীগুলি সঙ্কলিত করেন। অনেকে মনে করেন, এগুলি ডিমেট্রিয়াস-এর গদ্যসঙ্কলনের উপর নির্ভর করেই সঙ্কলিত

হয়ে থাকবে। অনেক পরে, মধ্যযুগে, মূলতঃ ব্যাবরিয়াসের সঙ্কলন অবলম্বন করেই ম্যাক্সিমাস প্ল্যানিউদেস্, ঈশপীয় কাহিনীর আর একটি সঙ্কলন প্রকাশ করেন। আরো পরে, লা ফঁতেন ('১৬৬৮-৯৪) ও অন্যান্য সঙ্কলকগণ প্ল্যানিউদেসের সঙ্কলনের দ্বারাই প্রভাবিত হন।

আদি ও অকৃত্রিম লোককথা ব্যক্তিবিশেষের রচনা নয়। বলা বাহুল্য, এ ধরণের উক্তির মর্মকথা ব্যক্তিমানসের চিন্তার ফসল নৈর্ব্যক্তিক হয়ে দেখা দেয়। কোন এক সময় কোন এক ব্যক্তির নামের আশ্রয় গ্রহণ করে লোক-কথা প্রচারিত হতে থাকে। সেই ব্যক্তি কিছু কিছু কাহিনীর উদ্ভাবকও হতে পাবেন। ঈশপ সম্পর্কেও এই কথা প্রযোজ্য।

সাধারণতঃ, একটি প্রশ্ন বহুদিন ধরে আমাদের মনের মধ্যে জাগরিত। প্রশ্নটি ঈশপীয় কাহিনীর উৎস সম্পর্কিত। ফেবলগুলি গ্রীস দেশেই উদ্ভূত, না এগুলির উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ষ, এ বিষয়ে নানা পণ্ডিতের নানা মত।

ম্যাক্সমুলার, কিথ্ এবং আরও বহু অগ্রগণ্য পণ্ডিতদের ধারণা, কাহিনী-গুলি ভাবতবর্ষ থেকেই পশ্চিমাভিমুখী হয়ে গ্রীসদেশে প্রবেশ করে। দেখা যায় দ্বিশতাধিক ঈশপীয় নীতি-গল্পের এক চতুর্থাংশ, জাতক, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে বিধৃত। আমাদের বহু পরিচিত ঈশপীয় কাহিনীর নেকড়ে বাঘ ও মেষশাবক, সিংহচর্মাবৃত গর্দভ, শৃগাল ও দাঁড়-কাক, স্বর্ণডিম্বপ্রসূ রাজহংসী এবং আরও অনেক কাহিনী জাতকেও বর্তমান। মহাভারতে বিধৃত সিংহ-মূষিক কথা, উদর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাহিনী, কৃষক ও সর্প, মৃৎপাত্র ও কাংস্যপাত্র, মার্জারের তরুণীত্ব-প্রাপ্তি প্রভৃতি কাহিনী ঈশপের গল্পেও আছে।

অ্যানিমেল টেলস বা আদি উপকথার স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, পশুপাখীর সম্পর্কে প্রচলিত বহু কাহিনীর আদিভূমি ভারতবর্ষ, যদিও পৃথিবীর সর্বত্র আদিম সমাজে তার উদ্ভব ঘটা অসম্ভব নয়।

লিন্ ইউটাঙ্ তাঁর The Wisdom of India নামক গ্রন্থে একটু বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে ভারতবর্ষকেই এই জাতীয় কাহিনীর আদিভূমি বলে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন: "That the migration of fables were originally from east to west and not vice-versa is shown by

the fact that the animals and birds who play the leading parts—the lion, the jackal, the elephant and the peacock are mostly Indian ones. In the European version the jackal becomes the fox, the relation between the lion and the jackal is a natural one, whereas the same between the lion and the fox is not."

এই উক্তির যথার্থতা সম্পর্কে একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া চলে না, যদিও তা অধিক পরিমাণে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে। ইউটাঙ, ভারতীয় হাতী ও ময়ূরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, এই দুটি সর্বতোভাবে ভারতীয় প্রাণী। প্রচলিত ঈশপের গল্পে হাতী কিন্তু গৌণ এবং অনুপস্থিত, ময়ূরের ভূমিকাও নগণ্য। যাই হোক, উপরি উক্ত বক্তব্য সম্পর্কে পুরোপুরি একমত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লিন্ ইউটাঙ-এর নিম্ন বক্তব্যটি আমরা অনায়াসে গ্রহণ করতে পারি। কারণ, ঐতিহাসিকদের মতে ভারতবর্ষ নীতি-গল্পেরই দেশ, 'India—the Home of Fables.'

"India is the home of fables, which are usually associated in our minds with the Greek slave, mentioned by Herodotus by the name of Aesop. Few users of allusions to Aesop's Fables which have crept into our everyday language realise that these stories, their special form and technique can be traced to very remote sources in India.

With an apology for punning, one must say that the Hindu mind is fabulous. The genius for creating fables seems inexhaustible in Indian literature······"

প্রমাণস্বরূপ, লিন্ ইউটাঙ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন:

"Witness the Buddhist birth stories (The Jatakas) and the Dhammapada commentary by Buddhaghosha,

running each into four or five hundred stories, a great part of them animal fables and the Panchatantra and the Hitopadesh."

পালি ভাষায় লিখিত জাতকসাহিত্যে গল্পের সংখ্যা ৫৪৭। গল্পে বর্ণনভাগ গদ্যে, কথোপকথন ও পরিণাম-অংশ পদ্যে লিখিত। জাতকসাহিত্য প্রাচীন বিশ্বসাহিত্য জগতের এক বিস্ময় এবং জাতকই প্রাচীনতম লোককথার সংকলন গ্রন্থ। নীতিকথা, রূপকথা, উপকথা, বীরকথা এবং আরও বহুবিচিত্র ভাগে জাতকের গল্পগুলির জাতি-ভাগ করা যায়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা অভিজ্ঞতা এবং প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও মানসের একটি স্পষ্ট চিত্র এতে বিধৃত। জাতকের কাহিনীগুলির রচনাকাল অবশ্য কোন এক সময়ে নয়; বুদ্ধদেবের জন্মের আগেও এর অনেক কাহিনী প্রচলিত ছিল; বুদ্ধদেবের সমসাময়িককালে এবং তারও পরবর্তীকালে প্রায় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত জাতকীয় রচনাধারা প্রবাহিত ছিল।

লোকসাহিত্য-বিশারদ বেন-ফের অভিমত অনুসারে, ঈশপের নীতিগল্প অকৃত্রিম ইউরোপীয় কাহিনী। ঈশপ কাহিনী ছাড়া অন্য যে-সব উপকথা ইউরোপে প্রচলিত আছে, তার অধিকাংশই ভারতবর্ষে উদ্ভূত। এ-ও ভারতীয় ঈশপীয় কাহিনীর পশুপক্ষীদের মধ্যে তিনি একটি পার্থক্য আবিষ্কার করেছেন। তা হচ্ছে এই যে, ভারতীয় কাহিনীতে তাদের চরিত্র মানুষের মত। ঈশপের কাহিনীতে পশুপক্ষীর চরিত্র-বৈশিষ্ট্য স্ব-ভাবে রক্ষিত।

বেন্-ফের এই অভিমত অবশ্য পণ্ডিত মহলে খুব গুরুত্বলাভ করে নি। তবুও বেন-ফে তাঁর অভিমত আরো সুদৃঢ় করার জন্য এমন কথাও বলেছেন যে ঈশপীয় নীতিগল্পগুলি ভারতীয় জাতকে এবং অন্যান্য গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়। তিনি মনে করেন যে, খ্রীষ্ট পূর্ব দু শ বৎসরের সমসাময়িককালে ঈশপের নীতিগল্প ভারতবর্ষে পৌছে গিয়ে থাকবে। যাই হোক, ম্যাকস্‌মূলার, কীথ প্রমুখ পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

ভারতীয় কাহিনীগুলি যে জাতক-সঙ্কলনের পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল ভারহুতের স্তূপ থেকে তার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, ক্যানিংহাম এই প্রাচীনতম বৌদ্ধস্তূপটি আবিষ্কার করেন। স্তূপের প্রবেশ-

দ্বারের বেষ্টনীতে জাতকীয় কাহিনীর অনেকগুলিই খোদিত। এই সমস্ত ভাস্কর্য-কৃতির আঠাশটির স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে, যার মধ্যে ঈশপীয় কাহিনীর কয়েকটিও বর্তমান। ভারহুতের ঐ স্তূপটি প্রতিষ্ঠিত হয় খ্রীষ্ট পূর্ব ২৫০-২০০ অব্দে। অতএব জাতক-কাহিনীর উদ্ভবকাল, তারও অনেক আগে, এ ধরণের অনুমান অযৌক্তিক নয়। শুধু তাই নয়, জাতকের কাহিনীগুলি যে মূলতঃ হিন্দুকাহিনী, এ ধরণের উক্তিও পঞ্চতন্ত্র অবলম্বনে প্রমাণিত হতে পারে। ক্যানিংহামের এই স্তূপের আবিষ্কার প্রচারিত হওয়ার পর পাশ্চাত্য জগতের লোকযানী পণ্ডিতেরা বিশেষ অসুবিধা অনুভব করেন, কারণ এঁদের অনেকে ঈশপের কাহিনীকেই পৃথিবীর প্রাচীনতম ফোকটেল্স্ নামে অভিহিত করেছিলেন এবং এই ধারণাকে সযত্নে পোষণ করে চলেছিলেন।

জাতকের বহু কাহিনীর সঙ্গে ঈশপীয় কাহিনীর মিলকে একেবারে আকস্মিক বলা যায় না, যদিও পৃথিবীর সর্বত্র আদিম সমাজে সমান্তরালভাবেই বহু উপকথার উদ্ভব ঘটেছে। অবশ্য এই তত্ত্ব অবলম্বন করে কোন বিজ্ঞানসম্মত লোকযানসূত্র গ্রহণ করা যায় কি না, তা একান্তভাবে বিচার্য বিষয়। ভারতীয় কাহিনীতে গ্রীক প্রভাবের কথা আলোচনা করার পূর্বে একথা চিন্তা করা উচিত যে, ঈশপীয় কাহিনীর অনেককাল আগে থেকেই ভারতবর্ষে বিস্ট ফেবল বা আদিপশুকথার বহুল প্রচলন ছিল। শুধু জাতক নয়, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে এসবের প্রমাণ বর্তমান।

আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করার পর থেকেই গ্রীসের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে তারই ফলে ঈশপের ফেবলগুলি ভারতবর্ষে যে আসে, এ কথা কিন্তু ঠিক নয়। কারণ, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের বহু পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষ ও গ্রীসের মধ্যে পরোক্ষ সংযোগ সাধিত হয়েছিল পারস্যের মাধ্যমে এবং পারস্য থেকে এশিয়া-মাইনরের মাধ্যমে।

খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে (৫২১-৪৮৬) পারস্য অধিপতি দারিয়ুস-এর পার্সিপোলিস নামক স্থানের লিপিতে ইন্দাস ও গান্ধার জনের কথা উল্লেখিত আছে। ইন্দাস ও গান্ধার জনেরা তাঁর কাছে উপঢৌকন বহন করে এনেছিল। সেই সময় ভারতবর্ষীয় নানা কাহিনী পারস্যদেশে পরি-

গৃহীত হয়ে থাকবে এবং সেগুলি ক্রমে ক্রমে আরও পশ্চিমাভিমুখী হয়ে গ্রীস দেশে পৌছেছিল, এমন চিন্তা অযৌক্তিক নয়। .বেন্‌-ফে নিজেই পারসিক আহিকার গল্পে ভারতীয় রীতির আবিষ্কার করেছেন এবং এই কাহিনী খ্রীষ্ট পূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর বলে প্রমাণিত।

জাতকের কাহিনীগুলিও মূলতঃ বৌদ্ধ নয়; পঞ্চতন্ত্র, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে এই সব কাহিনীর বেশ কয়েকটি বর্তমান। ভারতীয় প্রাচীন উৎস থেকে বিনির্গত হয়ে কাহিনীগুলি পঞ্চতন্ত্র, জাতক ও মহাভারতে প্রবেশ করে।

পরবর্তীকালে জাতকের ৪৮ সংখ্যক কাহিনী চশারের ক্যান্টারবেরি টেলস-এ পাওয়া যায়। ২১৮ ও ২১৫ সংখ্যক জাতককাহিনী লা-ফতেঁর্‌ ফেবলস-এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এগুলি নিশ্চয়ই, পঞ্চতন্ত্রের মাধ্যমে ইউরোপে প্রবেশ করেছিল। পঞ্চতন্ত্রের একটি অযাথার্থ ভারতীয় পাণ্ডুলিপি থেকে কতকগুলি কাহিনী সাসসানিদের রাজা খস্‌রু আনোসেরবান-এর জন্য পহ্‌লবী ভাষায় অনূদিত হয়। খস্‌রু আনোসেরবানের রাজত্বকাল ৫৩১ থেকে ৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। পহ্‌লবী ভাষার এই অনুবাদ পরে অবলুপ্ত হয় কিন্তু সিরীয় ও আরবী ভাষায়, পরে কলিল্‌হ ও দিম্‌নহ্‌ নামে এই গ্রন্থের সাক্ষাৎ মেলে; ইংরাজীতে যার নাম ফেবলস অব বিদপাই—বিদ্যাপতির গল্প।

বলা যেতে পারে, পঞ্চতন্ত্রের উপকথাগুলি পরবর্তীকালে জাতকের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং এইগুলিই ঈশপের গল্পের ভিত্তিভূমি তৈরী করে দেয়; শুধু তাই নয়, রূপান্তরিত হয়ে ঈশপীয় কাহিনীর মধ্যেও উপস্থিত ঘোষণা করে।

পঙ্কতন্ত্রের পশুপক্ষিসংক্রান্ত কাহিনীগুলির প্রাচীনতা সম্পর্কে যতই সন্দেহ থাক না কেন, সেগুলি ঈশপের পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষে ছিল এবং প্রাচীন পারসিকদেব মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মান পণ্ডিত বেন-ফে এই অভিমত প্রদান করেন যে, বৌদ্ধ-জাতক কাহিনীগুলি ব্রাহ্মণ্য পঞ্চতন্ত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হয় পরে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীগুলি মধ্যযুগে Fables of Bidpai বা বিদ্যাপতির গল্প নামে ইউরোপে চলে যায়। কিন্তু ডক্টর হার্টেল পঞ্চতন্ত্রের আদিরূপ 'তন্ত্রাখ্যায়িকা' সম্পাদিত করে প্রকাশ করেন এবং প্রমাণ করেন যে, কাহিনীগুলিতে কোনরূপ বৌদ্ধপ্রভাব নেই।

বলাবহুল্য, এই সব বহুবিতর্কিত অভিমত থেকে এ কথা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ করা যায় নি যে ঈশপ ভাবতবর্ষের নিকট সম্পূর্ণভাবে ঋণী অথবা তিনি সম্পূর্ণভাবে অঋণী। সম্ভবতঃ, এই কারণেই আর একটি অভিমতে বলা হয় যে, ঈশপের কাহিনীগুলি গ্রীক বা ভারতীয় কিছুই নয়; কাহিনীগুলি সেমীয় এবং ঈশপ ছিলেন সেমেটিক; কাহিনীগুলি সেমীয় জাতির সম্পত্তি এবং তার ধারা দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে ভারতবর্ষে ও গ্রীসে প্রবাহিত। মোটের উপর এই বিতর্কে, ইতিহাসের সূত্রগুলি প্রাচীনত্বের জটিলতায় এত বেশী আকীর্ণ যে, শেষ পর্যন্ত কোন একটি সুষ্ঠু সমাধানে পৌঁছানো সম্ভবপর হয় নি। বরং, এ বিষয়ে এম্যানুয়েল কলেজেব ই. জে. টমাস-এব অভিমতটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

"By Aesop we mean the Greek fables of various dates which have become collected under that name. Although the tradiations as to the historical existence of Aesop are of no value, it is significant that Phrygia occurs most frequently as the home of Aesop. The name is probably Phrygian. Aesopos is the name of a river of Phrygia and Mysia and also of a Trojan at the siege of Troy. The 'priority' or rather independence of Greek fable may be considered certain, but if in the case of a few it is necessary to infer a connexion with the East, then we have a natural explanation in the relations of the Greeks of Asia Minor with their Eastern neighbours and with Persia. Greek relations with Persia need no detailed proof. The Persian Herodotus referred to on Jataka shews how such stories could easily pass to Greece."

মর্মার্থ—ঈশপের সব গল্পই ভারতীয় নয়, কিন্তু বেশ কিছু ভারতীয় অনুপ্রবেশ সেখানে বর্তমান।

ঈশপের নীতিগল্প

ঈশপের ফেবল বা নীতিগল্প, প্রাচীন গ্রীসে এবং ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে, প্রায় দু হাজার বছর ধরে সাধারণ নীতির এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ঈশপীয় কাহিনীগুলির চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লক্ষ্য করা যাবে যে, জনসাধারণের মনে এই সব কাহিনীর প্রভাব প্রায় ধর্মগ্রন্থের বাণীর মতই। সমাজবিধির প্রবক্তা হিসাবে এই সব কাহিনীর মূল্য এখনও অপরিবর্তিত। মহাজন-বাক্যের চেয়ে ঈশপের নীতিগল্পগুলি স্বাভাবিক কারণেই বেশী জনপ্রিয় হয়েছিল। কারণ, গল্পের মাধ্যমে নীতি-প্রচার যত সহজে হতে পারে, কোন আদর্শযুক্ত গুরুভাষণে তত সহজ হয় না। বলাবাহুল্য, পৃথিবীর সর্বত্র সাধারণ মানুষ চিরকালই কাহিনীর মাধ্যমে নীতিশিক্ষা লাভ করেছে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যে তাই নীতিগল্পের সংখ্যা অগিণত। এই কারণেই ঈশপের গল্পকে কেউ যদি—'most popular moral and political class-book' নামে অভিহিত করেন, তা হলে তা মোটেই অতিকথন হবে না।

যে সমস্ত প্রবাদবাক্য ও প্রবচনাদি আজও ইংরাজি ভাষায় প্রচলিত এবং ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে যেগুলি ভারতীয় ভাষাতেও নানাভাবে পরিগৃহীত, সেগুলির গ্রীকরূপ কি ছিল, তা আমাদের অনেকরই কাছেই অজ্ঞাত, কিন্তু ইংরাজি প্রবচনগুলি আজও বর্জিত হয়নি ; হীরকের মতই সেগুলি এখনও দীপ্যমান এবং মানুষের পথনির্দেশক হিসাবে যেগুলির মূল্য এখনও অস্বীকৃত নয়। ঈশপের কাহিনীর সেই নির্যাসবাক্য আজও খাপখোলা তরোয়ালের মতই ঝলসে ওঠে এবং সাধারণ মানুষ এখনও সেগুলিকে অবলম্বন করে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করার চেষ্টা করে।

বস্তুতঃ, ঈশপীয় কাহিনীর প্রবাদ প্রবচনগুলির অসাধারণ সম্পর্কে সন্দেহ করার কোন কারণ আজও ঘটেনি।

আঙুর বড় টক, পর্বতের মূষিক প্রসব, একতাই বল, বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা, সততাই মূলধন, দুর্জনের ছলনার অভাব হয় না,* প্রভৃতি প্রবচনগুলি আমাদের মনের মধ্যে, প্রতিষ্ঠিত সত্যের মতই অটল। এগুলি সরাসরি ঈশপীয় কাহিনী থেকে অনুবাদ করে নেওয়া। অবশ্য সংস্কৃত নীতিবাক্য ভারতীয় বিভিন্ন ভাষাতে প্রচুর পরিমাণে রূপান্তরিত হয়ে ঘর বেঁধেছে। কিন্তু তার ফলে 'ঈশপ' কিন্তু বিচলিত নন।

ভারতীয় সংস্কৃত-সাহিত্যে নীতিবাক্যের সংখ্যা এত বেশী যে, সেগুলিকে অনায়াসে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের নীতিবাক্যের উৎস বলেও মনে হতে পারে। ঈশপীয় নীতিবাক্যগুলিকে অতি সহজেই সংস্কৃত-ভাষার মধ্যে আবিষ্কার করা যায়। কারণ ঈশপীয়-কাহিনী বহু বহু পরিমাণে সংস্কৃত প্রভাবিত। পৃথিবীর সর্বত্র সমতাযুক্ত সাধারণ নীতিবোধের ফলেও একদেশের নীতিবাক্যের সঙ্গে অন্য এক দেশের নীতিবাক্যের আক্ষরিক সম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাধারণতঃ, এইসব প্রবাদ প্রবচনের মূলে এক একটি কাহিনী বর্তমান। সে কাহিনী কালক্রমে লোকে বিস্মৃত হতে পারে, কিন্তু কাহিনী থেকে আহরিত নীতিবাক্য কেউই বিস্মৃত হয় না। Popular moral বা জনপ্রিয় নীতিবাক্যরূপে সেগুলি যুগের পর যুগ প্রবাহমান থাকে।

* ঈশপ থেকে সংগৃহীত সুপ্রচলিত ইংরাজী প্রবচন :

1. Grapes are sour. 2. Look before you leap. 3. Figures are not always facts. 4. The mountain in labour. 5. Familiarity breeds contempt. 6. Men are blind to their own faults. 7. To do the right thing in right time. 8. A tyrant never wants a plea. 9. Slow and steady wins the race. 10. Example is better than precept. 11. Necessity is the mother of invention 12. A bird in the hand is worth two in bush. 13. Quality comes before quantity. 14. Union is strength. 15. Honesty is the best policy. 16. Spare the rod and spoil the child. 17. To bell the cat. 18. There is more danger from a prentended frined than from an open enemy. 19. Do boldly what you do at all.

ঈশপের অবস্থিতির কাল, কিংবদন্তী হলেও সেই কালটি খ্রীষ্ট জন্মের পাঁচ-ছশ বছর পূর্বের এবং ইতিহাসের পাতায় বিশেষ ভাবে চিহ্নিত। প্রাচীন গ্রীসের বিখ্যাত সপ্ত মনীষী তখন বর্তমান; জ্ঞানে-বিজ্ঞানে গ্রীসের চেহারা তখন বিস্ময়কর। সবকিছুর উপরে মানুষের বুদ্ধিকে প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা এই সময় স্পষ্ট হয়ে ওঠে; জন্ম বংশ আভিজাত্য বিচার না করে বিদ্যা-বুদ্ধি বিচার করার প্রবণতা দেখা দেয়। ফলে, ক্রীতদাস ঈশপও কেবলমাত্র তাঁর উইট-এর জন্য সম্মান লাভ করেন।

ঈশপের নিজের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য, তাঁর ফেবলগুলির বৈশিষ্ট্য থেকেই অনুমান করা যেতে পারে। সাধারণতঃ ধর্মের বিধান হিসাবে, মহাজনবাক্য তখন মানুষের উপর চেপে বসতো; মানুষ নীতিশিক্ষা করতো ধর্ম যাজকদের কাছে। ঠিক সেই সময় ঈশপের অতি সাধারণ কাহিনী, আরও সাধারণ মানুষের কাছে ঘরের মানুষের মত আত্মীয়তার সুরে কথা বলতে সুরু করে। ঈশপ ভালোভাবেই জানতেন যে, ক্রীতদাসের 'সামন' বা বাণী কেউ সহ্য করবে না, কিন্তু ক্রীতদাসের মুখ থেকে উদ্ভট গল্প শুনতে কেউ আপত্তি করবে না। ঈশপ আরো জানতেন যে, রাজসভায় কিংবা গুণী-সভার, কেউ-ই ঈশপের মুখ থেকে—sophisticated বা গুরুগম্ভীর জ্ঞানাত্মক বাক্য শুনতে চাইবেন না; ঈশপ আরো জানতেন, মানুষের চরিত্র সম্পর্কে সরাসরি স্পষ্টবাক্য শুনলে, তাঁর ধৃষ্টতাকে ক্ষমার অযোগ্য বলে মনে করা হবে। আরও একটি কথা তিনি জানতেন যে, তিনি যতই জন-সাধারণের লোক হন না কেন, তাঁর গল্পের প্রাথমিক কাজ সুরু হবে রাজ-সভায় এবং রাজসভাকে সন্তুষ্ট করাই তাঁর প্রাথমিক কাজ। কারণ, রাজসভা থেকেই তাঁর কাহিনী এবং যে বস্তু রাজসভাতে গৃহীত হবে, তা জনসভাতেও বেশী পরিমাণে জনপ্রিয়তা লাভ করবে। অবশ্য ঈশপের কাহিনীগুলি জনসভায় তা যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রখ্যাতি লাভ করবে সে বিষয়ে বুদ্ধিমান ঈশপ সম্ভবতঃ নিসন্দিগ্ধ ছিলেন। ঈশপ আরও জানতেন যে, রাজসভায় যে কাহিনী শোনানো হবে, তাতে রাজার গুণ-বর্ণনার ক্ষেত্রটি অনুজ্জ্বল রাখলে চলবে না, তা সে পশুরাজেরই হোক বা দেবরাজেরই হোক। অতএব শুধু উপদেশ দানের জন্য নয়, মনোরঞ্জনের জন্যই তাঁকে

গল্প বলতে হবে, নতুবা নির্বাক থাকতে হবে। He must speak to please or not speak at all.

অর্থাৎ—ঈশপের মধ্যে বুদ্ধিমান, আত্মসচেতন এবং সরস গল্পকারের এক সমন্বিত রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এ কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, ঈশপ ছিলেন রাজসভার বিদূষক। বিদূষকের কাজ হচ্ছে বিদূষণ বা তোষামোদীর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা। ভাঁড়ের মুখে উদ্ভট এবং সরস কথা রাজকার্যের পরে বিশ্রান্তালাপের সময় অবসর বিনোদনের সহায়ক বলে গণ্য হত। ঈশপের নীতিকাহিনীগুলিতে ভাঁড়ামীর কোন পরিচয় নেই।

হয়তো বা গল্পের জন্যই কেউ কেউ ঈশপের গল্প উপভোগ করে থাকবেন এবং এও হতে পারে যে ঈশপ সজ্ঞানে কোন নীতিশিক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। কিন্তু গল্পগুলি যে গল্পহিসাবে নয়, নীতিহিসাবেই সাধারণের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল,—তা গল্পগুলির আকার থেকেই বোঝা যায়। আর যদি ঈশপীয় কাহিনী অতি প্রাথমিক অ্যানিমেল টেলস-ও হয়ে থাকে, তা হলে ঈশপীয় কাহিনীরূপে যখন তার আবির্ভাব, তখন সেগুলি পুরোপুরি নীতিগল্প ছাড়া আব কিছু নয়। একজন বিদেশী সমালোচকের মতে He came to amuse but remained to instruct. এও অনুমান করা যেতে পারে যে সম্ভবতঃ ক্রিশাস তাঁর সপ্ত সভারত্নের গভীর মননশীল-তার কাছ থেকে যা পেয়েছিলেন, তার চেয়ে ঢের বেশী সহজ সত্য শিখে-ছিলেন ক্রীতদাস ঈশপের নিকটে।

বলাবাহুল্য, কোন সহজ সত্যকেই সহজভাবে কোন দিনই বলা যায় না। বাইবেলের পূর্বখণ্ডে সলোমন কর্তৃক সঙ্কলিত নীতিবাক্যগুলিও সত্য কিন্তু সহজভাবে বলা হয় নি। ঈশপ কিন্তু তা পেরেছিলেন। ক্রীসাসের সপ্ত সভারত্নের অন্যতম রত্ন সোলোনের সঙ্গে ঈশপের তুলনা করে একজন সমালোচক বলেছেন—"While Solon held the School masters' rod over the philosophical monarch, Aesop conciliated alike his will and his reason by timely drollery and subtilely conveyed advice.

ঈশপের কাহিনীগুলিকে যথার্থভাবে drollery বা উদ্ভটভাবে হাস্যকর বলা যায় কিনা তা বিচার্য, কিন্তু মজার গল্প হিসাবে সেগুলি-হয়ত বা droll Stories-এর অন্তর্গত। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, ঈশপকে ভাঁড়ের পর্যায়ে ফেলা অসম্ভব। তা'ছাড়া এই সব কাহিনীর মাধ্যমে ঈশপ অনেক সময় জ্ঞানগম্ভীর উপদেশও দান করেছিলেন বলে জনশ্রুতি আছে।

এই কাহিনীর মাধ্যমেই তিনি করিন্থ্-এর অধিবাসীদের সাবধান করে দিয়েছিলেন mob-Law বা জনতার আইন সম্পর্কে। এই কাহিনীকেই পরে স্বয়ং সক্রেটিস পদ্যাকারে রূপায়িত করেছিলেন। এথেন্সের অধিবাসীদের কাছে 'দেবরাজ জুপিটার এবং ভেকসমূহ' নামক কাহিনী বলে, রাজা-প্রজা সবাইকে তিনি সময়োচিত উপদেশ দান করেছিলেন। ডেল্‌ফির অধিবাসীদের ক্ষুদ্রবুদ্ধির কাছে শুভবুদ্ধির আবেদন জানিয়ে তিনি নাকি ঈগল ও গোবর-পোকার কাহিনী বলেছিলেন; কিন্তু ডেল্‌ফির অধিবাসীরা তাতে কর্ণপাত না করে তাঁকে হত্যা করেছিল।*

কিন্তু একথা ঠিক,—তৎকালীন এথেন্সের কোন সুনাগরিকের মুখে যদি ঈশপের গল্প এবং তার নীতিবাক্য না শোনা যেত, তা'হলে তাকে সুনাগরিক বলা চলতো না।

একথাও অবধারিত সত্য যে, ঈশপের নামে প্রচলিত সমস্ত কাহিনীই ঈশপের সৃষ্ট নয়; কিন্তু এমন এক সময়ে সেগুলি প্রচারিত হয়েছিল যখন কঠিন খাঁটি কথাকে সহ্য করার মত মানসিক উদারতা হারিয়ে ফেলেছিল

30 পৃষ্ঠার ফুট-নোটের পরবর্তী আরো কয়েকটি প্রবচন :

20. To pay one back in one's own coin.
21. Test a man's profession by his practice.
22. Physician heal thyself.
23. Those who cry loudest are often the least heart.
24. Skill is superior to strength.
25 Keep your place and it will keep you.

* The enraged guardians of the temple of the great God of Greece, hurled the unfortunte fable-maker headlong from one of the Phaedrian precipieces.

সবাই। সভ্য সমাজের জটিলতা ও স্বার্থবুদ্ধির কাছে তখন সরলতা এবং শুভবুদ্ধি পরাজয় বরণ করেছে। ঠিক সেই সময়ে ঈশপের আবির্ভাব। শিশুমনোরঞ্জক মজার কাহিনী রচনা করে এবং আদিম মানুষের গল্পকথনের শৈশব পর্যায়কে অবলম্বন করে তিনি জাতির চরিত্র গঠন করতে চেয়েছিলেন। মজার কাহিনীর আবরণে তিনি মনুষ্য-চরিত্রের বিশ্লেষণ করলেন, কেন-না— সরাসরি সমালোচনার মাধ্যমে বা উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে খাঁটি কথা বললে সবাই আহত হত।

ঈশপের কাহিনী সেকালে শিশুমনোরঞ্জনের জন্য কথিত হয়নি, নাগরিক চরিত্র শোধনের জন্য কথিত হয়েছিল এবং বাস্তবিকপক্ষে কাহিনীগুলি গ্রীক-জাতির প্রাথমিক রাজনীতি ও সমাজনীতি শিক্ষার অঙ্গ হিসাবেই গ্রহণ করা হয়েছিল। জেম্স্ টমাসের উক্তিতে—Thus fable was not, in those times, a child's plaything but a nation's primer. Tyranny and rebellion were alike stayed by this only word of wisdom that passion would listen to…It was not the result of profund contemplative philosophy in a popular garb, but it was the off-hand, readymade weapon of a man of action,—one who united presence of mind with presence of wit,—who saw his opportunity and knew how to use it.

উপরি-উক্ত বক্তব্যটি একান্তভাবেই যথার্থ। গভীর মননশীলতার মাধ্যমে উপলব্ধ সত্য বা দর্শন প্রচারের জন্য ঈশপীয় কাহিনীগুলি রচিত হয়নি অথবা কোন সাধারণ ছদ্মবেশে অসাধারণ ব্যক্তিত্বও এর মধ্যে লুকিয়ে নেই; দৈনন্দিন সাধারণ অভিজ্ঞতাই—সার্বিক প্রয়োজনের জন্য সহজ এবং জনগ্রাহ্য-রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর মধ্যে একটি জাতির প্রাথমিক সমাজ-বোধের দৃষ্টান্ত রক্ষিত।

শুধু তাই নয়, গ্রীক রাজনীতির জগতেও ঈশপের কাহিনীগুলি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। হিমেরার নাগরিকদের কাছে অত্যাচারী ফালারিসের সম্পর্কে স্টেটিকোরাস (খৃঃ পূঃ ৫৫৬) যখন সাবধান-বাণী উচ্চারণ

করেছিলেন, তখন সেই বাণীর অনুষঙ্গ হিসাবে তিনি অশ্ব এবং হরিণের গল্প বলেছিলেন। 'দেবরাজ জুপিটার ও ভেকসমূহ' নামক কাহিনী বলে ঈশপ নিজেই পেইসিসট্রেটাস ও এথেন্সবাসীদের সাবধান করে দিয়েছিলেন। জন-ধনাগার থেকে অর্থ আত্মসাৎ করার অভিযোগে সামিয়ার নাগরিকগণ যখন এক ব্যক্তিকে চরম শাস্তি দিতে মনস্থ করেছিল, ঈশপ তখন তাদের কাছে শৃগাল ও সজারুর কাহিনী বলে তাদের নিরস্ত করেছিলেন।

শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য পারস্যরাজ সাইরাস যখন আইওনীয়দের আহ্বান করেছিলেন, তখন তারা সাইরাসের কথায় কর্ণপাত করেনি; কিন্তু সাইরাসের বিজয়বার্তা শুনে ওরা যখন তাঁর কাছে দূত পাঠায়, তখন তিনি তাদের অন্য জবাব না দিয়ে বংশীবাদক জেলের কাহিনীটি বলেছিলেন। হেরোডোটাস্ তাঁর গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন।

বিখ্যাত গ্রীক বাগ্মী ডেমোস্থেনিস, এথেন্স-এর অধিবাসীদের কাছে, নেকড়ের পাল ও মেষপালের কাহিনী বলে ওদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, যদি ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করে ডেমোস্থেনিসকে ফিলিপের হাতে তুলে দিয়ে চায়, তা'হলে তারা দেশের অতন্দ্র প্রহরীকে হারাবে (They will surrender the watch dog of the state.)।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে বিখ্যাত পণ্ডিত অ্যারিস্টটল তাঁর অলঙ্কার সংক্রান্ত গ্রন্থে কয়েকটি কাহিনীর উল্লেখ করেছেন।

মোটের উপর একথা ঠিক যে, ঈশপের কাহিনীগুলি গ্রীক জগতের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল। পরবর্তী কালে তা ইউরোপের সর্বত্র জনশ্রুতিতে এবং সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল এবং প্রায় দু'হাজার বছর ধরে নৈতিক এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারার অঙ্গীভূত ছিল।

ঈশপীয় কাহিনীর শেষাংশে যে সব নীতিবাক্য ইংরাজী সংস্করণ থেকে পাওয়া যায় এবং যেগুলিকে ঈশপীয় বলেই মনে করা হয়, সেগুলিকে আদি ও অকৃত্রিম মনে করার কারণ নেই; সেগুলি পরবর্তী কালের সংকলয়িতাদের সংযোজন মাত্র। সংকলনের পূর্বে কাহিনীগুলি স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবেই নীতি বহনে সমর্থ ছিল। পরে নানা সংযোজন, পরিবর্তন ও

পরিবর্ধনের মাধ্যমে কাহিনীগুলির রূপান্তর ঘটে থাকবে সংকলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, এগুলির সঙ্গে কোনরূপ নীতিবাক্য সংযুক্ত থাকার সম্ভাবনা ছিল না ; কারণ গল্পকার কোন বিশেষ অবস্থার বা ঘটনার অনুকূলে বা প্রতিকূলে উদাহরণস্বরূপই এক-একটি নীতি-গল্প বলতেন। এবং বিশেষ অবস্থা বা ঘটনা অনুসারে কাহিনী থেকে নীতি আহরণের কোন অসুবিধা অনুভূত হত না। পরবর্তী কালে ইংরাজী অনুবাদে প্রয়োজন অনুসারে নীতিবাক্য সংযোজিত হয়েছে। যেখানে প্রয়োজন অনুভূত হয়নি—সেখানে নীতি-বাক্য উপস্থাপিত হয়নি।

গল্পকার ঈশপ

রাজ-অনুগ্রহ লাভ ক'রেও ঈশপ তাঁর কাহিনীগুলির মধ্যে তৎকালীন ধনশালী ব্যক্তিদের বিশেষ গুরুত্ব দান করেননি। কাহিনীগুলি মূলতঃ আদিম সমাজের পশু-কাহিনীর উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এর অধিকাংশই ঈশপের মৌলিক রচনা নয়; তবু ঈশপ কোনো কোনো কাহিনীর রচয়িতা হ'তেও পারেন। অন্ততঃপক্ষে ঈশপই তো কাহিনীগুলির মূল প্রবক্তা। গ্রীক রাজসভার অনুগ্রহভাজন হয়েছিলেন ব'লে চাটুকারিতার আশ্রয় গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। তাঁর কাহিনীর মধ্যে ধনশালী ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠিত ক'রে তিনি আরো ধনপুষ্ট হ'তে পারতেন। কিন্তু ঈশপ যথার্থভাবে লোক-শিক্ষক ছিলেন, তাই সাধারণ মানুষের দিকেই তাঁকে দৃষ্টিপাত করতে হয়েছে এবং সামাজিক দুর্বলতা ও আত্মম্ভরিতাকে বিদ্রূপ করতে হয়েছে। ক্রীতদাস ছিলেন ব'লেই, এই কাহিনীগুলির আড়ালে থেকে তিনি আত্মরক্ষা করেছেন। তাই তৎকালীন সমাজে প্রতিষ্ঠিত সম্পদশালী ব্যক্তি, নাগরিক, পণ্ডিত, রাজা, রাজকর্মচারী প্রভৃতিদের সম্পর্কে তিনি নীরব থেকেছেন; তাদের সমাজকে বা ব্যক্তিত্বকে সরাসরি পরিস্ফুট না ক'রে কিংবা তাদের গুণ-বর্ণনায় কালক্ষেপ না ক'রে ঈশপ যে রীতির আশ্রয় গ্রহণ ক'রে তৎকালীন মানুষের চরিত্রকে বিশ্লেষণ করেছেন, তাতেই ঈশপের মহিমা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

ঈশপের কাহিনীতে যারা দলবদ্ধভাবে উপস্থিত হয়েছে, তাদের মধ্যে রাজা নেই, আছে পশুরাজ সিংহ, রাজকর্মচারী নেই, আছে সিংহ-পরিবৃত পশুকুল, প্রজা নেই, আছে দলবদ্ধ ভেক অথবা মেষপাল। বলা বাহুল্য, ঈশপ যদি সরাসরি ব্যঙ্গপ্রবণ হতেন, তা' হলে সবাই আহত হ'ত এবং লোকশিক্ষার কোনো উদ্দেশ্যই তাতে সংসাধিত হ'ত না।

মানুষের দুঃখ-বেদনা-হতাশা এবং অসহায়তার প্রতি গভীর সহানুভূতি ছিল ব'লেই ঈশপ মানুষের প্রতিভূরূপে মনুষ্যেতর প্রাণীকে তাঁর কাহিনীর মধ্যে স্থান দিয়েছেন। কেননা, সহানুভূতিও যদি স্পষ্টবাক্য উচ্চারণ করে তা'হলে অনেক সময় তা' অপ্রিয় সত্যের মতোই প্রতিভাত হয়; তিনি মনুষ্য-চরিত্রের দুর্বলতা এবং কপটতাকে সরাসরি আঘাত করার পন্থা গ্রহণ না ক'রে গল্পের মাধ্যমে বক্তব্যকে প্রিয় করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোথাও তা' কাহিনীত্বকে গৌণ ক'রে রূপক হয়ে ওঠেনি।

লক্ষণীয় বিষয়,—ঈশপীয় কাহিনীগুলিতে সাধারণতঃ হাস্যরস একান্তরূপেই গৌণ। অন্ততঃপক্ষে সরব হাস্যের পক্ষে ঈশপীয় গল্প অনুকূল নয়। উদ্ভটত্ব থাকলেও নীতিশিক্ষা-মূলক কাহিনী সবসময় বিশুদ্ধ হাস্যরসের বাহন হ'তে পারে না। বিশেষ' করে,

মনুষ্যেতর প্রাণী যেখানে মুখ্য স্থানের অধিকারী সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের কোনো অসঙ্গত আচরণ বয়স্ক মানুষের কাছে হাস্যরসের আধার হ'য়ে ওঠে না। কিন্তু ইতর প্রাণী যখন মানুষের মতো আচরণ করে এবং কোনো কোনো সময় নিজের ত্রুটিতে হাস্যকরভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়, তখন উদ্ভটত্বের জন্যই কৌতুক রসের সাক্ষাৎ মেলে, কিন্তু তাতে হাস্যরস কোনক্রমেই মহিমান্বিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, ঈশপের হাতুড়ে ব্যাঙ-ডাক্তারের গল্পটি স্মরণ করা যেতে পারে। ব্যাঙ-ডাক্তার তার পঙ্কাশ্রয় থেকে বহির্গত হ'য়ে বলেছিল যে, সে হচ্ছে স্বয়ং ধন্বন্তরী, সর্বরোগের বিনাশকারী। গলা ফাটিয়ে, চেঁচিয়ে, সবাইকে বলেছিল,—চলে এস আমার কাছে; সব রকম ব্যাধির হাত থেকে আমি তোমাদের নিষ্কৃতি দান করবো। এক শেয়াল তার কথা শুনে ব'লেছিল—যে নিজের গায়ের ফোস্কা-পড়া চামড়া ভালো করতে পারে না, সে আবার অপরের অসুখ সারাবে কি ক'রে? বলা বাহুল্য, মনুষ্যেতর প্রাণীদের মানবিক আচরণে বয়স্ক মনে কিছুটা কৌতুক রসের উপলব্ধি হ'তে পারে, কিন্তু মানুষের অসঙ্গত আচরণই একমাত্র হাস্যরসের আধার।

ঈশপের কাহিনীতে এ ধরনের কাহিনী খুবই কম। একটিমাত্র উদাহরণ—একজন লোক ও তার দুই ভার্যার কাহিনী। দুই ভার্যার অসঙ্গত আচরণ এবং দুই নৌকায় পা দেওয়ার ফলে বিব্রত, দুর্দশাগ্রস্ত একটি মানুষের দুর্ভোগ অতিশয় হাস্য-করুণ।

কাহিনীটি গ্রীস দেশে উদ্ভূত ব'লে মনে হয় না; প্রাচ্য দেশ থেকে আগত ব'লেই মনে হয়। কারণ প্রাচ্য দেশে এ ধরনের ঘটনা এবং এ ধরনের কাহিনী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। তা'ছাড়া কাহিনীটি ঈশপীয় বৈশিষ্ট্য ও মৌলিকতার সঙ্গে সংযুক্ত নয় এবং তৎকালীন গ্রীসের সাধারণ বিবাহ-বিধির সঙ্গেও যুক্ত নয়। কাহিনীর প্রারম্ভেই বলা হয়েছে···'একদা যখন বহুপত্নী গ্রহণের রীতি ছিল···।' '···সেই সময় এক আধবয়সী লোক হঠাৎ দু'জন নারীর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে দু'জনকেই পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিল; লোকটির চুলে তখন সবেমাত্র পাক ধরতে আরম্ভ করেছে। দুই ভার্যার মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত তরুণী, সে তার পতিকে, নিজের মতো অল্পবয়সী ক'রে দেখতে চাইত; তাই পতির মাথা থেকে আধপাকা, ধূসর চুল এক-একটি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে মাথাটি কালো ক'রে রাখতে চাইত। ওদিকে যে পত্নীর বয়স বেশী সে চাইত স্বামীকে যেন একটু বয়স্ক দেখায়। তাই সে স্বামীর মাথা থেকে কালো চুলগুলো পট্‌পট্‌ ক'রে ছিঁড়ে ফেলত। নিরুপায় স্বামীর অবস্থা সহজেই অনুমেয়। অবশেষে সেই দ্বিভার্য ব্যক্তিটি নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে দেখল যে, সেখানে আর একটি চুলও অবশিষ্ট নেই।

মধ্যবয়সে পত্নী গ্রহণের পরিণাম এবং অদূরদর্শিতা, স্ত্রৈণতা প্রভৃতির জন্য স্বামীর অবস্থা করুণ হ'লেও, গল্পটি হাস্যরসাত্মক; অবশ্য, বিশুদ্ধ হাস্যরসের মধ্যে কারুণ্যের

অবস্থিতিও অনিবার্য। লক্ষণীয় হচ্ছে এই যে,—এ কাহিনীর মধ্যে উইট্ নেই, হিউমার আছে এবং পরিশেষে যে নীতিবাক্যটি সংযোজিত, তা' কাহিনীটির বিশ্লেষণমাত্র। অবিশ্লেষিতরূপে উক্ত গল্পের চরিত্র এবং বক্তব্য যেভাবে স্বতঃপ্রতিষ্ঠিত, নীতিবাক্য সংযোজনের ফলে তার ব্যাহতি ঘটেছে। নীতিবাক্যটিতে বলা হয়েছে,—যে ব্যক্তি অন্যান্য দলের চাপে নিজের নীতি বিসর্জন করে, পরিণামে তার কোনো নীতিই থাকে না। বলা বাহুল্য, এ ধরনের নীতিবাক্য যে আরোপিত, তা সহজেই বোঝা যায়।

অন্ততঃপক্ষে দুটি কাহিনীতে পশুদের অসঙ্গত আচরণে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে। তার কারণ, অবশ্য, পশুদের পশুসুলভ আচরণের মধ্যে নিহিত নয়; মানবিক আচরণের মধ্যেই নিহিত। একটির নায়ক স্বয়ং পশুরাজ সিংহ;—প্রেমান্ধ ব'লেই মূর্খ। অন্য গল্পের নায়ক এক গর্দভ,—যার ঈর্ষা হাস্যকরভাবে মনুষ্যোচিত।

এই প্রসঙ্গে এ-কথা স্মরণীয় যে,—ঈশপের গল্পে মনুষ্যেতর প্রাণীরা সাধারণতঃ নিজেদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য বর্জন করেনি। যেখানে তা' বর্জিত হয়েছে, সেইখানেই তারা মনুষ্য-সমাজের প্রতিভূ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তাই তাদের অসঙ্গত আচরণকে মানবিক দুর্বলতার অঙ্গরূপেই গ্রহণ করা যায় এবং সেই কারণেই তা' হাস্যকর হ'য়ে ওঠে। সিংহের স্বভাবে যে শৌর্যবীর্য এবং হিংস্রতার পাশবিক মহিমা বর্তমান, প্রেমান্ধ সিংহ তার সম্পূর্ণ বিপরীত ব'লেই হাস্যকর।

পশুরাজ একদা এক কাঠুরিয়া দুহিতার প্রেমে পড়ে, লাজুক প্রেমিকের মতোই কাঠুরিয়ার কাছে তার কন্যার পাণি প্রার্থনা করলো। সিংহের স্বভাবে প্রার্থনা অপেক্ষা দাবিই স্বাভাবিক; আবেদন নিবেদন নয়, হরণের দিকেই তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কিন্তু গোড়ার দিকে সে যেন আত্মবিস্মৃত হয়েছিল। কাঠুরিয়া যখন সিংহের এই প্রার্থনায় কর্ণপাত করেনি, তখন অবশ্য সে স্বমূর্তি ধারণ করে,—কাঠুরিয়ার অসম্মতিকে ধৃষ্টতা মনে ক'রে গম্ভীর গর্জনে কেশর ফুলিয়ে, নখদন্ত বিস্ফারিত ক'রে দাঁড়িয়েছিল। দেখে, কাঠুরিয়া বলেছিল,—প্রভু, আমার মেয়ে তোমার বধূ হবে, এর চেয়ে আনন্দের আর কি হ'তে পারে। শুনে, গর্বে আমার বুক ফুলে উঠছে, আমি হব কিনা স্বয়ং পশুরাজের শ্বশুর! কিন্তু আমার আপত্তির কারণ ছিল অন্যক্ষেত্রে। আমার মেয়ে ঐ তীক্ষ্ম নখ আর হিংস্র দাঁত দেখে ভয়ে মূর্ছা যেতে পারে। তবে, তুমি যদি সেগুলিকে বর্জন ক'রে আসতে পার, তা'হলে হয়তো আমার মেয়ে তোমাকে খুব ভালবাসবে। সিংহ বলল,—এ তো সামান্য কথা! এক্ষুনি আসছি আমি। বলে, প্রেমান্ধ সিংহ নিজের দাঁত ভেঙে, নখ ভেঙে ফিরে এল, আর নখদন্তহীন পশুরাজকে শেয়ালের মতো লাঠি-পেটা ক'রে কাঠুরিয়া তাড়িয়ে দিল অনায়াসে।

কাহিনীর মধ্যে বিশদভাবে বর্ণনা করা নেই, সিংহ কিভাবে তার নখদন্ত বিসর্জন করেছিল। কল্পনা করা যেতে পারে, প্রেমান্ধ সিংহ নিজের নখদাঁত ভাঙছে পাথরে ঘষে ঘষে; রক্তাক্ত আহত সিংহ আর্তনাদ ক'রে উঠছে, কিন্তু ভাঙার আর বিরাম নেই। প্রেমের জন্য সব-কিছুই সহ্য করা যায়।

মোটের উপর এ কাহিনীর মাধ্যমে মনুষ্য-চরিত্রের দুর্বল দিকের প্রতি যেমন ব্যঙ্গের তীর নিক্ষেপ করা হয়েছে, তেমনি মানুষের বুদ্ধির প্রতিও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে। সিংহকে সিংহরূপেই গ্রহণ করলে, তার বিপর্যয়ে কৌতুক অনুভব করতে পারি, কিন্তু সিংহকে যখন প্রেমান্ধ মানুষের প্রতিভূ হিসাবে গ্রহণ করি, তখনই তার আচরণ হাস্যকর হ'য়ে ওঠে।

প্রভুর কোলে উঠে আরাম ক'রে বসবার জন্য ল্যাপ-ডগের বা কোল-কুকুরের আচরণ হাস্যকর নয়, কিন্তু ঐ কাজের জন্য কোনো গর্দভের আচরণ হাস্যকর। অবশ্য, আচরণের চেয়ে আচরণের কারণই হাসির কারণ। গৃহস্বামী প্রতিদিন যখন কর্মক্লান্ত অবস্থায় গৃহে ফিরত, তখন তার আদরের ছোট্ট কুকুরটি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে কাপড় টেনে, আঁচড়ে কামড়ে, নানাভাবে তার আনন্দ প্রকাশ করতো; তারপর গৃহস্বামী যখন চেয়ারে বসে কুকুরটিকে কোলে তুলে নিত, তখন কুকুরটি চুপ ক'রে কোলে বসে থাকত। গৃহস্বামীর পালিত গর্দভটি এতে যথেষ্ট ঈর্ষাতুর হ'ল। কারণ, ওকে কোনোদিন কোলে তোলা তো দূরের কথা, একটু আদরও কেউ তাকে করেনি। গৃহস্বামী তো ফিরেও তাকাত না। গর্দভ ভাবল, তার নিজের আচরণের ত্রুটি হচ্ছে কোথাও। তাই, একদিন বিশ্রামরত গৃহস্বামীর কোলে ওঠার জন্য সে লাফালাফি. দাপাদাপি ক'রে খুর দিয়ে গৃহস্বামীর কাপড়-জামা আঁচড়ে, কোলের উপর পা তুলে দিয়ে, এক বিপর্যয় কাণ্ড বাধিয়ে বসলো। গৃহস্বামীর আর্তনাদ আর গর্দভের উল্লসিত চীৎকার শুনে, ভৃত্যবর্গ এসে গর্দভকে পিটিয়ে তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দিল।

এই গল্পের নীতি যাই হোক না কেন, কাহিনীটি নিঃসন্দেহে হাস্যরসের পর্যায়ভুক্ত।

এছাড়া অন্যান্য সব কাহিনীই নীতিবাহী গল্প।

ঈশপীয় কাহিনীর স্বরূপ

ঈশপের কাহিনীতে মনুষ্যেতর যে সব প্রাণী বর্তমান, তার মধ্যে সিংহ, শৃগাল, নেকড়ে, কুকুর, মেষ, ষাঁড়, ছাগল, গাধা, ঘোড়ারই প্রাধান্য। সিংহ, শৃগালই প্রধান ভূমিকায়। অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে আছে,—হরিণ, ভালুক, সজারু, বানর, ইঁদুর, ছুঁচো, ব্যাঙ, সাপ, বাদুড়, ফড়িং, গুবরে পোকা, বিছে এবং কাক, ময়ূর, মোরগ, চিল, সারস, বাজ, তিমি, শুশুক ইত্যাদি। হাতী, বাঘ, গণ্ডার, অজগর, মহিষ প্রভৃতি জন্তু ঈশপের কাহিনীতে অনুপস্থিত।

অ্যানিমেল টেল্‌স্‌ বা আদি উপকথার এই চরিত্রগুলি ঈশপকে লোকসাহিত্য হিসাবে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করেছে। কাহিনীতে মনুষ্যেতর প্রাণীগুলির আচার-আচরণ সাধারণতঃ স্বাভাবিক, যদিও গল্পের জন্য তাদের মুখের ভাষা পাশবিক নয়, মানবিক। তবে কোন কোন সময় তাদের আচার-আচরণে এবং চিন্তায়—মানবিক প্রভাব যে একেবারেই পরিলক্ষিত হয় না, তা' নয়।

এই সমস্ত মনুষ্যেতর প্রাণীই মানুষের কল্পনাকে সবচেয়ে আগে অধিকার করে। তাই অ্যানিমেল টেল্‌স্‌-ই মনুষ্য-সমাজে উদ্ভূত সর্বপ্রধান কথা ও কাহিনী। রূপকথার জগৎ, অলৌকিকতার জগৎ এবং আত্মিকতার জগৎ মানুষের কল্পনায় অনেক পরে এবং সভ্যতার অগ্রগতির পর্যায়ক্রমে উদ্ভূত। স্বাভাবিক জীব-জগতের চরিত্রগত এবং আচরণগত বৈচিত্র্যের সঙ্গে মানুষের পরিচয় অত্যন্ত প্রাথমিক এবং আদিম কালের। স্থূলভাবে প্রকৃতি-বোধের মধ্যেই মনুষ্যের প্রথম বোধোদয়। অন্যান্য জীবজন্তুর সঙ্গে পরিচিত হ'তে হ'তে মানুষ ক্রমশঃ বুঝতে পেরেছিল,—কোন্‌ প্রাণী হিংস্র, কোন্‌ প্রাণী মূর্খ, কোন্‌ প্রাণী ধূর্ত, কোন্‌ প্রাণী বলবান, কোন্‌ প্রাণী দুর্বল; কোন্‌ প্রাণী বর্জনীয়, কোন্‌ প্রাণী পালনীয়। এর ফলে, বিভিন্ন প্রাণী চরিত্রকে অবলম্বন ক'রেই আদিম গল্পের সূত্রপাত এবং পরবর্তী কালে বিভিন্ন প্রাণী চরিত্র বিভিন্ন গুণের প্রতীক হ'য়ে দাঁড়ায়। তখন সিংহ মানেই হিংসা এবং শৌর্য-বীর্য-মহিমা, শৃগাল মানে ধূর্ততা, মেষের অর্থ দুর্বলতা-অসহায়তা। এইভাবেই কয়েকটি বিশেষ প্রাণী এক-একটি গুণবাচক নামের গণ্ডিতে স্থিরচিহ্নিত হ'য়ে যায়।

ঈশপের কাহিনীতে যে লোকায়াত উপাদান (folk element) বর্তমান তা' এই সব প্রাণীকুলকে অবলম্বন ক'রেই এবং এ সবই লোকয়ানের (folklore)-এর প্রাথমিক পর্যায়ের। পরবর্তী পর্যায়ভুক্ত অলৌকিক পশুকথা (animal myth) ঈশপের গল্পে নেই।

নীতি-শিক্ষার জন্য রচিত বা কথিত না হ'লেও, ঈশপের কাহিনীগুলিকে শিশুমনো-রঞ্জক ঘটনাপ্রধান কাহিনী হিসাবে গ্রহণ করা চলতো। অবশ্য, ঘটনাপ্রধান কাহিনীর বিস্তৃতি এতে নেই এবং তার কারণ এই যে, কাহিনীগুলিতে প্রাথমিক পর্যায়ের অতি সংক্ষিপ্ত কল্পনাই বর্তমান। তবে নীতিকথার পর্যায়ভুক্ত হ'য়ে এই কাহিনীগুলি লোক-সাহিত্যের প্রাথমিকতাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু জাতক বা পঞ্চতন্ত্রের মতো সাহিত্যিক লোককথাও হয়নি।

ঈশপের কাহিনীতে যে সব মানুষ এসে ভীড় জমিয়েছে, তারা কেউ অসাধারণ নয়। সবাই অতি-সাধারণ এবং লোকায়ত চরিত্রের কাহিনীর মধ্যে মেষপালক, কাঠুরিয়া, শিকারজীবী, কৃষক, জেলে, গোয়ালিনী প্রভৃতি গ্রাম-জনের প্রাধান্যই বেশী। এদের প্রকৃতি নাগরিক সভ্যতার কৃত্রিমতার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না ব'লেই এরা প্রকৃতির কাছাকাছি থাকে। তাই প্রাণি-জগতের সঙ্গে এদের সম্পর্ক অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ। তাই এই সমস্ত চরিত্রই লোকসাহিত্যের আদি ও অকৃত্রিম উপাদান।

গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীর দেবতা জুপিটার, মার্কারি, নেপচুন, মিনার্ভা, অর্ধ দেবতা স্যাটির এবং বীরগাথার নায়ক হারকিউলিস প্রভৃতি ঈশপের কাহিনীতে স্থান লাভ করেছে। অবশ্য, এ সবই গৌণ এবং পরবর্তী কালের সংযোজন। যাই হোক্, ঈশপের কাহিনীগুলিকে আমরা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ক'রে দেখতে পারি যে, কোন কাহিনীতে কেবল পশুই বর্তমান, কোন কাহিনীতে পশু ও মানুষ একত্রে, আবার কোন কাহিনীতে পশু-পাখি অথবা শুধুই পাখি।*

ঈশপীয় ফেবল্-এর মধ্যে কয়েকটি animal myth (অলৌকিক পশুকথা) এবং কয়েকটি nature myth (প্রকৃতি পুরাণ)-ও আছে। পশু-পাখির যুদ্ধ ও বাদুড় এবং জুপিটার ও উষ্ট্র—এই দুটি কাহিনী মূলতঃ nature myth. আদিম মানুষের প্রকৃতি-জিজ্ঞাসাই এর মধ্যে পরিস্ফুট। বাদুড় কেন দিবালোকে মুখ লুকিয়ে থাকে, উটের পিঠে কুঁজ হ'ল কি ক'রে—প্রভৃতি কৌতূহলের অবৈজ্ঞানিক উত্তর পাওয়া যায়—animal myth-এ। এই দুটি কাহিনীকে আরও বৃহত্তর গণ্ডিতে টেনে এনে animal tales-এর পর্যায়ভুক্ত করা যায় ব'লেই ফেবল্-এর মধ্যেও এগুলি স্থান লাভ করেছে। আসলে, এ সব কাহিনী ফেবল্-এর স্বগোত্র নয়, স্বজাতি মাত্র।

* কাহিনীগত অবস্থায় পাওয়া যায়—১। শুধু মানুষ; ২। শুধু পশু; ৩। শুধু পাখি; ৪। পশু ও মানুষ; ৫। পশু ও পশু; ৬। পাখি ও পাখি; ৭। পশু ও পাখি; ৮। পোকামাকড়; ৯। মানুষ ও সাপ; ১০। মানুষ ও বৃশ্চিক; ১১। অচেতন পদার্থ; ১২। বৃক্ষ; ১৩। ফল; ১৪। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; ১৫। জলচর; ১৬। জলচর ও উভচর; ১৭। মানুষ ও দেবতা; ১৮। মানুষ ও অর্ধ-দেবতা; ১৯। প্রকৃতি।

Nature myth-এ ও প্রকৃতির নানা রহস্য সম্পর্কে মানুষের কৌতূহলও জিজ্ঞাসার অবৈজ্ঞানিক এবং কাল্পনিক উত্তর। বলা বাহুল্য, যে-কোন মিথ্-ই মানুষের কল্পনার ও সৃষ্টির আদি স্তরের বস্তু। Nature myth-এর মাধ্যমে জীব-জগতের বাইরে বিশ্ব-প্রকৃতির বিচিত্র রূপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ও তার উত্তর থাকে। রামধনুর সাতটি রঙ কেন, আকাশের রঙ নীল কেন, সমুদ্র গর্জন করে কেন, পৃথিবী কার মাথায় বর্তমান—প্রভৃতি নানাবিধ প্রশ্ন যখন আদিম মানুষকে ক্লিষ্ট করতে আরম্ভ করে, তখন কল্পনা ও বিশ্বাস মিশ্রিত হ'য়ে মিথ্-এর উদ্ভব ঘটে।

ঈশপের গল্পে বিশুদ্ধ Nature myth-এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না,—তবে সূর্য ও পবন, সূর্যের বিবাহ প্রভৃতি কাহিনীতে তার আভাস আছে। গ্রীক-পুরাণের অনেক দেবতাই অবশ্য গৌণভাবে কোন কোন কাহিনীতে বর্তমান, কিন্তু Nature myth-এর সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক নেই।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঈশপীয় কাহিনীর প্রত্যেকটির ভেতর দিয়ে কোন-না-কোন রূপ নীতি প্রচারিত হয়েছে, কিন্তু বহু কাহিনীতে নীতি অপেক্ষা গল্পরসের পরিমাণই মুখ্য। পশু-পাখির যুদ্ধ, প্রেমান্ধ সিংহ, এক ব্যক্তি ও তার দুই ভার্যা, ভেনাস ও বিড়াল, পর্বতের মূষিক প্রসব, কুক্কুট ও রত্ন, কাঠুরিয়া ও জলদেবতা প্রভৃতি কাহিনীর মধ্যে নীতিরস অপেক্ষা গল্পরসেরই প্রাধান্য। তবু নীতি-সন্ধানী দৃষ্টিতে এ-সব কাহিনীতেও নীতির সন্ধান পাওয়া যায়।

এ-সব কাহিনীতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষেব চরিত্রগত ও নীতিগত ত্রুটির প্রতি সজাগ দৃষ্টিপাত আছে, কিন্তু সাধারণতঃ কোন তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের মধ্যে তা' পরিস্ফুট হয়নি। পরিবর্তে ঈশপের সহানুভূতি ও কোমলচিত্ততা বহু কাহিনীতেই বর্তমান। শিকারী ও একচক্ষু হরিণের গল্পে যে নীতিই থাকুক না কেন, একচক্ষু হরিণের মৃত্যুবরণ আমাদের সহানুভূতিব উদ্রেক করে। নেকড়ের কবলে নিরীহ মেষশাবকের সেই ভয়কম্পিত অসহায় ছবিটি নীতির চেয়ে অনেক বড়। ঘটনার কারুণ্যই এখানে মুখ্য।

অন্ততঃপক্ষে একটি গল্পে আকাশচারী চিন্তাকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। ব্যঙ্গই তাতে স্পষ্ট। যে দর্শন মাটি ছেড়ে আকাশে ওঠে, যে দার্শনিক মানুষকে অস্বীকার ক'রে কোন বিশুদ্ধ আইডিয়াতে পৌঁছতে চান, তাঁকে সেই নক্ষত্রবিদ্ জ্যোতিষীর সঙ্গে তুলনীয় করা যেতে পারে—যিনি নক্ষত্র গণনা করতে করতে গর্তে পতিত হয়েছিলেন।

The Two Wallets (দুটি থলে) নামক গল্পটি একেবারে কাহিনীশূন্য ; ভূয়োদর্শনের ফসল।

ঈশপীয় কাহিনীগুলিতে স্বাভাবিক কারণেই পরস্পরোক্তির প্রাধান্য আছে। কাহিনীগুলি নিছক বর্ণনাত্মক বা narrative নয়। মনুষ্যেতর প্রাণীরা নিজেরাও

মনুষ্যের ভাষায় কথা বলছে, মানুষের সঙ্গেও সেই ভাষায় কথা বলেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সংলাপ অতি স্বল্পকালের, কাহিনী যত ক্ষুদ্র, সংলাপও তত ক্ষুদ্র। কিছু কিছু গল্প অবশ্য স্বগতোক্তির পর্যায়ভুক্ত। শৃগাল ও দ্রাক্ষাগুচ্ছ, কুক্কুট ও রত্ন এই পর্যায়ের গল্প।

ঈশপীয় নীতি-গল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তার ভাষায়। সাধারণের কাছে সাধারণ ভাষাতেই ঈশপ তাঁর গল্প শুনিয়েছেন। মনে হ'তে পারে, অতি প্রাচীন লোককথার কোন ভাষাগত পরিবর্তন ক'রে ঈশপ সাহিত্য সৃষ্টি করতে চাননি। নিরলঙ্কৃত, স্বল্লায়তনিক এবং সর্বজনবোধ্য কথার মাধ্যমে তিনি লোকসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে পেরেছেন। কাহিনীর মধ্যে কোন জটিলতার সৃষ্টি না ক'রে চরিত্রগুলির স্পষ্ট স্বাভাবিকতা রক্ষা করা হয়েছে। অথচ প্রতিটি নীতিবাক্যের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্ত সংযুক্তির ফলে এই কাহিনীগুলি যে কোন বুদ্ধিমান ও হৃদয়বান মানুষের সম্পদরূপে পরিগণিত হ'ত। কোন সুধী ব্যক্তি এই নীতি-গল্পগুলিকে 'তৎকালীন কর্মী মানুষের কাছে খাপ-খোলা তরোয়াল' নামে অভিহিত ক'রে, ফেব্‌ল্‌ সম্পর্কে যথার্থভাবেই বলেছেন—

"a readymade weapon of a man of action—one who united presence of mind with presence of wit—who saw the opportunity and knew how to use it."

ভারতীয় সাহিত্য ও ঈশপের গল্প

পঞ্চতন্ত্র, জাতক, হিতোপদেশ, মহাভারত প্রভৃতি ভারতীয় সাহিত্য থেকে ঈশপের ঋণ সম্পর্কিত আলোচনায় ম্যাক্সমুলার, কীথ, উইন্টারনিজ, হার্টেল প্রভৃতি মনীষীদের অভিমত বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। একথা বলা চলে যে, ঈশপ ভারতবর্ষের কাছে ঋণী হলেও, ঈশপের সব গল্প ভারতীয় প্রভাবে উৎপন্ন নয়; তবে বহু গল্পই ভারতবর্ষ থেকে লব্ধ। শুধু ঈশপের মধ্যেই নয়, পৃথিবীর বহু অংশের নানা কাহিনীর সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা ক'রেও একথা অনায়াসে বলা যায় যে, এক দেশের কাহিনী আর এক দেশের কাহিনীর উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং ভারতবর্ষই এ-বিষয়ে অগ্রগণ্য। উইন্টারনিজ-এর বক্তব্য থেকে একথা বিশেষভাবে বোঝা যায়।[১] তা'ছাড়া, বহু প্রাচীন কাল থেকেই যে ভারতীয় নীতিগল্পের প্রচলন ছিল, সে সম্পর্কে বহুবিধ প্রমাণও পাওয়া গেছে। হার্টেল বলেন,—It is certain that greater part of the best Greek fables have been taken from India.

প্রসঙ্গত:, জাতকের বিভিন্ন কাহিনীর সঙ্গে ঈশপীয় কাহিনীর একটি তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। সে সব কাহিনীর অনেকগুলি পঞ্চতন্ত্রের মধ্যেও পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, পঞ্চতন্ত্র, জাতক ও ঈশপীয় নীতিগল্পের মধ্যে প্রাপ্ত কাহিনীগুলির কয়েকটির শিরোনামের উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ক) সুবর্ণপুরীষোৎসর্গী পক্ষী—পঞ্চতন্ত্র
সুবন্নহংস জাতক—জাতক
স্বর্ণডিম্বপ্রসূ হংসী—ঈশপ

(খ) ব্যাঘ্রচর্মাবৃত গর্দভ—পঞ্চতন্ত্র
সীহচম্ম জাতক—জাতক
সিংহচর্মাবৃত গর্দভ—ঈশপ

(গ) আকাশচর কূর্ম—পঞ্চতন্ত্র
কচ্ছপ জাতক—জাতক
ঈগল ও কচ্ছপ—ঈশপ

(ঘ) কাকোলূকীয়—পঞ্চতন্ত্র
উলূক জাতক—জাতক
ময়ূর ও দাঁড়কাক—ঈশপ

১. "It is most wonderful that the Indian material has passed from nation to nation in such a way that we find in almost all the

এ ছাড়াও, পঞ্চতন্ত্র, জাতক ও মহাভারতের বহু কাহিনীর প্রভাব ঈশপের মধ্যে অনায়াসে আবিষ্কার করা যায়। তাতে মূল কাহিনীগুলি কোথাও কোথাও রূপান্তরিত হয়েছে, কোথাও কোথাও বক্তব্যকে বজায় রেখে, পশুদের নাম পরিবর্তিত হয়েছে।[২] এমন কি ঈশপের 'কচ্ছপ ও শশক' নামক কাহিনীর নীতি, ঐতরেয় উপনিষদের 'চরৈবেতি, চরৈবেতি'—আখ্যাত শ্লোকের নিহিতার্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। নিদ্রিত শশক ও চলমান কচ্ছপ-এর কাহিনী থেকে এই কথাই শিক্ষালাভ করা যায়ঃ

আস্তে ভগ আসীনস্যোর্ধ্বস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ
শেতে নিপদ্যমানস্য চরাতি চরাতো ভগ—
চরৈবেতি। চরৈবেতি॥

[যে বসে থাকে তার ভাগ্যও বসে থাকে, যে উঠে দাঁড়ায় তার ভাগ্যও উঠে দাঁড়ায়, যে শুয়ে পড়ে তার ভাগ্যও শুয়ে পড়ে, যে এগিয়ে চলে তার ভাগ্যও এগিয়ে চলে। অতএব এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।]

countries of Europe and Asia and even among those of Africa, stories and fables of which the original home was India. And the fact is that not only they have individual stories, per hazard found their way from India into other countries through oral transmission by traders and tourists, but the entire bulk of Indian books, as we shall see, have through translations become common to the people of different countries. For a long time it was generally believed that India was the birthplace of all tales. But with advancement of our knowledge of folklore and ethnology this theory has been completely exploided. But the fact still remains that many tales of different nations have had their original home in India."

History of Indian Literature—Winternitz, Vol. III, I

২. ঈশপের গল্প ঃ
(ক) ইঁদুর ও ব্যাঙের বন্ধুত্ব (২১) = শেয়াল ও হরিণের বন্ধুত্ব (পঞ্চতন্ত্র)।
(খ) সিংহ ও ইঁদুর (৩১) = চিত্রগ্রীব ও ইঁদুর (পঞ্চতন্ত্র)।
(গ) সিংহ ও শেয়াল (৬৪) = জাতক।
(ঘ) জুপিটার ও উষ্ট্র (৬৫) = ইন্দ্র ও উষ্ট্র (মহাভারত, শান্তিপর্ব)।
(ঙ) বানর ও শুশুক (৭৯) = বানর ও কুমীর—জাতক।
(চ) নেকড়ে বাঘ ও ভেড়া (৮১) = ব্যাঘ্র ও কঙ্কণলোভী পথিক—হিতোপদেশ।
(ছ) সিংহ ও তিন মন্ত্রী (১০৩) = পঞ্চতন্ত্র।
(জ) মেষচর্মাবৃত নেকড়ে (১৪৫) = জাতক।
(ঝ) সিংহ ও ষাঁড়ের পাল (১৫১) = পঞ্চতন্ত্র।
(ঞ) ভেনাস ও বিড়াল = পঞ্চতন্ত্র, মহাভারত—পুনর্মূষিকোভব…
(ট) বানর ও জেলে = জাতক—বানর ও কীলক…। ইত্যাদি—॥

জাতকের কাহিনীগুলি সাহিত্যগুণে মণ্ডিত এবং জাতকের মধ্যে যে সব প্রাণি-চরিত্র বর্তমান, সেগুলি মানবিক গুণের অধিকারী এবং জাতকের মধ্যে যে ধর্মীয় উদ্দেশ্য আছে, ঈশপে তার চিহ্নমাত্র নেই। তবুও উভয় গ্রন্থের কাহিনীর মধ্যে নীতিবিষয়ক সাদৃশ্য মৌলিক। কিন্তু যথার্থভাবে কয়েকটি কাহিনীর মধ্যে এই সাদৃশ্য প্রকট। ঈশপের মূল কাহিনীও ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হয়েছে, ফলে, একথা এখন কিছুতেই বলা সম্ভব নয় যে, ঈশপীয় কাহিনীর সঙ্গে জাতকের অথবা অন্যান্য ভারতীয় কাহিনীর মৌলিক সাদৃশ্য ক্রমশঃ কিছু পরিমাণে ক্ষুন্ন হ'য়ে থাকবে।

এই প্রসঙ্গে 'জাতক' সম্পর্কে কয়েকটি জ্ঞাতব্য তথ্য উপস্থাপিত করা যেতে পারে। জাতকের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে পণ্ডিতসমাজে মতান্তর থাকলেও, জাতক-সংকলন যে খ্রীষ্টপূর্ব চারশো অব্দে সম্পন্ন হয়েছিল, সে-বিষয়ে অনেকেই একমত। জাতকের তুলনায় বৃহৎকথা, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথা সরিৎ সাগর প্রভৃতি অনেক অর্বাচীন কালের। পঞ্চতন্ত্রকে অনেকে জাতকের পূর্ববর্তী ব'লেও অভিমত প্রকাশ করেছেন। সংকলনের কাল হিসাবে পঞ্চতন্ত্রের কাহিনীগুলি জাতকের পরবর্তী হ'তেও পারে; তবে পঞ্চতন্ত্র যে সম্পূর্ণরূপে বৌদ্ধ প্রভাব-বর্জিত, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পঞ্চতন্ত্র অপেক্ষা জাতক পূর্ববর্তী না পরবর্তী—সে বিতর্কে আপাততঃ প্রবেশ না ক'রে বলা যেতে পারে যে, প্রাচীন ভারতীয় লোককথা থেকেই জাতক, পঞ্চতন্ত্র, মহাভারত, হিতোপদেশ উপাদান সংগ্রহ করেছে এবং পূর্ববর্তী গ্রন্থের প্রভাবে পরবর্তী গ্রন্থ প্রভাবিত হয়েছে।

জাতকের সব কাহিনীও একই সময়ে রচিত নয়। কিছু কিছু কাহিনী বুদ্ধজন্মের পূর্বেও প্রচলিত ছিল এবং কিছু কিছু কাহিনী বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরেও সংযোজিত হয়েছে।

শুধু ঈশপের গল্পেই নয়, প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের অন্যত্র, প্রাচ্য দেশীয় এই কাহিনীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে ডেমোক্রিটাস-কথিত কুকুর ও প্রতিচ্ছায়া নামক কাহিনী এবং প্লেটো-বর্ণিত সিংহচর্মাচ্ছাদিত গর্দভ রূপান্তরিতভাবে জাতকথবন্ননা বা জাতক কাহিনীতেও পাওয়া যায়।

মোটের উপর গ্রীস ও ভারতবর্ষের মধ্যে পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ের কাজ বহু প্রাচীন কালেই আরম্ভ হয়েছিল। পারস্য তার মধ্যস্থতা করেছে।

গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এসে দর্শনশাস্ত্র ও জ্যামিতি-বিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলেন। সেই সময় পারস্যরাজ দারায়ুস ও পরবর্তী কালে তৎপুত্র জারাকসাস গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেছিলেন। এর পূর্ব থেকেই পারস্য রাজসভায় গ্রীক ও ভারতীয়দের যাতায়াত ছিল। জারাকসাসের পুত্র আর্টাজারাকসাসের সভায় টিসিয়াস নামে যে গ্রীক চিকিৎসক ছিলেন, তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের অনেক আগে

থেকেই গ্রীক ও ভারতীয়দের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। তবে তা ঘনিষ্ঠ হয় খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে—আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় থেকে। পশ্চিম এশিয়াতে বৌদ্ধ ধর্ম-প্রচারকদের মাধ্যমেও এই সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়।

শুধু ঈশপের কাহিনীতে নয়; প্রাচীন ইহুদী সাহিত্যের মধ্যেও ভারতীয় পশু-কাহিনীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।[৩]

মোটের উপর একথা অযথার্থ নয় যে, পশু-কাহিনীর মাধ্যমে উপদেশ দানের ভারতীয় প্রথা অন্যান্য দেশেও গৃহীত হয়েছিল। অনেকে মনে করেন, বাইবেলের পূর্বখণ্ডে বর্ণিত 'সলোমনের বিচার' নামক কাহিনী জাতকের মহাউমগ্‌গ জাতক নামক কাহিনী থেকেই গৃহীত। বাইবেলের অনেক কাহিনী গৌতমবুদ্ধের জীবন-কাহিনীর রূপান্তর ব'লেও অনেকে মনে করেন।

কিন্তু আপাততঃ এ-সব বিতর্কিত বিষয়ের কোন সমাধান-সূত্র অনুসন্ধান না ক'রে ঈশপীয় কাহিনী ও জাতক কাহিনীর পারস্পরিক সাদৃশ্যের স্বরূপটি উপস্থাপিত করা যেতে পারে।

প্রথমেই ঈশপের 'নেকড়ে বাঘ ও সারস পাখি' নামক কাহিনীটি উল্লেখিত হ'তে পারে। কাহিনীটি সুপরিচিত। পুরস্কারের লোভে সারস পাখি নেকড়ের গলা থেকে হাড় টেনে বার করেছিল। কিন্তু পুরস্কার চাইতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়েছিল।[৪] জাতকথা-বন্ননায় বা জাতকের কাহিনীতে 'জবসকুনজাতক' নামক যে কাহিনী বর্তমান, তাতে নেকড়ে বাঘ নেই আছে সিংহ; সারস পাখি নেই আছে কাষ্ঠকুট্ট বা কাঠঠোকরা পাখি। [জাতকমালা নামক গ্রন্থে এই কাহিনীর নাম শতপত্র জাতক। শতপত্রকে 'মৎসাশী পক্ষী' এবং 'রাগরুচিরচিত্রপত্র' ব'লে বর্ণনা করা হয়েছে। শতপত্র পক্ষী সম্ভবতঃ মাছরাঙা জাতীয় কোন পাখি।]

জাতকের কাহিনীতে বলা হয়েছে:

ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীর রাজা, তখন বোধিসত্ত্ব একটি কাষ্ঠকুট্ট পাখিরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় এক সিংহের গলায় একটা হাড়ের টুকরো আটকে গিয়েছিল। ফলে, সিংহের গলা ব্যথায় ফুলে উঠলো। সে আর কোন কিছুই খেতে পারত না। এক কাঠঠোকরা সিংহের অবস্থা দেখে জানতে চাইল যে, তার কি হয়েছে। সিংহ যখন তার গলায় হাড় আটকে যাবার কথা বললো, তখন কাঠঠোকরা বললো—তোমার

৩. জাতকমঞ্জরী—ঈশানচন্দ্র ঘোষ (উপক্রমণিকা)।

৪. বাইবেলের Genesis XXVI—26-এ Partridge and Lion-এর কাহিনীও একইভাবে বর্ণিত।

তিব্বতীয় একটি কাহিনীতে কাষ্ঠকুট্ট (কাঠঠোকরা) ও সিংহের প্রসঙ্গে জাতকের প্রভাব দেখা যায়।৮

গলা থেকে আমিই হাড় টেনে বার ক'রে দিতে পারি, কিন্তু ভয় হয়, পাছে তুমি আমাকে খেয়ে ফেল।

সিংহ বললো—ভয় ক'রো না ভাই। তোমাকে অভয় দিচ্ছি। আমি খুব কষ্ট পাচ্ছি; তুমি শুধু গলার হাড়টা বার ক'রে দাও।

কাঠঠোকরা বললো—ঠিক আছে, তুমি শুয়ে পড। সিংহ শুয়ে পডতেই মনে মনে ভাবল, বিশ্বাস কি বনের পশুকে! তাই সে সিংহের হাঁ-এর মধ্যে দুটো লাঠি আড়া-আড়িভাবে দুই চোয়ালে ঠেকা দিয়ে রাখল। তারপর হাঁ-এর মধ্যে ঢুকে ছোট হাড়ের যে টুকরোটা দেখা যাচ্ছিল, ওটাকে ঠুকরে ভেতরের দিকে ফেলে দিতেই হাডটা চলে গেল সিংহের পেটে। তখন কাঠঠোকরা সিংহের মুখ থেকে বেরিয়ে ডানার এক ঝাপটায় ওর হাঁ-এর কাঠি দুটোকে ফেলে দিয়ে, উড়ে গিয়ে গাছের ডালে বসলো।

এর পর সিংহ ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠলো। একদিন সে একটি মেষ শিকার ক'রে তার মাংস খাচ্ছিল। কাঠঠোকরা তখন সিংহকে একটু পরীক্ষা করার চিন্তা ক'রে বললো—মশাই, আপনি তো দয়ালু, আমাদের হত্যা না ক'রে দয়া করুন। সিংহ বললো—সিংহের মুখে প্রবেশ ক'রে বেরিয়ে আসতে পেরেছিস, এর চেয়ে বেশি দয়া, বেশি প্রতিদান কি চাস?

এই কথা শুনে কাঠঠোকরা বলেছিল—মন্দলোকের কাছে প্রত্যুপকার কামনা করা বৃথা। তাদের সান্নিধ্যে থাকাও উচিত নয়। এই ব'লে কাঠঠোকরা উড়ে গেল।

লক্ষণীয় এই যে, জাতক কাহিনীর বিবরণ-অংশ বাদ দিয়ে ঈশপে শুধু সংক্ষেপিত কাহিনীটি গৃহীত। এর কারণ অবশ্য অন্য কিছু নয়,—ঈশপের নীতিগল্পগুলি মুখে মুখে লোকশিক্ষার কাজে ব্যবহৃত হ'ত, আর জাতকের কাহিনীগুলি ধর্মীয় উদ্দেশে গ্রন্থ থেকে পাঠ করা হ'ত। তাই জাতকের সাহিত্যিক মূল্য অনেক; ঈশপের সাহিত্যিক মূল্য নেই।

জাতকের সুবর্ণহংস জাতক নামক কাহিনীর সঙ্গে ঈশপের স্বর্ণডিম্বপ্রসূ রাজহংসীর মৌলিক পার্থক্য নেই। জাতকের রাজহংসের পালক সোনার, আর ঈশপের রাজ-হংসীর ডিম হচ্ছে সোনার। লোভের পরিণাম সম্পর্কেই উভয় ক্ষেত্রে নীতি প্রচার করা হয়েছে। জাতকের গল্প বিবৃত এবং শিল্পরীতিসম্মত। ঈশপে সেই কাহিনীর সংক্ষেপিত রূপ। জাতকের কাহিনীতে বলা হয়েছে: বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম-গ্রহণ করেছিলেন। তখন বারাণসীতে ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকাল। বোধিসত্ত্ব উপযুক্ত সময়ে বিবাহ করেন এবং তিনটি কন্যা লাভ করেন। কন্যাত্রয়ের নাম নন্দা, নন্দাবতী ও সুন্দরী নন্দা। পত্নী ও তিন কন্যাকে রেখে ব্রাহ্মণ দেহত্যাগ করেন এবং পরে এক সুবর্ণহংসরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বজন্মের কথা স্মরণ ক'রে তিনি তাঁর পত্নী ও

কন্যাত্রয়ের দারিদ্র্য-দশার কথা জানতে পারলেন। তিনি ভাবলেন, তাঁর স্বর্ণ পালকের এক-একটি যদি প্রতিদিন ব্রাহ্মণীকে দেওয়া যায়, তা'হলে সেই পালক বিক্রি ক'রে তারা দারিদ্র্যের কবল থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে। তাই তিনি তাঁর পূর্বজন্মের বাড়ীর ছাদে গিয়ে বসলেন। সোনার হাঁস দেখে তাঁর কন্যারা জিজ্ঞাসা করলো—প্রভু, তুমি কোন্ দেশ থেকে এসেছ? সোনার হাঁস বললো—আমি তোমাদের পিতা। দেহত্যাগ ক'রে স্বর্ণহংসরূপে জন্মগ্রহণ করেছি; তোমাদের দুঃখ দেখে সাহায্য করতে এসেছি। প্রতিদিন তোমরা আমার এক-একটি সোনার পালক পাবে। সেই পালক বিক্রি করলে তোমরা প্রচুর অর্থ পাবে। এই ব'লে একটি পালক দিয়ে স্বর্ণহংস উড়ে গেল। প্রতিদিন এইভাবে এক-একটি পালক পেয়ে, ওরা প্রভূত সম্পদের অধিকারিণী হয়ে উঠলো।

একদিন সেই কন্যাত্রয়ের জননী কন্যাদের বললো—ইতর প্রাণীকে বিশ্বাস করতে নেই; কখন যে আসবে, কখন আসবে না তার ঠিক কি? তোমরা এবারে হাঁসের সব পালকগুলি ছিঁড়ে নিও। মেয়েরা বললো—না না, স্বর্ণহংসের যন্ত্রণা হবে এতে। এমন কাজ করা উচিত হবে না মা। কিন্তু লোভের বশবর্তী হয়ে পরের দিন স্বর্ণহংসকে বেশ আদর ক'রে ডাকলো— আর্যপুত্র একবার আমার কাছে আসুন। স্বর্ণহংস কাছে আসতেই তার সব পালক একে একে টেনে খুলে নিল। স্বর্ণহংস উড়ে পালাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারল না। তখন ব্রাহ্মণী তাকে ধরে খোঁয়াড়ে ভরে রাখল।

ব্রাহ্মণী যে পালকগুলি খুলে নিয়েছিল, সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে সাদা হয়ে গেল। পরে খোঁয়াড়ের মধ্যে স্বর্ণহংসের যখন পাখা গজাল, তখন সেগুলিও সাদা পালকই হল। হংস উড়ে পালিয়ে গেল। হংসরূপী বোধিসত্ত্ব আর কোনদিনই তাঁর পূর্বজন্মের পত্নী ও কন্যার খোঁজ করতে আসেননি।

জাতকের 'সীহচম্মজাতক' এবং ঈশপের 'সিংহচর্মাবৃত গর্দভ' একই কাহিনী। কিন্তু উপস্থাপনায় যে পার্থক্য আছে তাতেই বলা যেতে পারে যে, জাতকের কাহিনীটি যুক্তিপূর্ণ; তুলনায় ঈশপের কাহিনীতে যুক্তির অভাবই পরিলক্ষিত হয়। ঈশপের গাধা সিংহের চামড়া প'রে অন্যান্য প্রাণীদের ভয় দেখিয়ে বেড়াত। কিন্তু ওর কণ্ঠস্বর শুনে, এক শেয়াল ওকে গাধা ব'লেই চিনতে পারল। ফলে, নীতিবাক্যের স্বরূপ দাঁড়াল—যে যা' নয়, তা' হতে গিয়ে যখন বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলে, তখনই ধরা পড়ে যায়।

জাতকের গল্পটি খুবই যুক্তিসঙ্গত। গাধা তাতে অকারণে সিংহচর্মে আচ্ছাদিত হয়নি। কাহিনীতে বলা হয়েছে:

ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীর রাজা, তখন বোধিসত্ত্ব এক কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন এবং উপযুক্ত সময়ে কৃষিকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। সেই সময়ে এক বণিক তার গাধার

পিঠে সওদাপত্র চাপিয়ে বিক্রি ক'রে বেড়াত। যেখানেই যেত, সেখানে মালপত্র নামিয়ে, গাধার পিঠে এক সিংহচর্ম বেঁধে গাধাটাকে ধানক্ষেতে ছেড়ে দিত। গাধাকে সিংহ ভেবে, কেউ আর ওদিক দিয়ে হাঁটতো না। গাধাও মনের সুখে কৃষকদের ফসল খেয়ে পরিপুষ্ট হত। একদিন বণিক এক গাছতলায় রান্না চড়িয়ে গাধাটাকে এক যবের ক্ষেতে ছেড়ে দিল। পাহারাদার সিংহ দেখে ভয়ে চেঁচামেচি করতে করতে দৌড়াল গ্রামের দিকে। ওর কথা শুনে গ্রামের লোকজন ঢাকঢোল পিটিয়ে সিংহকে তাড়িয়ে দেবার জন্য এল। হৈ-হট্টগোল শুনে গাধা ভয় পেয়ে চেঁচাতে লাগল। বোধিসত্ত্ব তখন বললেন,

বাঘ নয় সিংহ নয়
এমন কি চিতা নয়
আরে আরে ওটা এক গাধা।
পিঠেতে জড়ানো এক সিংহের খোলস।

লোকেরাও ওর আসল রূপটি চিনতে পেরে লাঠি-পেটা ক'রে গাধার কোমর ভেঙে দিল। তা দেখে বণিক বললো—

গাধা—নেহাৎ গাধা—,
বুদ্ধিশুদ্ধি থাকলে ওটা ছাড়তো না'ক ডাক
গাধা নেহাৎ গাধা।
তা' নৈলে ছদ্মবেশে থেকে—
অনায়াসে ফসল ক্ষেতে চবতো ফসল খেতে,
কিন্তু যেমন গাধার মত কাজ—
ফলও হল তেমনি কোমর ভাঙা।

এই কথা বলতে বলতেই গাধার মৃত্যু হল।

জাতকের এই কাহিনী যে অত্যন্ত স্বাভাবিক, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভারতীয় রচনাকারের নিপুণতাও এতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।[৫]

জাতকের 'জবুখাদক জাতক' এবং ঈশপের 'কাক ও শেয়াল', নামক নীতিগল্পের মধ্যে সাদৃশ্য স্পষ্ট, যদিও বক্তব্যের পার্থক্য আছে। ঈশপের শেয়াল কাকের মিথ্যা প্রশংসা ক'রে তার মুখের পনীরটি খেয়ে কাকের মূর্খতার কথা ঘোষণা করতে করতে চলে গিয়েছিল।

---

৫. পঞ্চতন্ত্রে সিংহচর্মের পরিবর্তে ব্যাঘ্রচর্মের উল্লেখ আছে। গাধার মালিক বণিক নয়, রজক। রজক ওকে বাঘের চামড়া পরিয়ে রাত্রে কৃষকদের ক্ষেতে ছেড়ে আসতো এবং সকালে নিয়ে আসতো। একদিন এক গর্দভীকে দেখে উত্তেজিত গর্দভ ডেকে ওঠে এবং সকলের কাছে ধরা পড়ে যায়। কৃষকগণ গাধাকে মেরে ফেলে। কথাসরিৎসাগরে এবং তন্ত্রাখ্যায়িকায় দ্বীপিচর্মের উল্লেখ আছে। পাশ্চাত্য সাহিত্যে গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর গ্রন্থে এই কাহিনী সর্বপ্রথম উল্লেখিত।

জাতকের কাহিনীতে আছে :

ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীর রাজা, তখন বোধিসত্ত্ব এক জামগাছে বৃক্ষদেবতারূপে বাস করতেন। এক কাক সেই গাছের ফল খাচ্ছিল। এক শেয়াল ভাবলো, কাককে যদি প্রশংসা করা যায় তা'হলে হয়তো সে ঐ গাছের কিছু ফল শেয়ালের জন্য ফেলে দেবে। তাই শেয়াল চাটুবাক্য প্রয়োগ করলো :

জামগাছেতে কে বসে গো তুমি—
গান গাইছো! আহা যেমন মধু,—
মধুর স্বর!
গান গাইছো যেন কেকার রব
তার চেয়েও মধু—
মধুর স্বর—!

প্রশংসা শুনে কাক মুগ্ধ হল। তাই শেয়ালকে খুশী করার জন্য বললো :

নিজেই গুণী, মহৎ তুমি তাই—
গুণের আদর করতে জান নিজে,—।
দেখতে তুমি যেমন তরুণ বাঘ—
বন্ধু এস, গ্রহণ কর, মিষ্টি গাছের ফল।

এই ব'লে গাছের ডালে নাড়া দিয়ে কাক কিছু জাম মাটিতে ফেলে দিল। বোধিসত্ত্ব ওদের পরস্পরের চাটুকারিতা শুনে বললেন—

দুজনেই সমান মিথ্যাবাদী ;
একজন তো কাক—
গলার স্বরে কান ঢাকতে হয় ;
মড়াখেকো আর এক তো শেয়াল,—
দুজনেই সমান চাটুকার!

এই ব'লে বোধিসত্ত্ব ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ ক'রে দুজনকেই তাড়িয়ে দিলেন। ঈশপের গল্পে এই তৃতীয় জনের অস্তিত্ব নেই। শেয়ালের মুখে নিজের রূপের প্রশংসা শুনে কাক কিভাবে মুগ্ধ হয়েছিল তার বিবরণ নেই। জাতকে চাটুকারিতার প্রতি বিদ্রূপ এবং ঈশপে চাটুবাক্যে বিগলিত মূর্খের অবস্থার কথা বলা হয়েছে।

জাতকের 'মুনিকা জাতক' এবং ঈশপের 'এঁড়েবাছুর ও ষাঁড়'-এর কাহিনীর নীতিগত সাদৃশ্য আছে। ঈশপের কাহিনীতে এঁড়েবাছুরের বিদ্রূপে ষাঁড় মৌনতা অবলম্বন করেছিল, কিন্তু সেই বাছুরকে বলি দেবার জন্য যখন মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন ষাঁড় বলেছিল, নিহত হওয়ার চেয়ে ঘাড়ে জোয়াল নিয়ে কাজ করা অনেক ভালো।

মুণিকা জাতকে বলা হয়েছে :

ব্রহ্মদত্ত যখন বারাণসীর রাজা, তখন বোধিসত্ত্ব ষাঁড়রূপে এক ধনী কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ষাঁড়ের একটি ছোট ভাইও ছিল। ওরা দুজনেই প্রভুগৃহে সব কাজকর্মই করতো। কৃষকের একমাত্র কন্যার বিয়েতে ভোজ দেওয়ার জন্য কৃষক মুণিকা নামক একটি শুয়োর ছানাকে খাইয়ে দাইয়ে পুষ্ট করছিল। শুয়োরের এত আদর-যত্ন দেখে ছোট ষাঁড়টি বড় ষাঁড়টিকে বললো—দাদা, খাটবার বেলায় আমরা, আর কিছু না ক'রে ও শুয়োরটা খেতে পাচ্ছে বেশ ভালভাবেই। বড় ষাঁড় বললো—ভাই ওকে ঈর্ষা করো না। শুয়োরটি শেষ খাদ্য খাচ্ছে; মনিবের মেয়ের বিয়েতে ওকে কাটা হবে। পরে যখন বিয়ের সময় মুণিকাকে কাটা হল, তখন বড় ষাঁড় বললো—দেখলে তো ভাই! ছোট ষাঁড় বললো—দেখলুম। আমার ঘাসখড় বেঁচে থাক—সুখাদ্য খেতে আর চাইব না।

কাহিনী দুটির মধ্যে আপাতসাদৃশ্য না থাকলেও প্রভাব অনায়াসে লক্ষ্য করা যায়। এদের নীতি-সাদৃশ্য খুবই স্পষ্ট।

জাতকের বিরোচন জাতক, সুসুংমার জাতক, কচ্ছপ জাতক, দ্বীপী জাতক, উলুক জাতক প্রভৃতির সঙ্গে ঈশপের বিভিন্ন কাহিনীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

বিরোচন জাতকের শেয়াল বোধিসত্ত্বরূপী সিংহের পরিচর্যা করতো এবং সিংহকে শিকারের সন্ধান দিত। সিংহের কাছে থাকতে থাকতে শেয়ালের ধারণা হল যে, সে-ও সিংহের মতো হস্তিশিকারে সক্ষম। তাই সে সিংহের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেছিল। সিংহ তাকে নিষেধ করেছিল, কিন্তু শেয়ালের অনুনয়ে শেষ পর্যন্ত রাজী হল। অবশেষে এক হাতীর মাথায় লাফ দিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে সে হাতীর পায়ের তলায় পড়ে যায় এবং হাতীর পায়ে পিষ্ট হয়ে মারা যায়। নীতি : যার কাজ তারে সাজে।

ঈশপের সিংহ ও গাধার কাহিনী নীতিগতভাবে এক, কাহিনীগতভাবে সম্পূর্ণ এক নয়। গাধা ও সিংহ একসঙ্গে শিকার ক'রে বেড়াত। এক গুহার কাছে এসে সিংহ বসলো গুহামুখে, আর গাধা গেল গুহার মধ্যে। সেখানে লম্ফঝম্প ক'রে ও চীৎকার ক'রে ছাগলদের ভয় পাইয়ে বাইরে তাড়িয়ে দিল এবং সিংহ ওদের হত্যা করলো। গাধা এসে বললো—কেমন লড়াই করেছি? সিংহ বললো—ওরে বাবা, খুব জোর লড়াই; তোমাকে গাধা ব'লে না জানলে আমিই ভয় পেয়ে যেতুম।

কাহিনীটি বিদ্রূপাত্মক। নীতিগতভাবে জাতকের সঙ্গে এক। 'সুসুংমার জাতক' নামক কাহিনীটি ঈশপের 'বানর ও শিশুমার' নামক কাহিনীতে পরিবর্তিত রূপে বিদ্যমান। আপাতদৃষ্টিতে পরিপূর্ণ সাদৃশ্যের অভাব আছে ব'লে মনে হলেও—শুধু জাতকে নয়, পঞ্চতন্ত্রে এবং অন্যান্য ভারতীয় কাহিনীতে কুমীর ও বানরের গল্পটি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবেই মনে পড়ে।

কচ্ছপ জাতকের কচ্ছপ তার বাচালতার শাস্তি ভোগ করেছিল ; ঈশপের কচ্ছপ এক অসম্ভব ইচ্ছাকে সফল করতে গিয়ে গোঁয়ারতমির শাস্তি ভোগ করেছিল।★ কিন্তু এই প্রসঙ্গে ঈশপের উপদেশ—'অহঙ্কারের পতন' কাহিনীর সঙ্গে সবল সম্বন্ধযুক্ত নয়।

কচ্ছপ জাতকে বলা হয়েছে—বারণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব একবার জন্মগ্রহণ ক'রে বারাণসীরাজের মন্ত্রী হয়েছিলেন। ব্রহ্মদত্ত খুব বাচাল ছিলেন। রাজার এই দোষ বিদূরিত করার জন্য মন্ত্রী সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। সেই সময় হিমবন্ত প্রদেশের কোন এক সরোবরে একটি কচ্ছপ বাস করতো। সেখানে দুটি হংসপোতকের সঙ্গে কচ্ছপের খুব বন্ধুত্ব হয়। হংসপোতকের কাছে তাদের বাসস্থান চিত্রকূট পর্বতের কাঞ্চনগুহার সৌন্দর্যের বর্ণনা শুনে কচ্ছপ সেখানে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। হংসদ্বয় বলেছিল—'তুমি যদি কথা না ব'লে মুখ বন্ধ ক'রে থাকতে পার, তা'হলে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি।' কচ্ছপ বললো—'এ আর কি গুরুতর কথা। মুখ বন্ধ ক'রেই থাকবো।' তখন ওরা একটি লাঠি নিয়ে এসে কচ্ছপকে বললো—'তুমি এই লাঠির মাঝখানে কামড়ে ধরে থাকবে ; আমরা লাঠির দু'দিকে কামড়ে ধরে তোমাকে নিয়ে শূন্যপথে উড়ে যাব।'

বারাণসী নগরের কাছাকাছি এক জায়গায় কয়েকজন গ্রাম্য বালক এই অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে বলাবলি করতে লাগল,—'দেখ, দেখ, কি আশ্চর্য ব্যাপার। একটা কচ্ছপকে দুটো হাঁস উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

বালকদের এই কথা শুনে কচ্ছপের ইচ্ছা হল, বলে—'তোদের কিরে ? আমার বন্ধুরা আমাকে নিয়ে যাচ্ছে উড়িয়ে।' কিন্তু ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করার পূর্বেই অতিক্রতগামী হংসদ্বয় কচ্ছপকে নিয়ে বারণসী রাজভবনের উপরে এসে পড়লো এবং কচ্ছপের সেই কথা বলার ইচ্ছার ফলে তার মুখ খুলে গেল সেইখানেই। ফলে, রাজসভার প্রাঙ্গণে পড়ে কচ্ছপ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। ব্রহ্মদত্ত পাত্রমিত্রসহ উঠে গিয়ে কচ্ছপের সেই দৃশ্য দেখলেন। বোধিসত্ত্বের কাছে ব্যাপারটা জানতে চাইলেন রাজা। বোধিসত্ত্ব আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা ব'লে বললেন—'মহারাজ, যারা বাচাল, কিছুতেই জিহ্বা সংযত রাখতে পারে না, তাদের এই দশাই হয়।' ব্রহ্মদত্ত বললেন—'নিশ্চয়ই আমাকে লক্ষ্য ক'রে একথা বলেছ!' বোধিসত্ত্ব বললেন—'মহারাজ, সমস্ত বাচালের জন্যই এই উপদেশ।'

ঈশপের কচ্ছপ কিন্তু তার বন্ধু উৎক্রোশ বা ঈগলের কাছে তার মতো আকাশে ওড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। এই অসম্ভব ব্যাপারে ঈগল প্রথমতঃ রাজী হয়নি। পরে কচ্ছপের অতিশয় আগ্রহে ওকে নখে তুলে আকাশে নিয়ে যায়। তারপর কচ্ছপকে

★ জাতকের কচ্ছপ জাতক ও পঞ্চতন্ত্রের আকাশচর কূর্মের কাহিনী, একই।

হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে বলে, দেখ এবারে উড়তে পার কিনা। কচ্ছপ এক পাহাড়ের উপরে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল।

ঈশপের আর একটি গল্পে বলা হয়েছে, এক কচ্ছপ নিজের খোলের মধ্যে থেকে বলেছিল, কেউ তাকে ধরতে পারবে না। এক ঈগল তাকে ধরে নিয়ে উড়তে থাকে। সেই সময় এক কাক ওকে বলে—কচ্ছপকে নিয়ে উড়তে থাকলে কি হবে, ওর মাংস খাবার নিয়ম শিখতে হয়। ঈগল কাককে কিছু ভাগ দেবার প্রতিশ্রুতি দিলে, কাক বলে—কচ্ছপটাকে সোজা ছেড়ে দাও ঐ পাথরের উপর। ঈগল তাই করেছিল এবং চূর্ণীকৃত কচ্ছপের মাংস দুজনেই ভক্ষণ করেছিল।

ঈশপের নেকড়ে বাঘ ও মেষশাবকের কাহিনী একটি সুপরিচিত নীতিগল্প। অসহায় মেষশাবককে অযৌক্তিক যুক্তিতে এক নেকড়ে বাঘ কিভাবে হত্যা করেছিল, সে কাহিনী প্রায় সকলেরই জানা। কিন্তু জাতকে বর্ণিত কাহিনী ঈশপের কাহিনীর চেয়ে অনেক বেশী সুপরিকল্পিত এবং সু-রচিত। কাহিনীটির নাম "দ্বীপী জাতক" অর্থাৎ ব্যাঘ্র জাতক।

প্রব্রজ্যা গ্রহণ ক'রে বোধিসত্ত্ব একদা এক পাহাড়ের নিকটে পর্ণকুটীর নির্মাণ ক'রে বাস করতেন। সেখানে ছাগপালকেরা ছাগল চরাতে আসত। একবার এক ছাগী ছাগপালের পেছনে পড়ে গিয়েছিল; ওকে দেখে ছাগীমাংস ভক্ষণের জন্য এক বাঘের ইচ্ছা হল। তাই সে এক পর্বত-সঙ্কটের দ্বারদেশে গিয়ে দাঁড়াল। ছাগী বাঘকে লক্ষ্য করেছিল এবং বুঝতে পেরেছিল যে, তার প্রাণরক্ষা করা দায় হয়ে উঠবে। তবু সে বাঘকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করলো। দূর থেকেই প্রণাম ক'রে বললো:

মামা, মামা, নমস্কার।
মা পাঠালেন জানতে,
আছ কেমন?
খবর ভাল?

বাঘও বুঝতে পারলো যে, ছাগী তাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছে। বললো:

কেমন ভাগ্নি তুইরে আমার লেজ মাড়িয়ে এলি!
মামা বললে ছাড়ান পাবি, মিথ্যে এমন বুলি।

ছাগী বললো—মিছে কথা বলো না মামা, তোমার লেজ মাড়াবো কি করে; তোমার সঙ্গে তো আমার সামনাসামনি দেখা, লেজ তো থাকে পেছনে!

দ্বীপী বললো—হতভাগী ছাগী, কি বললি, এমন জায়গা আছে নাকি, যেখানে আমার লেজ নেই! বললো:

সাগর-পাহাড় চার মহাদেশ জুড়ে
লেজটি আমার প্রসারিত চারদিকে ;
যে দিকেই তুই থাকিস্ না কেন ছাগী—
লেজটি আমার মাড়াতেই হবে তোকে !

ছাগী যখন দেখলো যে, বাঘকে কিছুতেই মিষ্টি কথায় ভোলানো যাচ্ছে না, তখন সে শত্রুভাবেই বললো—

জানি জানি, শয়তান যে, লেজটি লম্বা তার
মা-বাপ-ভাই—সবাই আমায় বলেইছিল তাই— ;
তাই তো আমি আকাশপথে উড়েই এলুম হেথা—
কি করে ঐ লেজ মাড়ালেম আমি !

দ্বীপী বললো,—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি জানি, তুই আকাশপথেই এসেছিস, কিন্তু আসবার সময় আমার সব খাবারদাবার নষ্ট ক'রে এসেছিস্ কেন ?

ছাগী তো অবাক।

দ্বীপী বললো : তোকে উড়ে আসতে দেখে একপাল হরিণ ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। ভেবেছিলুম, ওদের খেয়ে ক্ষিদে মেটাবো। তোর জন্যই তো আমার আহার নষ্ট হল ! অতএব তোকেই আমি খাব। এই ব'লে ছাগীর কাতরোক্তিতে কর্ণপাত না ক'রে বাঘ ছাগীকে হত্যা করলো।

বলা বাহুল্য, জাতক কিংবা পঞ্চতন্ত্রের বিবৃত কাহিনীর অনেকগুলি ঈশপের মধ্যে সংক্ষেপিতরূপে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে চেহারা বদলে বর্তমান। জাতকে-পঞ্চতন্ত্রে প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সাহিত্য মিলিত হয়েছে ; ঈশপের কাহিনী একান্তভাবে প্রয়োজনীয়তার দিকেই অঞ্জলিবদ্ধ। কাহিনীর প্রয়োজনীয় অংশটুকুই ঈশপ গ্রহণ করেছেন।

মহাভারতে নীতি-প্রচারক কাহিনীর সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে যথার্থ ফেব্‌ল্‌-এর সংখ্যাও অল্প নয়।

মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত সরিৎসাগর সংবাদের সঙ্গে ঈশপের ওক গাছ এবং শর গাছের কাহিনী মূলতঃ এক। ওক গাছ বাতাসের বেগে উন্মূলিত হয়ে নদীর জলে পড়ে ভেসে যাচ্ছিল, অথচ একঝাড় শর গাছ জলের স্রোত সহ্য ক'রেও দাঁড়িয়ে আছে দেখে সে অবাক হল। শর গাছ বললো—অবাক হচ্ছ কেন ? তুমি ঝড়ের সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে উৎখাত হয়েছ ; আমরা নতি স্বীকার ক'রে যথাস্থানেই আছি।

মহাভারতে যুধিষ্ঠির শরশয্যাশায়ী ভীষ্মকে প্রশ্ন করেছিলেন—'রাজা দুর্লভ রাজ্য জয় ক'রেও সমৃদ্ধিসম্পন্ন শত্রুর কাছে কিভাবে থাকবেন ?'

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে 'সরিৎসাগর সংবাদ' নামক একটি প্রাচীন গল্প বলেন। 'একবার

সমুদ্র সব নদীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, ওরা পরিপূর্ণ হয়ে বড় গাছকে নিহত করে কিন্তু বেত গাছকে নিহত করে না কেন।' বলেছিল—'অল্পসার ও কোমল বেতস তোমাদের তীরেই জন্মে থাকে। তোমরা কি অবজ্ঞা ক'রেই ওদের ছেড়ে দাও—নাকি ওরা তোমাদের কোন উপকার ক'রে থাকে, তাই নিষ্কৃতি দাও।'

গঙ্গানদী মুখপাত্র হয়ে জবাব দিল: 'বড় বড় গাছ কখনো পরকে আশ্রয় করে না এবং যথাস্থানে থাকে। তাই তারা আমাদের বেগে স্থান ত্যাগ করে। কিন্তু বেতস ওদের সম্পূর্ণ বিপরীত। জলের বেগ দেখেই বেত অবনত হয়, কিন্তু বড় বড় গাছ অবনত হয় না। বেত বেগের কাল বোঝে, আত্মরক্ষার উপায় জানে, সর্বদা আমাদের বশীভূত থাকে, উদ্ধত হয় না,—জলবেগের অনুকূলে চলে এবং নীরবে অবস্থান করে। তাই ওরা উৎপাটিত হয়ে আমাদের স্রোতে ভেসে যায় না। যে সব লতাগুল্ম ও অন্যান্য বৃক্ষ জলের বেগে উন্নত হয় ও অবনত হয়, তারা কখনো বিনিষ্ট হয় না।'

নীতি: বুদ্ধিমান মানুষ যখন শত্রুকে নিজের অপেক্ষা অধিক বলশালী মনে করে, তখন সে যদি বেতস লতার বৃত্তি অবলম্বন করে, তা'হলে সে বুদ্ধির পরিচয়ই দেবে।

এবমেব যদা বিদ্বান্মন্যতেঽতিবলং রিপুম্।
সংশ্রয়েদ্বৈতসীং বৃত্তিমেতৎ প্রজ্ঞালক্ষণম॥

ঈশপের কাহিনীতে প্রাপ্ত জুপিটার ও উষ্ট্রের কাহিনীর সঙ্গে মহাভারতের ব্রহ্মা ও উষ্ট্রের কাহিনীব নীতিগত সাদৃশ্য বর্তমান; কাহিনীগত সাদৃশ্যও অলভ্য নয়। দুটি গল্পই animal myth বা পশু পুরাণের অন্তর্গত। দুটি কাহিনীতেই সেই প্রাথমিক কৌতূহলের অবৈজ্ঞানিক উত্তর পাওয়া যায়। দুটো কাহিনীতেই উট তার ধৃষ্টতার জন্য শাস্তি লাভ করেছে।

ঈশপের উট অন্য শৃঙ্গীদের উপর ঈর্ষাবশতঃ নিজের জন্য জুপিটারের কাছে শৃঙ্গ প্রার্থনা করেছিল। জুপিটার তার ধৃষ্টতায় অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে শিং তো দিলেনই না, উপরন্তু তার কান দুটো ছেঁটে ছোট ক'রে দিলেন।

নীতি: প্রকৃতি যা দিয়েছে, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থেকো, অন্যথায় বিপদ অনিবার্য।

মহাভারতের উটের প্রার্থনা ছিল, শতযোজন-বিস্তৃত গ্রীবার জন্য। ব্রহ্মা তার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছিলেন, কিন্তু লম্বগ্রীব হয়ে সে খুব অলস হয়ে পড়লো। খাদ্যসংগ্রহের জন্য কোনরূপ চেষ্টা না ক'রে নিজের লম্বা ঘাড়কে সে এদিকে-ওদিকে বিস্তৃত ক'রে বিচরণ করতো।

একবার ঝড়ের সময় সে তার শতযোজন-বিস্তৃত গ্রীবাকে এক গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেয়। সেখানে এক শৃগাল-দম্পতি তার গ্রীবাকে ভক্ষণ করে।—অর্থাৎ, অতি বাড়ের পরিণাম শুভ নয়।

ঈশপের আরও কয়েকটি গল্প মহাভারত থেকেই সংগৃহীত ব'লে অনায়াসে ধরে নেওয়া যায়। 'ভেনাস ও বিড়াল' নামক কাহিনীতে এক মার্জারের তরুণীত্বপ্রাপ্তির ও পুনরায় মার্জারত্বপ্রাপ্তির ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ ও মহাভারতে এই ধরনের কাহিনী বর্তমান। মূষিকের 'ব্যাঘ্রত্বপ্রাপ্তি ও পুনর্বার মূষিকত্বপ্রাপ্তির কাহিনী থেকেই ভারতবর্ষে সুপ্রচলিত প্রবাদ 'পুনর্মূষিকোভব'-এর উদ্ভব। মহাভারতে বিড়ালের তরুণীত্বপ্রাপ্তির কাহিনীও আছে।[৬]

---

৬. প্রসঙ্গতঃ, পঞ্চতন্ত্রে উল্লেখিত মূষিকার তরুণীত্বপ্রাপ্তির কাহিনীর সঙ্গে ঈশপের কাহিনীর ঘনিষ্ঠ মিল উল্লেখযোগ্য। দুটি গল্পের নীতি একই—স্বভাবকে অতিক্রম করা যায় না। দুটি কাহিনীর ঘটনাতে বিবাহ-সংক্রান্ত ব্যাপারই মুখ্য।

ঈশপের গল্পে এক বিড়ালী এক যুবকের প্রেমে পড়ে তাকে বিবাহ করতে চায়; তাই সে ভেনাসকে অনুরোধ করে তাকে এক তরুণীতে রূপান্তরিত করার জন্য। ভেনাস অনুগ্রহ ক'রে তার প্রার্থনা পূরণ করেন এবং যুবকের সঙ্গে সেই তরুণীর বিবাহ হয়ে যায়। পরে ভেনাস একদিন সেই তরুণীর সামনে একটি ইঁদুর ছেড়ে দিয়ে তার স্বভাব পরিবর্তিত হয়েছে কিনা পরীক্ষা করেন। তরুণীটি ইঁদুর দেখেই বিড়ালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ইঁদুরটিকে ধরে ফেলে। ভেনাস তখন তাকে পুনরায় বিড়ালে পরিবর্তিত করেন।

পঞ্চতন্ত্রে বলা হয়েছে—এক মূষিকা বাজপাখীর মুখভ্রষ্ট হয়ে এক মুনির কোলে পড়ে যায়। মুনি তাকে মানবীতে রূপান্তরিত করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে, তিনি প্রথমে সূর্যকে আহ্বান করেন তাঁর পালিতা কন্যার পাণিগ্রহণ করার জন্য। তরুণী বললো—সূর্যের তেজ খুব বেশী, অতএব বিবাহ করা চলবে না। এর পর একে একে—মেঘ, পবন, পর্বত এসেছিল মুনির আহ্বানে।

কিন্তু সবাইকেই প্রত্যাখ্যান করে সে। কারণ, মেঘ হচ্ছে শীতল আর কৃষ্ণবর্ণ, বায়ু হচ্ছে অস্থির, আর পর্বত হচ্ছে কর্কশ এবং শক্ত।

মুনি পর্বতকে বললেন—তোমার চেয়ে বড় কে?

পর্বত বললো—ইঁদুর।

মুনি তখন ইঁদুরকে আহ্বান করলেন। তারপর কন্যাকে বললেন—দেখ তো মা, একে বিয়ে করতে পারবে কি না।

দেখেই সে মনে মনে বললো—ঠিক আমার মতো, ঠিক আমার মতো—। তার দেহে রোমাঞ্চ, মনে শিহরণ। মুনিকে বললো—বাবা আমি একেই বিয়ে করতে চাই; তুমি আবার আমাকে মূষিক জাতিতে পরিণত কর।

মুনি তাকে পুনরায় মূষিকাতে রূপান্তরিত ক'রে মূষিকের সঙ্গে তার বিবাহ দেন।

লক্ষণীয়—ঈশপের গল্পে এই ধরনের কাহিনী অপ্রত্যাশিত। বিবরণাত্মক কাহিনী ভারতীয় রীতির কাহিনী। এই সব কাহিনী যে ভারতবর্ষ থেকেই সংগৃহীত, এ-বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না।

আঙুর এবং শেয়াল ॥ ১ ॥

এক আঙুর ক্ষেতে, সোনালী রঙের পাকা পাকা আঙুরের গুচ্ছ ঝুলতে দেখে, এক লোভী শেয়াল অতি সংগোপনে, ঢুকে পড়ল। আঃ—রসে টইটম্বুর একেবারে, এমন লোভনীয় পুরস্কার লাভের কার-না ইচ্ছা হয়! বার বার উপরের দিকে লাফ দিয়ে, শেয়াল সেই দোদুল্যমান দ্রাক্ষাস্তবক লাভের চেষ্টা করল। কিন্তু পণ্ডশ্রম—কিছুতেই তার নাগাল পেল না! নিরুপায় শেয়াল, আপন মনে বলতে বলতে চলে গেল—'পেলেই বা কি, আর না পেলেই বা কি; আঙুর তো আর মিষ্টি নয়, টক।'[১]

তীরন্দাজ ও সিংহ ॥ ২ ॥

এক দক্ষ তীরন্দাজ, পাহাড়ে গেল শীকার করতে। ওকে দেখেই, জীব-জন্তুরা ভয়ে চীৎকার করতে করতে দিক্-বিদিক ছুটে পালাতে লাগল। এমন-কি পশুরাজ সিংহও পালিয়ে যাবার কথা ভাবছিল। সিংহকে দেখে তীরন্দাজ বললে—একটু দাঁড়াও, তোমার কাছে দূত পাঠাচ্ছি, তোমার

১. জন ওয়ারিংটন-এর অনুবাদে এ ভাবে গল্প বলার চেষ্টা করা হয়নি। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে স্যর রজার এল্ এস্ট্রানজে এবং ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে টমাস জেম্স্ তাঁদের ইংরাজী অনুবাদে মূল গ্রীকের সরল সহজ রূপকে আধুনিক করতে গিয়ে, বচনভঙ্গীর ও কাহিনীর পরিবর্তন ঘটান। ফলে ইংরাজী অনুবাদে মূল গ্রীকের যথার্থতা সব সময় রক্ষিত হয়নি, উদাহরণস্বরূপ আঙুর ও শেয়ালের কাহিনী গ্রহণ করা যেতে পারে। ইংরাজী অনুবাদে, মূল গ্রীকের যথার্থতা পুরোপুরি রক্ষা করা হয়নি। নোতুন ইডিয়ম বা বাকাংশ সৃষ্টি ক'রে সে গুলিকে প্রবাদ-বাক্যের উপযোগী করা হয়েছে। যার ফলে—Grapes are sour বা 'আঙুর বড় টক'-এর উদ্ভব। শেয়ালের কথায়—'নাঃ আঙুর এখনো পাকেনি' (They are not ripe anyway) মাত্র একটি বাক্যেই কাহিনীটি সীমাবদ্ধ।

উচ্চ শাখায় দোদুল্যমান দ্রাক্ষাস্তবক দেখে, এক ক্ষুধার্ত শৃগালের তা খাবার ইচ্ছা হল কিন্তু নাগাল না পেয়ে আপন মনে বলতে বলতে চলে গেল—নাঃ, ওগুলো এখনও পাকেনি দেখছি।

কোন কোন মানুষের ক্ষেত্রেও তাই, কিছুতেই যখন তারা তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে না পারে, তখন তারা ভাগ্য বা সময়ের দোষ দেয়।

সঙ্গে সে দুএকটা কথা বলে আসবে। বলেই তীরন্দাজ সাই করে একটা তীর ছুড়লো, আর সে তীর গিয়ে লাগলো সিংহের গায়ে। ব্যথায় আর্তনাদ করতে করতে আহত সিংহ গভীর বনের দিকে ছুটে পালাতে লাগল। এক শেয়াল সিংহের অবস্থা দেখে, সিংহকে বলল—পালাচ্ছেন কেন? না-পালিয়ে শত্রুকে আক্রমণ করুন। পালাতে-পালাতেই সিংহ বলল, না—না, ওকথা আর বলো না; দূতের যদি এমনি তেজ হয়, তাহলে যে ওকে পাঠাল, তার তেজের সামনে দাঁড়াবে কে?[১]

চিল ও পায়রা ॥ ৩ ॥

চিলের ভয়ে এক ঝাঁক পায়রাকে সব সময় সন্ত্রস্ত আর সজাগ থাকতে হত। কি জানি হঠাৎ কখন বিপদ এসে পড়ে! ফলে, বাসা ছেড়ে বেশী দূরে যেতেও ভয় হত ওদের। ছোঁ মেরে পায়রা ধরার সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হচ্ছে দেখে, একদিন চিল ওদের ডেকে বলল,—ওহে, এ ভাবে ভয়ে ভয়ে সারাজীবন কাটাবে কি করে? তার চেয়ে, এক কাজ কর, আমাকে তোমাদের রাজা করে দাও; আমি তোমাদের সবরকম বিপদের হাত থেকে বাঁচাব। চিলের কথায় বিশ্বাস করে, ওরা ওকে নিজেদের রাজা করল। চিল এই বিশেষ ক্ষমতার অধিকার লাভ করেই প্রতিদিন এক একটি পায়রাকে ধরে আর খায়। এ সব দেখে শুনে একদিন একটি পায়রা শুধু এই কথাই বলল—'উচিত শিক্ষাই পেয়েছি আমরা।'

[যখন কেউ স্বেচ্ছায় কোন অত্যাচারীর হাতে বা হাতে নিজের ক্ষমতা তুলে দেয়, তখন শত্রু যথাযথ নিজস্ব আচরণ করলে, অবাক হবার কি আছে]

ছাগল ও শেয়াল ॥ ৪ ॥

এক শেয়াল কুয়োর মধ্যে হঠাৎ পড়ে যায়। শত চেষ্টা করেও কিছুতেই আর উঠে আসতে পারে না—ভেবে কুলকিনারা পায় না, কি করে কুয়ো থেকে উঠে আসবে। সেই সময় এক তৃষ্ণার্ত ছাগল, জলের খোঁজে এসে কুয়োর মধ্যে শেয়ালকে দেখে বললো—বন্ধু, জলটা ভালো তো? কম

১। অভিজ্ঞতা থেকে শেখ—ওয়ারিংটন

জল না বেশী জল ? শেয়াল, আসল কথাটি গোপন করে বলল—'চলে এস ভায়া ; জল এত মিষ্টি যে, পেট ভরে খেলেও, মনে হচ্ছে আবার খাই। কিন্তু খেয়ে কি আর শেষ করা যায় !' শুধু এই কথা শুনেই ছাগল অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে কুয়োর মধ্যে লাফিয়ে পড়ল, আর শেয়াল সঙ্গে সঙ্গে ওর শিঙে পা দিয়ে এক লাফে উপরে উঠে এল। তারপর বিদ্রূপ করেই হতভম্ব ছাগলকে বলল,—'বন্ধু, তোমার যত দাড়ি আছে, তার অর্ধেক বুদ্ধিও যদি তোমার থাকত, তাহলে কুয়োতে লাফ দেবার আগে একবার অন্ততঃ ভেবে দেখতে।'[১]

[ঝাঁপ দেবার আগে তাকিয়ে দেখ। হিসেব করে কাজ কর]

নেকড়েবাঘ ও সারসপাখি ॥ ৫ ॥

একবার এক নেকড়েবাঘের গলায় একটা হাড় আটকে গিয়েছিল। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করতে করতে, সে যাকে সামনে দেখে, তাকেই অনুরোধ করে--'দাও না ভাই হাড়টা বার করে ; আমি প্রচুর পুরস্কার দেব ; যা চাইবে, তাই।' তার আকুলি বিকুলি দেখে এক সারসপাখির দয়া হল। সারসপাখি, বাঘের গলায় তার লম্বা ঠোঁটে ঢুকিয়ে, হাড়টাকে টেনে বার করে দিল। তারপর সারস বিনীতভাবে বাঘকে বলল,—এবারে আমার পুরস্কারটা তাহলে দিয়ে দাও।

বাঘ রেগে, দাঁত বার করে গর্জন করতে করতে বলল,—'তোর মত অকৃতজ্ঞ আমি আর দেখিনি। বাঘের মুখের মধ্যে গলা ঢুকিয়ে, নির্বিঘ্নে বার করে আনতে পেরেছিস ; এটা কি পুরস্কার হল না ? তুই এর উপরও আবার পুরস্কার চাস ?'[২]

১। ওয়ারিংটনের অনুবাদে শেয়ালের চাতুর্যের কথা বলা হয়নি। শেয়াল কুয়োর মধ্যেও পড়েনি। ছাগলকে কুয়োর মধ্যে অসহায় অবস্থায় সাহায্যের জন্য চীৎকার করতে শুনে, শেয়াল বললো—মূর্খ, তোমার দাড়িতে যতগুলো চুল আছে, তোমার মাথায় যদি ততগুলো চুল থাকতো, তা হলে কুয়োতে নামার আগে উঠে আসার পথটা ঠিক করে রাখতে।

২। তোমার ক্ষতি না করে, বদ্ লোকেরা ভাবতে পারে যে, সে তোমার যথেষ্ট উপকার করেছে।—ওয়ারিংটন।

দাম্ভিক দাঁড়কাক ॥ ৬ ॥

এক দাম্ভিক ও উন্নাসিক দাঁড়কাক একবার নিজের মাথার ও লেজে কিছু ময়ূরের পালক গুঁজে ভাবলে যে, সে ময়ূর হয়ে গেছে, ঐ সব বিশ্রী কাকদের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক নেই তার। শুধু কি তাই, শেষ পর্যন্ত বড় আশা নিয়ে দাঁড়কাক ময়ূরদের কাছে গেল। বললে, আমি তোমাদেরই লোক। ময়ূর তা মানবে কেন? ওরা তো দেখেই বুঝল,—ওটা একটা ভণ্ড কাক। বলল, দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি। বলেই সবাই মিলে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে ওর ময়ূরপুচ্ছ খুলে তো ফেললই, ওকে প্রায় আধমরা করে ছেড়ে দিলে।

মনের দুঃখে কাক আবার ফিরে গেল নিজের দলে—এমন ভাব দেখাল যেন কিছুই হয়নি। ওর দলের কাকগুলো ওকে দল থেকে তাড়িয়ে দিলে। আর, ওকে শুনিয়ে এক দাঁড়কাক বলল, তুমি যা, তাতেই যদি খুশী হতে, তাহলে তোমার চেয়ে যারা বড়, তারাও তোমাকে শাস্তি দিত না, আর তোমার সমান যারা, তারাও তোমাকে ঘৃণা করত না।

পিঁপড়ে আর ফড়িং ॥ ৭ ॥

দারুণ শীত তখন। এক পিঁপড়ে শস্যের দানা টেনে বার করছিল. গ্রীষ্মকালে সে-গুলোকে সে শুকোতে দিয়েছিল। সে সময়, অনাহারে প্রায় আধমরা একটা ফড়িং পিঁপড়েকে বলল,—দাও না ভাই একটি দানা, আমি না-খেয়ে মরে যাচ্ছি।

কেন, গ্রীষ্মকালে তুমি কি করছিলে?—পিঁপড়ে জানতে চাইল।

ফড়িং বললো,—ওঃ আমি? আমি কি আর চুপচাপ বসেছিলুম ভাই, সারা গ্রীষ্মকাল আমি গান গেয়েছি।

ফড়িং-এর কথা শুনে পিঁপড়ে হেসে উঠল। তারপর তার মরাই বন্ধ করতে বলল, তবে আর কি! গোটা গ্রীষ্মঋতু যখন গান গেয়ে কাটাতে পেরেছ, তখন শীতকালটা অনায়াসে নেচে কাটিয়ে দিতে পারবে।

[গ্রীষ্মের সঞ্চয় হয় শীতের সম্পদ]

বালক ও বৃশ্চিক ॥ ৮ ॥

একটি ছেলে ফড়িং ধরছিল। ধরতে ধরতে সে অনেক গুলোই ধরল। একটা কাঁকড়া-বিছেকে ফড়িং ভেবে ধরবার জন্যে হাত দুটো যেই আঁজলার মত করে কাছাকাছি এগিয়ে গেল, তখন বিছেটা তার হুল বার করে বলল —ধর একবার আমাকে, আর মজা দেখে নাও। লাভের মধ্যে এই হবে যে, আমাকে তো হাত থেকে ফেলবেই, ফড়িং-ও আর ধরতে পারবে না।

বিধবা ও তার মুরগী ॥ ৯ ॥

এক বিধবার এক মুরগী ছিল। প্রতিদিন সকালে সে একটি করে ডিম পাড়ত। সেই বিধবা একদিন ভাবল, মুরগীটাকে যদি বেশী করে যব খাওয়াই তাহলে একটার জায়গায় দুটো ডিম পেতে পারি। যেমনি ভাবা, আর তেমনি কাজ। বেশী খেতে পেয়ে কয়েকদিনের মধ্যে মুরগীটা এমন মোটা আর তেলতেলে হয়ে উঠল যে, সে ডিম পাড়াই বন্ধ করে দিল।

[হিসেবেও গরমিল হয়]

গর্ভিনী পর্বত ॥ ১০ ॥

অনেক কাল আগে, এক পর্বতের ভেতর থেকে একবার চাপা, গুমরানো এবং একটা গোঙানির মত আওয়াজ, থেকে থেকে শোনা যাচ্ছিল। লোকে বললে, নিশ্চয়ই পর্বতের গর্ভ-যন্ত্রণা। অমনি, এখান থেকে, ওখান থেকে, নিকট থেকে, দূরদূরান্ত থেকে দলে দলে লোক ছুটল, পর্বত কি প্রসব করে দেখবার জন্য। কিন্তু কিছুই আর হয় না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত কি জল্পনা-কল্পনা চলল। কিন্তু প্রসবের কোন চিহ্নই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। হঠাৎ দেখা গেল, পর্বতের একপাশ থেকে তুড়ুক করে একটা ইঁদুর লাফিয়ে উঠল।

[পর্বতের মূষিক প্রসব। বড় কথা, বড় সমারোহ, কাজে কিছু নয়।]

কুক্কুট ও রত্ন ॥ ১১ ॥

এক মোরগ, নখ দিয়ে আঁচড়ে, মুরগীর জন্য খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ, শক্ত চকচকে একটা জিনিস তার পায়ে ঠেকল। মোরগ বললে, বাঃ, বেশ চকচক করছ তো তুমি; লোকে তোমাকে তো লুফে নেবে। আমি কিন্তু, দুনিয়ার সব মুক্তোর আগে চাইব একদানা যব।[১]

নেকড়ে এবং ছাগলছানা ॥ ১২ ॥

এক উঁচু বাড়ীর ছাদে কি করে এক ছাগলছানা উঠে পড়েছিল। সেই সময়, সেই বাড়ীর পাশ দিয়ে এক নেকড়ে বাঘ যাচ্ছিল। নেক্‌ড়ে-কে দেখে ছাগল ছানাটি ঠাট্টা করে দু চার কথা শুনিয়ে দিলে। নেকড়ে শুধু উত্তর দেবার জন্যই একবার দাঁড়াল। সে বলল, ওরে ভীরু, আমি জানি, তুই আমাকে ব্যঙ্গ করছিস না, করছে ঐ উঁচু ছাদ—যেখানে তুই দাঁড়িয়ে আছিস্।

ঈগল এবং খেঁকশেয়াল ॥ ১৩ ॥

অনেক দিন ধরে, সৎ প্রতিবেশীর মত ঈগল এবং শেয়াল বসবাস করছিল। ঈগল থাকত এক বড় গাছের মগডালে আর শেয়াল থাকত সেই গাছের গোড়ায় –এক গর্তে।

১। ওয়ারিংটন্‌-এর মোরগ স্বাভাবিক ভাবে নিজের জন্যই খাবার খুঁজছিল—মুরগীর জন্য নয়। আর ওর বক্তব্যও অনেক স্বাভাবিক। মোরগ, এক মুক্তা পেয়ে বলেছিল—আশ্চর্য, তুমি গোবর-গাদায় পড়ে আছ? যে তোমার মূল্য জানে, সে যদি তোমাকে পেত, তাহলে সে তোমাকে তোমার পূর্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে পাবত। অথচ দেখ, যার কাছে খাদ্য-ই অনেক বেশী প্রয়োজন সে-ই তোমাকে আবিষ্কার করল। দুজনের কাছেই আমরা পরস্পর অপ্রয়োজনীয়।

মোরগটা যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিল বলতে হবে, কিন্তু পৃথিবীতে এমন উদ্ভট লোকও আছে, যারা অমূল্য জিনিষের মূল্য বোঝে না বলেই তাকে মূল্যহীন মনে করে।

একদিন শেয়াল যখন গর্ত ছেড়ে বাইরে গিয়েছিল, তখন ঈগল পাখি ছোঁ মেরে শেয়ালের বাচ্চাকে গর্ত থেকে তুলে নিজের বাসায় নিয়ে যায়। সে ভেবেছিল, এত উঁচু ডালে তো আর শেয়াল উঠতে পারবে না, অতএব্‌ শেয়াল ফিরে এল। শেয়াল যখন তার বাচ্চাকে গর্তে দেখতে পেল না, তখন আসল ব্যাপার বুঝতে পেরে, সে ঈগলের বাসার দিকে মুখ তুলে বললে, ভাই ঈগল, এই কি বন্ধুত্বের পরিণাম। এই কি বিশ্বাসের ফল? তারপর বিনীতভাবে বলল, আমার বাচ্চাটিকে ফিরিয়ে দাও বন্ধু!

ঈগল, শেয়ালের কথায় কোনও কানই দিল করলে না। শেয়াল তখন কাঠ নিয়ে এসে সেই গাছে আগুন ধরিয়ে দিলে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। ধোঁয়াতে ভরে গেল চারদিক। ঈগল শেয়ালের শত অনুরোধেও যা করেনি, এবার তা করল। সে তখন নিজের বাচ্চাদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য শেয়ালের বাচ্চাটিকে ফিরিয়ে দিল।[১]

[অত্যাচারী কারুর চোখের জলে ভেজে না কিন্তু প্রতিহিংসার হাত থেকে তার নিষ্কৃতি নেই]

হরিণশিশু ও তার মা ॥ ১৭ ॥

এক হরিণশিশু একবার তার মা-কে বললো -মাগো, তুমি তো কুকুরের চেয়ে অনেক বড়; কুকুরের চেয়ে অনেক বেশী দৌড়তেও পার; আর তোমার তো বেশ বড় বড় শিঙ—তবু তুমি কুকুরকে ভয় কর কেন মা?

শিশুর কথা শুনে মা একটু হাসল। বললে, বাছা, সবই আমি জানি। কিন্তু যেই-না কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক শুনতে পাই, তখন জানিনা, কেন, কিভাবে আমার পা-চারটেই আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে যায়।

[কাপুরুষের কাছে সাহসের গল্প করা বৃথা]

১। তুমি সব কিছুতে বড় হতে পার, তবু যারা তোমার চেয়ে ছোট, তাদেরও অসম্মান করো না, কারণ তাদের প্রতিহিংসা যে-কোন সময়ে তোমার বিপদ ঘটাতে পারে।—ওয়ারিংটন

সমানে সমানে বন্ধুত্ব না হলে, বিপদ আসতে কতক্ষণ। যে ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর বিপদ ঘটায়, নিজের বিপদও সে ডেকে আনে।

শেয়াল এবং সিংহ ॥ ১৫ ॥

এক শেয়াল আগে কোনদিন সিংহ দেখে নি, কিন্তু নাম শুনেছে। হঠাৎ একদিন এক সিংহকে দেখে, সে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে প্রায় আধমরা হয়ে গেল। দ্বিতীয়বার যখন সিংহ দেখল, তখনও তার ভয় ভাঙেনি, কিন্তু আগের মত ভয়ে আধমরা হয়ে যায়নি। তৃতীয়বার যখন দেখলো, তখন সে এম্‌নি সাহসী হয়ে উঠল যে, সিংহের কাছে গিয়ে বললে, কেমন আছেন মশায় ?

[ঘনিষ্ঠতা শ্রদ্ধা নাশ করে]

বৃদ্ধ কুকুর ॥ ১৬ ॥

এক কুকুর বয়সের ভারে শেষপর্যন্ত প্রায় অথর্ব হয়ে পড়ল। অথচ এক সময় সে খুবই চট্‌পটে আর তেজী ছিল। শিকারের সময় তাব মনিবকে যথেষ্ট সাহায্য করে মনিবকে খুশী করতেও পারত। একদিন বুনো শুয়োর শিকার করতে গিয়ে এক শুয়োরের কান ধরে টেনে আনবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু নড়বড়ে দাঁত দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখতে না পাবায় শুয়োরটা জোর করে নিজেকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে পালিয়ে গেল। তাই দেখে, সেই কুকুরের শিকারী মনিব কুকুরকে খুব একচোট গালাগালি করল। কুকুর জবাব দিল, প্রভু, আপনার এই পুরাতন ভৃত্যকে এবারে বিদায় দিন। শুয়োরটাকে ছেড়ে দেবার ইচ্ছে আমার ছিল না ; বয়স হয়ে গেছে, আর তেমন গায়ের জোর নেই আমার ; তাই চেষ্টা করেও পারি নি। এখন আমাকে অযথা তিরস্কার না করে, আমার আগের তেজ আর সাহসের কথা যদি মনে রাখেন, ভাল হয়।

ঘোড়া ও তার সহিস ॥ ১৭ ॥

এক সহিস তার ঘোড়ার জন্য বরাদ্দ দানা, চুরি করে বিক্রয় করত অথচ ঘোড়াটিকে অন্যভাবে সেবা-শুশ্রূষা, যত্ন-আত্তি করত। ঘোড়াটি একদিন বলল— তুমি যদি সত্যই আমাকে সবল আর সুস্থ দেখতে চাও, তা হলে আমাকে একটু কম করে দলাই-মালাই কর, তার বদলে বেশী করে দানা খেতে দিও।

মোরগ লড়াই ও ঈগল পাখি ॥ ১৮ ॥

এক সময় দুটো মোরগ একটা গোবরগাদা দখল করার জন্য মানুষের মতই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। শেষ পর্যন্ত লড়াইয়ে হেরে ক্ষতবিক্ষত একটি মোরগ কোনঠাসা হয়ে খোঁয়াড়ে ঢুকে পড়ল। বিজয়ী মোরগটি তখন সোজা ঘরের চালে উঠে ডানা ঝাড়তে লাগল আর কোঁকোর কোঁ-কোঁ করে গলা ফুলিয়ে ডেকে ডেকে তার বিজয়বার্তা ঘোষণা করতে লাগল। সেই সময় এক ঈগল আকাশে উড়ছিল। মোরগটাকে দেখে তীরের মত বেগে নেমে এল আকাশ থেকে, তারপর থাবায় ধরে, তুলে নিয়ে গেল মোরগটাকে। তখন আহত মোরগটা খোঁয়াড় থেকে এসে গোবরগাদায় উপর বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল—যেটার জন্য ওদের ভয়ঙ্কর লড়াই বেধেছিল কিছুক্ষণ আগে।

দুটি থলি ॥ ১৯ ॥

প্রত্যেক মানুষই দুটি থলে নিয়ে বেড়ায়। একটি তার সামনে থাকে আর একটি থাকে পেছনে। দুটি থলিই দোষে ভরা। সামনের থলিটি অবশ্য—তার প্রতিবেশীর দোষে ভরা, পেছনেরটি তার নিজের। এতে ব্যাপারটা এই দাঁড়ায় যে, সব মানুষই তার নিজের দোষের বেলায় অন্ধ, কিন্তু প্রতিবেশীর দোষের দিকে তার দৃষ্টি সজাগ।

গাঁয়ের লোক ও সাপ ॥ ২০ ॥

একটা সাপ, শীতে আধমরা হয়ে এক ঝোপের ধারে পড়েছিল। ওর সেই অবস্থা দেখে একজন গ্রামবাসীর মনে দয়া হল। সে সাপটিকে সযত্নে বাড়ীতে নিয়ে এসে উনুনের ধারে রেখে তার শরীরটাকে গরম করে ওকে বাঁচাতে চাইল। আগুনের আঁচে একটু তাজা হতে-না হতেই, সাপটা তার আশ্রয়দাতার ছেলেমেয়েদের কামড়াবার জন্য তাড়া করতে লাগল। লোকটা তখন রেগে, কুড়লের এক ঘায়ে সাপটাকে মেরে ফেললে।[১]

[উপকারের পরিবর্তে যারা অপকার করে, তারা একসময় প্রতিবেশীর সহানুভূতি হারিয়ে ফেলে]

১। ওয়ারিংটনের অনুবাদে গল্পটি অন্যভাবে বলা হয়েছে। সাপটি যেই মাত্র সুস্থ

ইঁদুর এবং ব্যাঙ ॥ ২১ ॥

কি কুক্ষণেই না এক ইঁদুর এক ব্যাঙের সঙ্গে মিতালি করে একসঙ্গে দেশভ্রমণে বেরিয়েছিল। বন্ধুর প্রতি গভীর ভালোবাসার জন্যই যাতে সে কোনরকমে বিপদে না পড়ে, তার জন্য ব্যাঙ তার নিজের পেছনের পায়ের সঙ্গে ইঁদুরের সামনের পা বেঁধে, স্থলপথে বেশ কিছুদূর গেল। তারপর রাস্তায় যখন নদী পড়ল তখন ব্যাঙ ইঁদুরকে বলল, কিছু ভয় করো না ভাই, সাঁতার কেটে ওপারে নিয়ে যাব তোমাকে। সাঁতার কেটে ব্যাঙ যখন নদীর প্রায় মাঝামাঝি পৌঁছুল, তখন হঠাৎ ব্যাঙ একডুবে জলের তলায় চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ে বাঁধা বেচারা ইঁদুরও তলিয়ে গিয়ে দম আটকে প্রায় মরতে বসল। বাঁধন খোলার জন্য প্রাণপণে লাফালাফি টানাটানি করে জল তোলপাড় করে সে ব্যাঙকে জলের উপরে টেনে তুলল। ঠিক সেই সময় একটা উড়ন্ত চিল ওদের ঐ অবস্থা দেখে, ছোঁ মেরে ইঁদুরকে তো ধরলই, সঙ্গে আবদ্ধ সেই ব্যাঙকেও তুলে নিল।[১]

[মরাও প্রতিশোধ নিতে পাবে, কারণ বিধাতার দৃষ্টি সর্বত্র। যার যেমন কাজ, তার তেমন ফল। এই ভাবেই প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়]

হল, তখনই লোকটি সাপটিকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হলে, সাপটি লোকটিকে দংশন করে এবং লোকটি মারা যায়। বদ লোকের প্রতি সদয় হওয়া উচিত নয়, তা সে তোমার ভালোই করুক আর মন্দই করুক। ভালো করলেও মন্দ লোক—তার পরিবর্তে মন্দই করে।

১। ওয়ারিংটনের অনুবাদ :—এক ইঁদুরের কপাল খারাপ, তাই সে ব্যাঙের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিল। ব্যাঙের মনের মধ্যে শয়তানী ছিল। ইঁদুরের সামনের পায়ের সঙ্গে নিজেব পেছনের পা বেঁধে খাবার খুঁজতে গেল দুজনেই। এক জলাশয়ের কাছে আসতেই ব্যাঙ—কোয়াক্ কোয়াক্—কর্র্র্—কোয়াক বলে ডেকে উঠল। আর ইঁদুরকে টেনে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলের মধ্যে। হতভাগ্য ইঁদুর জলে ডুবে মরল। তার মরা দেহটা যখন ভেসে উঠল, তখনও তার পা ব্যাঙের পায়ের সঙ্গে বাঁধা। এক চিল, দেখতে পেয়ে, ছোঁ মেরে ব্যাঙ আর ইঁদুরটাকে তুলে নিল খাবার জন্য।

বংশীবাদক জেলে ॥ ২২ ॥

একজন জেলে মাছধরার চেয়ে বাঁশী বাজাতে ভালোবাসত বেশী। সমুদ্রে এক ঝাঁক মাছ দেখেই সে একদিন বাঁশী বাজাতে বসে গেল—যেন বাঁশীর সুরে মুগ্ধ হয়েই নাচতে নাচতে মাছগুলো ডাঙায় উঠে আসবে। কিন্তু তেমন কিছু ঘটল না দেখে, শেষ পর্যন্ত জাল ফেলে এক ঝাঁক মাছকে ডাঙায় তুলে ফেলল। ডাঙায় এসে মাছগুলো লাফালাফি করতে লাগল। দেখে সেই বংশীবাদক জেলে একটু হাসল। হেসে বলল, - যখন বাঁশী বাজাচ্ছিলাম তখন নাচলেই পারতে বাছারা! এখন তোমাদের নাচ দেখার ইচ্ছে আর আমার নেই।

[যথাসময়ে যথাযোগ্য কাজ করাও একটি কলাবিদ্যা]

একজন লোক ও এক স্যাটির ॥ ২৩ ॥

হঠাৎ একবার এক ব্যক্তির সঙ্গে এক স্যাটিরের[১] আলাপ হয়ে গেল। স্যাটিরের আমন্ত্রণে দুজনে একত্রে ভোজনে বসল। শীতকাল—আর তখন কন্‌কনে ঠাণ্ডা; লোকটি তার আঙুল মুখের কাছে এনে ফুঁ দিতে লাগল। স্যাটির অবাক হয়ে বলল, ওকি করছ বন্ধু! লোকটি বলল, ওফ্‌—যা ঠাণ্ডা পড়েছে, ফুঁ দিয়ে আঙুলগুলোকে একটু গরম করে নিচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশ গরম গরম খাবার এল ওদের কাছে। লোকটি তখন খাবারের থালা দুহাতে ধরে, মুখের কাছে এনে আবার ফুঁ দিতে লাগল।

আরে, আরে, কি কচ্ছ আবার?—স্যাটির অবাক হয়ে জানতে চাইল।

লোকটি বলল,—খাবারটা খুব গরম কিনা, তাই ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা কচ্ছি।

স্যাটির গুম্‌ হয়ে ভাবল। তারপর বলল,—তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের এইখানেই শেষ। একই ফুঁয়ে যে ঠাণ্ডাকে গরম করে আর গরমকে ঠাণ্ডা করে, তার সঙ্গে আর কোন কথা নয়।

কুকুর ও প্রতিচ্ছায়া ॥ ২৪ ॥

এক কুকুর, এক কসাই-এর দোকান থেকে একটুকরো মাংস চুরি করে বাড়ী ফেরার পথে নীচু সাঁকো দিয়ে নদী পার হচ্ছিল। নদীর জলে সে

১। গ্রীকপুরাণোক্ত অর্ধঅশ্ব-অর্ধমানব উপদেবতা।

তার নিজের ছায়া দেখতে পেল। আর একটা কুকুর মাংসের টুকরো নিয়ে যাচ্ছে মনে করে তার টুক্‌রোটাও নেবার জন্য সে যেম্‌নি হাঁ করে কামড়াতে গেল, ওম্‌নি টুপ করে, তার নিজেরটাই তলিয়ে গেল।

[ছায়া ধরতে গেলেই আসলটি হারাতে হয়। এই হচ্ছে তাদের পরিণাম—যারা আসল ছেড়ে, নকলের রূপ দেখে ভোলে]

চাঁদ ও চাঁদের মা ॥ ২৫ ॥

চাঁদ একদিন তার মাকে বলল, মাগো, আমাকে একটা খুব মানানসই আর জমকালো পোষাক করে দাওনা, মা— !

মা বলল,—কি করে মানানসই জামা করি বাছা ; তুমি কখনও পূর্ণিমা আর কখনও অমাবস্যার আবার কখনও বা দুয়ের বাইরে।

নেকড়ে বাঘ ও মেষশাবক ॥ ২৬ ॥

এক ছোট্ট নদীতে নেমে এক নেকড়ে বাঘ চক্‌চক্‌ করে জল খাচ্ছিল। সেই সময় সে দেখতে পেল, একটা মেষশাবক একাই, নীচের দিকে কিছুদূরে, হেঁটে নদী পার হচ্ছে। ওকে ধরবার ইচ্ছা হল নেকড়ের। কিন্তু কিছু একটা অজুহাত না দেখিয়ে সরাসরি ধরলে তো আর ভালো দেখাবে না। তাই—ওর কাছে এক দৌড়ে ছুটে গিয়ে বললে,—পাজী কোথাকার, তোর সাহস তো কম নয়,—আমি জল খাচ্ছি দেখেও তুই জল ঘোলা করছিস !

মেশশাবক তো আবাক। বলল,—সে কি করে হয় : তুমি তো উপরে জল খাচ্ছিলে ; আমি আছি নাচের দিকে। উপরের জল তো নীচের দিকেই আসে ; নীচের দিক থেকে তো জল উপরে ওঠে না—তোমার জলই তো আমার দিকে আসছিল।

'তা হতে পারে',—নেকড়ে বেশ দম্ভের সঙ্গেই বলল। 'কিন্তু বছর খানেক আগে তুই তো আমাকে যা-তা করে গালাগালি দিয়েছিলি—দিস্‌নি ?'

নিরীহ মেষশাবক ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল,—কি বলছেন মশাই ; —আ-আ-আমার তো জন্মই হয় নি একবছর আগে। নেকড়ে বলল,

হতে পারে,—তুই না হলে তোর বাপ গালাগালি করেছিল, তর্ক তুলতে ভালোবাসি না আমি।

তারপর আর কোন কথা না বলেই নেকড়ে সেই মন্দভাগ্য নিরীহ দুর্বল মেষশাবকটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলল।[1]

[কোন অজুহাত না পেলেও দুর্জনের কিছু এসে যায় না। যার অস্ত্র যুক্তি ও সরলতা, আর যে দুর্বল, সে অত্যাচারীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না।]

মধুভাণ্ড ও মক্ষিকা ॥ ২৭ ॥

একবার এক মুদীর দোকানে, একটি মধুভাণ্ড উল্‌টে পড়েছিল। মধু খাবার লোভে অসংখ্য মাছি উড়ে এসে মধুর উপর বসে পড়েছিল। কিন্তু রসের আঠায় তাদের পা এমনভাবে আটকে গেল যে, ওরা আর উড়ে পালাতে পারল না। তখন ওরা বিলাপ করতে লাগল,—হায়রে, আমরা এম্‌নি মূর্খ যে, সামান্য একটু আনন্দলাভের জন্য, জীবন হারাতে বসেছি।

চাকার কান্না ॥ ২৮ ॥

এক বলদ, একটা মেঠো পথে একটা গাড়ী টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। ক্যাঁ-কোঁ করে চাকার শব্দ হচ্ছিল। শব্দ শুনে গাড়োয়ান বলল, গণ্ডমূর্খ চাকা, যারা গাড়ী টানছে তারা তো চুপচাপ আছে, তোরা কেন চেঁচিয়ে মরছিস্?

[যারা মার খায় কম, সাধারণতঃ তারাই কাঁদে বেশী।]

ভালুক এবং শেয়াল ॥ ২৯ ॥

এক ভালুক খুব দম্ভ করে বেড়াত এই বলে মানুষকে পর্যন্ত সে খায়ও না ছোঁয়ও না। সে কথা শুনে শেয়াল একটু হাসল। বলল, তুমি যদি জ্যান্ত মানুষের বেলাতেও এই ভালোবাসা দেখাতে, তা হলে বুঝতুম!

[মরা মানুষের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর চেয়ে জীবন্ত মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা করা অনেক ভাল]

১। জন ওয়ারিংটনের অনুবাদে, নেকড়ে একথা বলেনি যে, 'মেষশাবক গত বছর তাকে গালাগালি করেছিল।' পরিবর্তে, নেকড়ে বলেছিল,—'গত বছর, তুই অতি কর্কশ ভাষায় আমার বাবাকে গালাগালি করেছিলি।'

মেষশাবকের পিতা, নেকড়ে-কে গালাগালি করেছিল, এ কথাও বলা হয়নি।

গাঁয়ের ইঁদুর ও শহরের ইঁদুর ॥ ৩০ ॥

একবার এক গাঁয়ের ইঁদুর তার এক বন্ধুকে গ্রামের বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। বন্ধুটি ছিল পুরো শহুরে। গাঁয়ের ইঁদুরকে আমন্ত্রণ রক্ষা করার জন্য গ্রামে একদিন সে চলে এল। গাঁয়ের ইঁদুর এম্‌নিতে সাধাসিধে, গেঁয়ো আর কিছুটা কৃপণ হলেও শেষ পর্যন্ত বন্ধুকে আপ্যায়িত করবার তাকে ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য বেশ খুশী মনেই সে তার মরাই খুলে দিল। শহুরে বন্ধুর উপযুক্ত হবে কি না, সন্দেহ থাকলেও সে তার শস্যাগার থেকে বার করল যবের শিস্‌, বাদাম, ছোলা, মটর এবং আরো কত রকমের খাবার। শহরের ইঁদুর কখন এক টুক্‌রো বাদাম, কখনো একটা মটর দানা, কখন বা আর একটুক্‌রো আর কিছু, চেখে চেখে দেখছিল। গাঁয়ের ইঁদুর শুধু একটা যবের শিস্‌ চিবুচ্ছিল। চাখ্‌তে চাখ্‌তে শহুরে ইঁদুর বলল, এধরনের একঘেয়ে গ্রাম্যজীবন কাটিয়ে কি লাভ বল দেখি? কুনোব্যাঙের মত গর্তের মধ্যে ঢুকে চুপটি করে বসে থাকার কি কোন মানে হয়? শহরের রাস্তায় কত গাড়ী-ঘোড়া, কত লোকজন আর তোমার এখানে, বন, পাহাড় আর চারদিক ফাঁকা। মিছিমিছি তুমি তোমার জীবন নষ্ট করছ এখানে থেকে। জীবনটা ত ভোগের জন্যই বন্ধু! আর তা ছাড়া তুমি তো জানোই, ইঁদুর চিরকাল বেঁচে থাকে না! চল, আমার সঙ্গে শহরে। আমি তোমাকে শহর দেখাব, তখন বুঝবে, জীবন কাকে বলে!

বন্ধুর মিষ্টি কথা আর অমায়িক ও মার্জিত ব্যবহারে, প্রায় বিগলিত হয়ে, গাঁয়ের ইঁদুর শহরে যাবার জন্য রাজী হল। দুজনে যাত্রা করল শহরের দিকে।

সন্ধ্যে তখন অতিক্রান্ত। অতি সঙ্গোপনে দু বন্ধু শহরে ঢুকে পড়ল। রাত গভীর হওয়ার আগে ওরা এক বিরাট বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছাল। এই বড় বাড়ীতেই শহুরে ইঁদুরের আস্তানা।

ঘরের মধ্যে ছিল রঙীন গদিমোড়া আরাম-কেদারা। হাতীর দাঁতের কারুকার্য-খচিত জিনিষ! নানা সম্পদ আর বিলাসদ্রব্যের ছড়াছড়ি। টেবিলের উপর সাজানো নানা ফলমূল, মিষ্টান্ন এবং আরও অনেক কিছু

ভোজ্যদ্রব্য—যে সব জিনিষ কেনার জন্য আগের দিন সারা বাজার ঘুরতে হয়েছে। বিরাট ভোজের ব্যাপার ছিল নিশ্চয়ই!

এবার গ্রামের ইঁদুরকে অভ্যর্থনা করবার জন্য শহুরে ইঁদুর তৈরী। বন্ধুকে একেবারে রাজকীয় পোষাকের উপর বসিয়ে, সে ঘরময় ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল। বন্ধুকে খুশী করার জন্য থালা থালা সুখাদ্য নিয়ে আসতে লাগল। যেন কোন এক রাজাকেই সম্বর্ধনা জানান হচ্ছে।

খাবার পছন্দসই হবে কিনা ভেবে, আগে এক-আধটু চেখে, তবে সেই গেঁয়ো আত্মীয়ের কাছে তুলে দিতে লাগল।

গাঁয়ের ইঁদুর তো আনন্দে অস্থির। নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করতে লাগল সে। নিজের এই আকস্মিক পরিবর্তন, আনন্দলাভ করতে করতে, সে তাব দারিদ্র্যের কথা চিন্তা করতে লাগল। সেই সময় হঠাৎ একদল লোক বাইরের আনন্দ উৎসব শেষ করে, হৈ হৈ করতে কবতে ঘরের দরজা ঠেলে অত রাতে হুড়মুড় করে সেই ঘরে ঢুকে পড়ল।

ভয়ে, তড়াক করে টেবিল থেকে লাফ দিয়ে দু বন্ধু, যে যেখানে পারল নিশ্বাস বন্ধ করে আত্মগোপন করে থাকল। কিছুক্ষণ পরে, যখন দুজনেই উঁকি দিয়ে দেখছিল—তখন হঠাৎ বাইরে কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দ শুনে, ভয়ে প্রায় আধমরা হয়ে আবাব লুকিয়ে পড়ল ওরা।

অনেকক্ষণ পরে, যখন আর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না, তখন গাঁয়ের ইঁদুর বেরিয়ে এল আর তার বন্ধুর কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে বলল, বিদায় বন্ধু, এ ধরণেব সুখের জীবন যার ভাল লাগে, লাগুক; আমার যবের শিস্ নির্ভয়ে আর শান্তিতে বেঁচে থাকুক। ভয় আর অশান্তি-ঘেরা বিরাট ভোজের চেয়ে তা ঢের ভাল।

সিংহ এবং ইঁদুর ॥ ৩১ ॥

এক সিংহ তার গুহার মধ্যে ঘুমোচ্ছিল। সেই সময় এক ইঁদুর, আনমনে অন্যত্র যাবার সময় সিংহের উপর দিয়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সিংহের ঘুম ভেঙে গেল। সেই মুহূর্তে বেচারী ইঁদুরকে সিংহ তার বিরাট থাবার তলায় ফেলে মেরে ফেলে আর কি! ইঁদুরটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে

বলল, আমাকে মার্জনা করুন—আমি না জেনেশুনেই এই অপরাধ করে ফেলেছি। আপনার ঐ বিরাট আর মহান থাবার তলায় আমার মত তুচ্ছ ইঁদুরকে দয়া করে পিষ্ট করবেন না।

সিংহ তার এই ছোট্ট বন্দীটির ভয় দেখে একটু হেসে বললে, আচ্ছা তোমাকে ছেড়ে দিলাম।

কিছুদিন পরে শিকার করতে গিয়ে বনে ঘুরে বেড়াবার সময়, সিংহ শিকারীদের জালে আটকে গেল। অনেক টানাটানি করেও যখন সে বুঝতে পারল যে বাঁধন ছিঁড়ে ফেলার কোন উপায়ই নেই, তখন গর্জনে সারা বন প্রকম্পিত করে তুলল।

সিংহের গর্জন শুনে, সেই ইঁদুরটি বুঝতে পারল যে, তার জীবনদাতা সিংহের কোন বিপদ হয়েছে। যে দিক থেকে গর্জন শোনা যাচ্ছিল ইঁদুর ছুটল সেই দিকে, পৌঁছেই সিংহের অবস্থা দেখে, বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে, সে দাঁত দিয়ে কুট্‌কুট্‌ করে সিংহের বাঁধনদড়ি কাটতে লাগল—অল্পক্ষণের মধ্যেই পশুরাজ মুক্তিলাভ করল।

সিংহকে এভাবে সে বুঝিয়ে দিল যে, উপকার কখন বিফলে যায় না; একটি ক্ষুদ্র প্রাণীও কোন বৃহৎ প্রাণীর তুলনায় নগণ্য ক্ষুদ্র নয়, যথাযোগ্য কাজেই তার প্রমাণ।[১]

কুকুর, মোরগ ও শেয়াল ॥ ৩২ ॥

এক কুকুর আর মোরগে হঠাৎ বেশ ভাব হয়ে গেল। ওরা তখন বেরিয়ে পড়লো দেশভ্রমণে। যেতে যেতে যখন সন্ধ্যা হল, তখন ওরা এক বনে গিয়ে পৌঁছুল। আশ্রয় নেবার জন্য, মোরগটি উড়ে গিয়ে গাছের এত উঁচু ডালে বসল; কুকুর গাছের তলায় বসে ঝিমুতে লাগল।

ভোরবেলা সব মোরগই কোকোর কোঁ বলে গলা ফাটিয়ে ডাক ছাড়ে, এই মোরগটিও খুব জোরে ডাক ছাড়ল—কোকোর কোঁ—কোঁ। শব্দ

১। জন ওয়ারিংটনের অনুবাদে বলা হয়েছে: এই কাহিনী আমাদের এই কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যে, রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় সর্বশক্তিমান ব্যক্তিরও যে কোন দুর্বল মানুষের সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে।

শুনে এক শেয়াল মনে মনে ভাবল, চেষ্টা করলে আজ মোরগ-ভোজনে পরিতৃপ্ত হওয়া যেতে পারে। এই না ভেবে, সে সেই গাছের কাছে এসে, মোরগটিকে বলল, - আ', তুমি কি সুন্দর একটি ছোট্ট পাখি! তোমার সঙ্গে দেখছি সকলেরই বেশ হৃদ্যতা। নেমে এস ভাই, একসঙ্গে প্রাণখুলে প্রভাতী-সঙ্গীত গাই আর আনন্দ করি।

মোরগ বলল—বন্ধুবর, অতদূরে না থেকে, একেবারে গাছের গোড়ায় চলে এস আর ঘণ্টাবাদককে ঘণ্টা বাজাতে বল।

শেয়াল ত শুনে মহাখুশী। তারপর যেই না শেয়াল গাছের গোড়ায় এসেছে, অমনি কুকুর এক লাফে তার ঘাড়ে পড়ে তাকে শেষ করে দিলে।

[যে পরের জন্য ফাঁদ পাতে, সে নিজের ফাঁদেই নিজেই ধরা পড়ে]

গল পাখি ও চিল ॥ ৩৩ ॥

এক গল পাখি সমুদ্রে একটা মাছ ধরে মাছটাকে গিলতে গেল। কিন্তু মাছটা গেল গলায় আটকে; গল পাখির দম বন্ধ হবার উপক্রম। কোনরূপ নড়াচড়া করতে না পেরে, মরার মত সে পড়ে থাকল। তীরে এক চিল ওর অবস্থা দেখে বললো, তোমাকে আর সান্ত্বনা দিতে পারছি না; শুধু বলছি, "ঠিক হয়েছে, তোমার মত পাখির সামুদ্রিক মাছ ধরার সাধ হয় কেন?"

গৃহপালিত কুকুর এবং নেকড়ে বাঘ ॥ ৩৪ ॥

ফুটফুটে এক জ্যোৎস্না রাতে রোগা ও ক্ষুধার্ত এক নেকড়ে বাঘ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সেইসময় ওর সঙ্গে বেশ মোটা-সোটা এক কুকুরের দেখা হয়ে গেল। দুজনেই পরস্পরের কুশল-কামনা করল। নেকড়ে বলল, তুমি তো দিব্যি পুষ্ট হয়ে উঠেছ ভায়া; গা দিয়ে যেন তেল ঝরে পড়ছে; নিশ্চয়ই খাওয়া-দাওয়াটা ভালোই চলছে! আর আমার অবস্থা দেখ; দিনরাত ঘুরে ঘুরে খাবার খুঁজতে খুঁজতে হয়রাণ। তবু যদি কপালে আহার জুটতো!

কুকুর বললো, কেন জুটবে না? তোমারও জুটবে, তবে আমি যা করি তা যদি করতে পার, তাহলে তুমিও অভুক্ত থাকবে না।

তাই নাকি? কি করতে হবে আমাকে? নেকড়ে বেশ আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইল।

কুকুর বলল, কাজ কিছু কঠিন নয় ভায়া, শুধু আমার মনিবের বাড়ী পাহারা দেবে, চোর ঢুকতে দেবে না, এই কাজ আর কি! নেকড়ে বেশ উল্লসিত হয়ে বলল, এক্ষুণি রাজী। যা খারাপ সময় যাচ্ছে আমার! তার উপর বনেবাদাড়ে থাকা; ঝড় নেই—বৃষ্টি নেই—তুষারপাত নেই—ওঃ, কি ভাবে যে জীবন কাটছে আমার! আমি যদি একটু থাকবার জায়গা আর পেটভরা খাবার পাই, তাহলে এক্ষুণি বন ছাড়তে রাজী।

কুকুর বলল—বেশ, আর কথাটি নয়—এস আমার সঙ্গে। একসঙ্গে পাশাপাশি যেতে যেতে নেকড়ে দেখল, কুকুরের গলায় কিসের যেন একটা দাগ। সে বলল, তোমার গলায় ওটা কিসের দাগ, ভাই।

কুকুর বলল—না, ও কিচ্ছু না।

না-না—তোমাকে বলতেই হবে—নেকড়ে মিনতির সুরে বলল।

কুকুর বলল- বলেছি তো ওটা কিছু নয়; বোধহয় আমার গলার ফিতের দাগ—যাতে আমার গলার শেকলটা বাঁধা থাকে।

নেকড়ে তো অবাক হ'য়ে গেল। বলল, কি বললে? শেকল? মানে তুমি কি যখন যেখানে খুশী ঘুরে বেড়াতে পার না?

কুকুর বলল, কেন পারি না? তবে সব সময় কি আর পারি? আর তুমি দেখতে পাচ্ছো—কেমন চেহারা আমার! সবাই ভয় করে। তাই দিনের বেলায় আমি বাঁধা থাকি। কিন্তু রাতে একেবারে স্বাধীন—এ তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি। আর আমার মালিক তো নিজের থালা থেকে আমাকে খাবার খাওয়ান; চাকর-বাকররা এটা-ওটা তো প্রায়ই খেতে দেয়। সত্যি কি যে ভালোবাসে আমাকে! আর—আরে—আরে কি হল? তোমার যাওয়া হচ্ছে কোথায়—ওদিকে?

নেকড়ে বলল, বিদায় নিচ্ছি ভাই; তোমার সুখাস্থের কাছে তুমিই যাও। রাজকীয় ভোগবিলাসের সঙ্গে যদি শেকল থাকে, তাহলে তা আমি চাই না। শুক্‌নো খট্‌খটে চামড়া চিবিয়ে থাকবো, তবুও—তার সঙ্গে আমার স্বাধীনতা যেন থাকে।

বৃদ্ধা ও মদের ভাঁড় ॥ ৩৫ ॥

এক বৃদ্ধা দেখল একটা খালি মদের ভাঁড় মাটিতে পড়ে আছে। ভাঁড়ের মধ্যে অমৃতগন্ধী মদের একফোঁটাও অবশিষ্ট ছিল না। তবু, তার সুগন্ধে পথচারী সবাই আকৃষ্ট হচ্ছিল। বৃদ্ধা তার নাকের ডগাটিকে সরুমুখো ভাঁড়ের যতখানি ভেতরে নেওয়া যায়, ততখানি ভেতরে নিয়ে যত জোরে পারলে আঘ্রাণ নিল। পরে বললো—আঃ—কি মিষ্টি মদের ভাঁড়। তোমার গায়ের গন্ধই যখন এমন, তখন না জানি সেই পানীয় বস্তুটা কেমন ছিল।

ব্যাঙ এবং ষাঁড় ॥ ৩৬ ॥

এক ষাঁড় এক জলাভূমিতে ঘাস খেতে গিয়ে কতকগুলো বাচ্চা ব্যাঙকে মাড়িয়ে দিলে। অধিকাংশ বাচ্চা ব্যাঙই পায়ের চাপে মরে গেল। তার মধ্যে একটা বাচ্চা ব্যাঙ কোনরকমে বেঁচে গেল। সে ভয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ওর মায়ের কাছে ছুটে গিয়ে সেই ভয়ানক সংবাদটি দেয়। বলে, মাগো একটা মস্ত বড় জানোয়ার—চারটে পা তার—সবাইকে শেষ করে দিয়েছে।

মা-ব্যাঙ বললে, কত বড় জানোয়ার? বলেই নিজেকে কিছুটা ফুলিয়ে বললো, এত বড়?

বাচ্চা ব্যাঙটি বলল, না-না, অ-নে-ক ব-ড়।

মা-ব্যাঙ আবার নিজের শরীরটা আরও একটু ফুলিয়ে দিল। এত বড়?

বাচ্চা ব্যাঙ বলল, অনেক বড় মা। তুমি যদি ফুলতে ফুলতে ফেটেও যাও, তাহলে ওর অর্ধেকও হতে পারবে না।

তুলনা শুনে নিজেকে যখন খুব ছোট মনে হল, তখন বুড়ী ব্যাঙ মনে করল—এ তার বিরাট অপমান। সে উত্তেজিত হয়ে আর একবার শেষ চেষ্টা করল, আরও ফুলে আরও বড় হতে। আর সঙ্গে সঙ্গেই ফট্ করে একটা শব্দ আর বুড়ী ব্যাঙের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি।[১]

[নিজের ক্ষমতা আর অধিকার-বোধ সম্পর্কে সচেতন না হয়ে যে খুব বড় হতে চায়, তার এই দশাই ঘটে]

১। জন ওয়ারিংটনের অনুবাদঃ জলাভূমিতে এক ষাঁড়ের বিরাট দেহ দেখে

পীড়িত হরিণ ॥ ৩৭ ॥

এক হরিণ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল। সেই অবস্থায় সহজেই যাতে খাবার পেতে পারে, তাই সে এক বিরাট তৃণভূমির মধ্যে আশ্রয় নিল।

হরিণটির স্বভাব খুব ভালো ছিল। তাই ওর বন্ধু-বান্ধবরা সংখ্যায় কম ছিল না। হরিণের অসুখের সংবাদ শুনে দলে দলে তৃণভোজী পশুরা ওকে দেখতে এল। অফুরন্ত ঘাস দেখে ওরা সবাই একটু আধটু করে চেখে দেখার ফলে সেই বিরাট তৃণভূমির একটি ঘাসও আর অবশিষ্ট রইল না। ফলে শেষ পর্যন্ত হরিণের রোগমুক্তি ঘটলেও খাদ্যাভাবেই সে মারা গেল।

কচ্ছপ ও শশক ॥ ৩৮ ॥

এক শশক একবার এক কচ্ছপকে তার ধীরগতির জন্য ব্যঙ্গ করেছিল। শুনে কচ্ছপ বললো—বাজী রাখতে পার। তোমাকে যে-কোন দৌড়ে আমি হারিয়ে দিতে পারি।

শশক বিদ্রূপ করেই বললো--তাই নাকি ? তা হলে পরখ করে দেখ, আমার পা কি দিয়ে তৈরী।

ঠিক হল, ওরা বাজী রেখে দৌড় সুরু করবে।

কচ্ছপ যথারীতি থপ্ থপ্ করেই চলতে লাগল। কোথাও একটু থামল না। শশক ব্যাপারটাকে নেহাৎ ছেলেখেলা মনে করে ভাবলো—আগে একটু ঘুমিয়ে নিই ; তারপর কচ্ছপটাকে ধরে ফেলতে আর কতক্ষণ !

কচ্ছপ ওদিকে একেবারে না থেমেই চলছে তো চলছেই। শশক বোধহয় একটু বেশীই ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘুম ভাঙার পরে সে দৌড়তে সুরু করলো। কিন্তু নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছে দেখল কচ্ছপ সেখানে বহু আগেই পৌঁছে গেছে।

[ধীরে হোক্ ক্ষতি নেই যে নিয়মিত কাজ করে সে জেতে]

এক ব্যাঙের ঈর্ষা হল। সে নিজেকে ফুলিয়ে তার বাচ্চাদের বলল, দেখত, আমি ওর মত কি হয়েছি ? বাচ্চারা বলল, 'না।'

এবারে আরো একটু ফুলিয়ে বললো, দেখত আমাদের দুজনের মধ্যে কে বেশী বড়।

বাচ্ছারা বললো—ষাঁড়ই বড়।

বেগে শেষ চেষ্টা করতে গিয়ে, ব্যাঙটা ফেটে মরে গেল।

[নীতি : শক্তিশালীর অনুকরণ করতে গেলে, দুর্বলরা মরে]

ঈগল ও কচ্ছপ ॥ ৩৯ ॥

এক কচ্ছপের দারুণ ইচ্ছে হল, ঈগলের মত সেও আকাশে উড়বে। সে দেখত ঈগল ডানা মেলে উড়তে উড়তে আকাশের সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়—মেঘের মধ্যেও চলে যায়! সত্যি, কত উঁচুতে থাকে পাখির জাত। আর সে? দুর ছাই, তার কি একটা জীবন! তার এই তুচ্ছ জীবনের কি মানে হয় কিছু? হায়রে একবার যদি সে ঈগলের মত আকাশে উড়তে পারত!

এই সব কথা ভেবে, একদিন সে ঈগলকে ডেকে বলল! ভাই, তোমাকে আমি সাতসাগরের মণি-মানিক্য দেব, যদি তুমি একটিবার আমাকে শিখিয়ে দাও, কি করে আকাশে উড়তে হয়।

ঈগল ভেবেছিল কচ্ছপকে বুঝিয়ে বললেই হবে, কত উদ্ভট আর অসঙ্গত হচ্ছে ওটা। কিন্তু কচ্ছপ এমন কাতরভাবে অনুরোধ করলো এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ধনরত্নের লোভ দেখাতে লাগলো যে, শেষ পর্যন্ত ঈগল বলল—"বেশ বলছো যখন অত করে, তখন আমার সাধ্যমত আমি চেষ্টা করে দেখবো।"

এই বলে ঈগল তার দুপায়ের নখে কচ্ছপকে আঁকড়ে আকাশে উঠে গেল এবং খুব উঁচুতে উঠে বলল—"নাও, এখন উড়।" বলেই কচ্ছপকে ছেড়ে দিল।

কোন কথা বলবার আগেই কচ্ছপ এক পাহাড়ে আছাড় খেয়ে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

[অহঙ্কারেই পতন ঘটে]

অশ্বতর ॥ ৪০ ॥

বেশী খেতে পেয়ে এক অশ্বতর বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়ে খোশমেজাজে লেজ তুলে লম্ফ-ঝম্ফ করতে করতে ভাবল—"আমার মা ছিল দৌড়বাজ ঘোটকী। আমিও কি কম নাকি? লম্ফ-ঝম্ফ করতে করতে তাড়াতাড়ি যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ত তখন তার মনে পড়ত, যে তার বাবা কিন্তু ঘোড়া নয়—গাধা।

[যে কোন সত্যের দুটো দিক আছে। দুদিক ভালো করে দেখে যে কোন একটা গ্রহণ করা উচিত]

কাঁকড়া ও তার মা ॥ ৪১ ॥

এক বুড়ী-কাঁকড়া তার বাচ্চাকে বলল, বাছা, এমন কুঁজো হয়ে চলিস্ কেন? সোজা গট্‌গট্ করে হাঁটতে পারিস না?

বাচ্ছাটি বলল, কেমন করে হাঁটব দেখিয়ে দাও না, মা। দেখিয়ে দিলেই ঠিক সেই ভাবে হাঁটবো।

[আপনি আচরি ধর্ম অপরে শেখাও]

মেষশাবক ও নেকড়ে বাঘ ॥ ৪২ ॥

এক নেকড়ে বাঘ, একটি মেশষশাবককে ধরবার জন্য তাড়া করেছিল। মেষশাবকটি প্রাণ বাঁচাবার জন্য এক মন্দিরে ঢুকে পড়ে। নেকড়ে বাইরে দাঁড়িয়ে ওকে বলল, ঢুকলে বটে, কিন্তু পুরুত তোমাকে ছাড়বে কেন? সে দেবতার কাছে বলি দিয়ে দেবে যে! মেষশাবক বলল, তা দিক্। তোমার পেটে যাওয়ার চেয়ে, দেবতার কাছে বলি হওয়া অনেক ভালো।

নেকড়ে ও রাখাল বালক ॥ ৪৩ ॥

গ্রাম থেকে খুব দূর নয়—এক মাঠে এক রাখাল বালক ভেড়া চরাত। সে মজা দেখার জন্য মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠত—বাঘ-বাঘ—নেক্‌ড়ে বাঘ। কয়েকবার, ওর হাঁক-ডাক শুনে অনেকে দৌড়ে এসেছিল, ওকে বাঁচাবার জন্য। তখন রাখাল ওদের দেখে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল।

একদিন কিন্তু সত্যসত্যই ভেড়ার পালে নেকড়ে হানা দিল। রাখাল আকুল হয়ে চিৎকার করতে লাগল—বাঘ-বাঘ—নেকড়ে বাঘ। গাঁয়ের লোকেরা সে চিৎকার শুনতে পেল বটে, কিন্তু রাখালের পুরানো তামাসার কথা ভেবে কেউ এল না। ফলে, নেকড়ের পেটে গিয়ে ঢুকল ভেড়ার পাল।

[রাখাল তখন বুঝতে পারল, মিথ্যাবাদী সত্য কথা বললেও লোকে তা বিশ্বাস করে না]

মোরগ এবং বিড়াল ॥ ৪৪ ॥

এক বিড়াল শুনতে পেল, মোরগ অসুস্থ হয়ে তার বাসায় শুয়ে আছে। বিড়াল গেল ওকে সহানুভূতি জানাতে। গিয়ে বলল, কেমন আছ ভাই;

কি চাই তোমার? বল, আর আমি কি করতে পারি তোমার জন্য! শুধু একটিবার বল, পৃথিবীর যেখান থেকে যা আনতে বলবে, তাই এনে দেব। মনে সাহস রেখো ভাই; ভয় পাবাব কি আছে?

মোরগ বলল, ধন্যবাদ; তুমি যদি দয়া করে এখান থেকে চলে যাও, তা হলে, আমার আর কোন ভয় থাকবে না—আর আমিও তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠব।

[অবাঞ্ছিত অতিথিদেব তখনই স্বাগত জানান হয, যখন ত'বা চলে যায]

ডালিম, আপেল ও কালজাম ॥ ৪৫ ॥

ডালিম ও আপেলেব মধ্যে দারুন তর্ক; রূপে কে বড়, ডালিম না আপেল? শেষ পর্যন্ত দারুণ ঝগড়া—কথা বাড়াতে বাড়াতে, গলাব জোরও বাড়তে লাগলো ওদেব। শেষ পর্যন্ত ঝগড়া, মাবামারিব দিকে যায় আব কি? কাছের একটা ঝোপ থেকে কালোজাম উঁকি দিয়ে বলল—আব নয়, অনেক ঝগড়াঝাটি আমবা কবেছি। আব কোন বাদ-বিসম্বাদ নয় ভাই।[১]

[সামান্য লোকেও অনেক সময বড কথা বলে থাকে]

শেয়াল এবং কাঠুরিয়া ॥ ৪৬ ॥

এক শেয়ালকে তাড়া কবেছিল একদল শিকারী আর তাদের কুকুরের পাল। শেয়াল প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে এক জায়গায় এসে দেখল, একজন লোক কাঠ কাটছে। শেয়াল ওকে অনুনয় করে বলল—ভাই, আমাকে বাঁচাও; আমাকে একটু লুকিয়ে থাকতে দাও! লোকটা ইঙ্গিতে ওকে তার কুঁড়েঘর দেখিয়ে দিল। শেয়াল গুঁড়ি মেরে কুঁড়ের এক কোণে গিয়ে চুপটি করে বসে থাকল। দেখতে-না-দেখতেই শিকারীর দল এসে পড়ল।

১। কাহিনীটির ইংবাজী নাম—Pomgrante, Apple and Bramble.

Bramble- ব্ল্যাকবেরী জাতীয় ফল। বাঙলাতে 'কালোজামা' বললে ঠিক হবে না, অথচ ব্যমবল্ শব্দটি চল। তাই কালোজাম নামক শব্দকেই ব্যবহার করা হল।

ওরাও সেই কাঠুরিয়াকে জিজ্ঞাসা করল—ওহে, তুমি একটা শেয়ালকে পালাতে দেখেছ এদিক দিয়ে ?

লোকটি মুখে বলল, না, কিন্তু ইঙ্গিতে তার কুঁড়েঘরটি দেখিয়ে দিল। শিকারীর দল ওর ইঙ্গিতটা ঠিক বুঝতে না পেরে, ওখান থেকে চলে গেল। শেয়াল যখন দেখলো, ওরা অনেক দূরে চলে গেছে, তখন সে নিঃশব্দে কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল।

কাঠুরিয়া ওকে দেখে বিদ্রূপ করে বলল—বাঃ, তোমার আশ্রয়দাতা এবং প্রাণদাতাকে একটি কথা না বলেই যে চলে যাচ্ছ !

শেয়াল ঘুরে দাঁড়াল। তারপর ব্যঙ্গের সুরে সেও বলল, যথার্থ আশ্রয়দাতাই বটে ! তোমার মুখ যেমন সৎ, তোমার আঙুল কিন্তু তেমন সৎ নয় বলে মনে হচ্ছে। তুমি যদি তোমার মুখের মত সৎ হতে, তাহলে যাবার সময় নিশ্চয়ই তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে যেতাম।

[কথা এবং ইঙ্গিত—দুয়ের মধ্যেই সমান বিদ্বেষ প্রকাশ হতে পারে]

কাক ও জলের কলসী ॥ ৪৭ ॥

এক কাক পিপাসার্ত হয়ে প্রায় প্রাণ হারাতে বসেছিল। সেই সময় হঠাৎ কিছুদূরে একটা জলের কলসী দেখে আনন্দে অধীর হয়ে, কলসীর কাছে উড়ে গেল। কিন্তু দেখে হতাশ হল—কলসীর তলার দিকে মাত্র একটু জল আছে, ঘাড় লম্বা করে শত শত চেষ্টা করলেও, জলের কাছে ঠোঁট পৌছুবে না। তাই কলসীটাকে প্রথমে ভাঙবার, তারপর উল্‌টে ফেলার চেষ্টা করল। কিন্তু কাকের আর কত শক্তি ! না পারল ভাঙতে, আর না পারল উল্‌টে ফেলতে। হঠাৎ দেখল, কাছেই ছোট ছোট অনেক পাথরের নুড়ি পড়ে আছে। কাক তখন একটি একটি নুড়ি ঠোঁটে তুলে কলসীর মধ্যে ফেলতে লাগল। ফেলতে ফেলতে যখন অনেক ফেলা হয়ে গেল, তখন তলার জল উপরের দিকে উঠে এল। আর, কাকও মনের আনন্দে তৃষ্ণা মিটিয়ে নিল।

[শক্তি যেখানে অচল, বুদ্ধি আর ধৈর্য-ই সেখানে জয়লাভ করতে পারে]

একচক্ষু হরিণ ॥ ৪৮ ॥

এক হরিণের একটি চোখ ছিল কানা। সমুদ্রের ধারেই সর্বদা সে চরে বেড়াত। ডাঙার দিক থেকে ভয়ের সম্ভাবনা আছে ভেবে, কানা চোখটা রাখতো সমুদ্রের দিকে আর ভালো চোখটা রাখতো ডাঙার দিকে, যাতে শিকারীদের দিকে দৃষ্টি রাখতে পারে। একদিন কয়েকজন নাবিক নৌকো করে যাবার সময় দেখতে পেল, চরে একটা হরিণ চরছে। সঙ্গে সঙ্গে ওরা তীর নিক্ষেপ করে হরিণটাকে মেরে ফেলল। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় হরিণ বলল, আমার মত নির্বোধ প্রাণী কি আর আছে? আমি ডাঙার দিকে চোখ রেখেছিলাম শত্রুকে দেখতে পাব বলে, কিন্তু শত্রু এল জলের দিক থেকে; অথচ আমি কোনদিনই ভাবিনি যে ওদিক থেকেও শত্রু আসতে পারে।

[অভাবিত জায়গা থেকেই আমাদের বিপদ আসে বেশী]

উদর ও অন্যান্য অঙ্গ ॥ ৪৯ ॥

অনেকদিন আগের কথা। হাত পা নাক কান প্রভৃতি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ, এখন যেমন একযোগে কোন কাজ করে, তখন ছিল সকলের আলাদা আলাদা ইচ্ছা; যে-যার খুশীমত কাজ করত, কিন্তু এক বিষয়ে একমত ছিল সবাই। পেটকে দেখতে পারতো না কেউ; পেটের নামে সবাই কুৎসা রটনা করে বেড়াত। বলত, 'আমরা সবাই ওর প্রয়োজন মেটানোর জন্য আর ওর আনন্দ বিধানের জন্য খেটে খেটে মরছি, আর উনি দিব্যি, কিছু কাজ না করে, বিলাসের মধ্যে জীবন-যাপন করে চলেছেন। শেষ পর্যন্ত, সবাই একজোট হয়ে কাজ করা বন্ধ করে দিল।

হাত আর মুখের কাছে খাবার পৌঁছে দেয় না। মুখও আর খাবার খেতে চায় না। পেটকে অনাহারে রাখার এই পদ্ধতির ফলে, ক্রমে ক্রমে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই দুর্বল হতে হতে প্রায় মুমূর্ষ হয়ে পড়ল আর সারা দেহও অবসন্ন হয়ে পড়ল।

তখন ওরা বুঝতে পারল যে, পেটকে অকর্মণ্য আর অপ্রয়োজনীয়

ভাবা ভুল। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অঙ্গ হচ্ছে পেট। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ ওকেই করতে হয়। সবাই বুঝতে পারলো যে, ওদের সাহায্য না পেলেও পেটের চলে যাবে, কিন্তু পেটের সাহায্য না পেলে, ওরা সবাই অচল। আরো বুঝতে পারল, যদি শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখতে হয়, তাহলে একযোগে সবাই-কে, যার যা কাজ, তাই করতে হবে আর তাতেই হবে সকলের মঙ্গল।

ভ্রমণকারী ও ভালুক ॥ ৫০ ॥

একবার দু বন্ধুতে বেড়াতে বেরিয়েছিল। হঠাৎ তারা এক ভালুক দেখতে পেল। তখন এক বন্ধু, আর এক বন্ধুর কথা চিন্তা না-করে প্রাণ বাঁচা-বার জন্য তাড়াতাড়ি একটা গাছে উঠে পাতার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। আর এক বন্ধু যখন দেখল, একা একা ভালুকের সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব নয়, তখন সে অন্য কোন উপায় না পেয়ে, মড়ার ভাণ করে মাটিতে পড়ে থাকল। সে শুনেছিল, ভালুক কোন দিন মরা মানুষ ছোঁয় না। ভালুকটা কাছে এসে লোকটার মাথা, কান, নাক, মুখ, বুক—সব কিছুই শুঁকে দেখল। লোকটি দম বন্ধ করে অনড় হয়ে পড়ে থাকল।

শেষ পর্যন্ত মরা ভেবেই, ভালুক ওকে ছেড়ে চলে গেল। ভালুক যখন বেশ দূরে চলে গেছে—তখন সেই বন্ধু গাছ থেকে নেমে এসে অন্য বন্ধুটিকে বলল, ভালুকটা তোমার কানে কানে কি বলছিল ভাই! গাছের উপর থেকে দেখলুম, সে তোমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসেছিল।

অন্য বন্ধুটি বলল,—গোপনীয় তেমন কিছু নয়। তবে বলল যে, বন্ধুকে বিপদের মুখে ফেলে যে বন্ধু পালিয়ে যায়, সেসব বন্ধুর সম্পর্কে সাবধান!

সিংহ, শেয়াল ও গাধার শিকারযাত্রা ॥ ৫১ ॥

এক সিংহ, এক শেয়াল ও এক গাধা এই তিনে মিলে শিকারে গেল। অনেক জীব-জন্তু শিকার করার পর সবাই ভাবল, আজ মনের সুখে ভোজ হবে। সিংহ গাধাকে বলল, তুমিই ভাগ করে দাও।

গাধা তিনটি সমান ভাগ করে দিলে। বললো, যার যেটা খুশী নাও।

সিংহ কিন্তু তাতে মোটেই খুশী হল না। সে প্রচণ্ড ক্রোধে, গাধার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলল। তারপর শেয়ালকে বলল, তুমিই ঠিক মত ভাগ করে দাও।

শেয়াল প্রায় সবটাই সিংহের ভাগে তুলে দিয়ে, নিজের জন্য অল্প একটু রাখল।

সিংহ খুব খুশী হয়ে বলল, বাঃ, এত সুন্দরভাবে ভাগ করতে তোমাকে শেখালে কে?

শেয়াল বললে, কে আর শেখাবে? গাধাব কপাল দেখে আমি নিজে নিজেই শিখেছি।

[পরের দুর্দশা দেখে অনেক সময় অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়]

গোয়ালে হরিণ ॥ ৫২ ॥

শিকারীদের তাড়া খেয়ে, প্রাণভয়ে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে এক হরিণ, সামনে এক খামারবাড়ি দেখে তাতেই ঢুকে পড়ল। তারপর গোয়ালে, যে জায়গায় গরুকে খড়-কুড়ো খেতে দেওয়া হয়, সেখানে লুকিয়ে রইল। খড়ের মধ্যে নিজেকে ঢেকে রাখবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করতে দেখে এক বলদ হরিণকে বলল, ব্যাপার কি হে, শেষ পর্যন্ত মানুষের আবাসকে বিশ্বাস করে একেবারে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে এসে পড়লে কেন?

হরিণ অনুনয় করে বলল, শুধু তোমরা আমাকে ধরিয়ে দিও না ভাই, প্রথম সুযোগেই আবার আমি পালিয়ে যাব।

সন্ধ্যের সময়, রাখাল এসে জাবনা দিয়ে গেল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। পরে অন্য একদল রাখালও এল; কিন্তু ওরাও হরিণকে দেখতে পেল না। হরিণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

কিছুক্ষণ পরে আর একজন তদারকী করতে এসে গোয়াল ঘুরে গেল, সব ঠিক আছে। হরিণ তখন নিজেকে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত মনে করে বলদ-গুলোকে তাদের বন্ধুসুলভ আচরণের জন্য ধন্যবাদ দিতে গেল। ওরা বলল, আরও একটু থাক। তোমার মন্দ কিছু হোক্, সত্যিই আমরা চাই না, কিন্তু এখনও আর একজনের আসবার বাকী আছে। তার একশ

চোখ। সে যদি এই দিকে এসে পড়ে, তা হলে তোমার প্রাণ-বাঁচান কঠিন হয়ে উঠবে।

এই সময়, রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে, খামারের কর্তা, শেষবারের মত—সব ঠিক আছে কি না—দেখতে এল। কেন না, কর্তার ধারণা. গরু-বাছুর যেন আগের মত আর সুস্থ ও সবল নেই।

তাদের কাছে এসেই গজ্‌গজ্‌ করতে লাগল কর্তা। ইস্‌, এত কম খাবার কেন এখানে? ইস্‌—ওখানে যে একেবারেই খড় দেওয়া হয়নি, দেখছি! কি আশ্চর্য, এ সব মাকড়শার জাল ঝেঁটিয়ে ফেলে দিতে কতক্ষণ সময় লাগে?

এ ভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এদিক ওদিক ভালো করে দেখে, হঠাৎ দেখতে পেল, খড়ের মধ্যে হরিণের শিঙ।

সেই মুহূর্তেই চাকর-বাকরদের হাঁক দিয়ে ডেকে, হরিণটাকে ভোজের জন্য ধরে ফেলল।

[কর্তার চোখ বড় চোখ]

খরগোশ ও শিকারী কুকুর ॥ ৫৩ ॥

এক শিকারী কুকুর, ঝোপের ভেতর থেকে এক খরগোশকে বেশ কিছু-দূর পর্যন্ত তাড়া করেছিল। খরগোশটা কিন্তু প্রাণপণে দৌড়ে, সেই কুকুরের নাগালের বাইরে চলে যায়। একজন লোক সেখানে ছাগল চরাচ্ছিল। কুকুরের এই অবস্থা দেখে ব্যঙ্গ করে বলল, তোমার চেয়ে খরগোশই ভাল দৌড়াতে পারে দেখছি।

শিকারী কুকুরটি বলল, তুমি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছ, খাবার জন্য ছোটা আর প্রাণভয়ে ছোটা—দুটোর মধ্যে অনেক তফাৎ।

শুশুক ও স্প্র্যাট মাছ ॥ ৫৪ ॥

একবার তিমি ও শুশুকদের মধ্যে দারুণ লড়াই বেধেছিল। লড়াই যখন ভয়ঙ্কর জমে উঠেছে, সেই সময় এক স্প্র্যাট[১] মাছ ওদের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

১। স্প্র্যাট—হেরিং বংশীয় মাছ।

তারপর লড়াই থামিয়ে দেবার জন্য ওদের দু দলকে দু দিকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল।

একটা শুশুক কিন্তু বেশ জোর গলায় বলল, আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা কর না তুমি। বরং আমরা লড়াই করে মরব, তবু তোমার মধ্যস্থতা আমরা চাই না।

কয়লা-বিক্রেতা ও ধোপা ॥ ৫৫ ॥

এক কয়লা-বিক্রেতার ঘরে, বেশ অনেকটা বাড়তি জায়গা ছিল। তাই সে এক ধোপাকে বলল, ওহে, তুমি আমার বাড়ীতে এসে থাকতে পার— আমার বাড়িতে অনেক বাড়তি জায়গা আছে।

ধোপা বললো, ধন্যবাদ, কিন্তু তোমার সঙ্গে তো আমার থাকা হবে না ভাই ; কারণ যত তাড়াতাড়ি আমি আমার জিনিস ধপধপে করবো, তত তাড়াতাড়ি তুমি আবার সেগুলোকে ময়লা করে দেবে।

[সমানে সমানে মিল ঘটে]

প্রেমিক সিংহ ॥ ৫৬ ॥

অনেক আগের কথা। এক সিংহ এক কাঠুরিয়া-কন্যার প্রেমে পড়েছিল। তাই সে কাঠুরিয়ার কাছে গিয়ে তার কন্যাকে বিয়ে করার অনুমতি প্রার্থনা করল। সিংহের কথা শুনে, কাঠুরিয়া খুশী তো হলই না, এরূপ বিপজ্জনক মিলন ঘটান যে চলে না, তা—জানিয়ে দিল।

সিংহ তখন রেগে গর্জন করে উঠল। বেচারা কাঠুরিয়া ত ভয়ে অস্থির। পশুরাজকে অবহেলা করার মত সাহস রইল না তার। শেষ পর্যন্ত খুব তাড়াতাড়ি তার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেল। কাঠুরিয়া বলল, সত্যি বলতে কি, তোমার প্রস্তাব শুনে আমি খুবই কৃতার্থ হয়েছি; কিন্তু ব্যাপারটা কি জান পশুরাজ ? তোমার ঐ বড় বড় ধারাল দাঁত আর নখ দেখে আমার মেয়ে ভয় পেয়ে যাবে। যাই হোক, তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে আমি দেবই ; তবে তার আগে কিন্তু দাঁত তুলিয়ে আর নখ কেটে এলে ভাল হয়। তখন দেখবে, তোমার মত বর আর হয় না।

সিংহ বলল, এই কথা—এক্ষুণি যাচ্ছি। প্রেমে অন্ধ হলে মানুষ কিনা করে। কিছুক্ষণ পরে সিংহ, দাঁত-নখ কেটে ফিরে এল। এসে বলল, এই দেখ, আমার নখ-দাঁত কিছুই আর নেই। এবার আমাকে, কন্যাদান কর। নখদন্তহীন এই শয়তানকে কঠুরিয়ার আর ভয় ছিল না। সে বেশ মোটাসোটা একটা লাঠি নিয়ে দমাদ্দম পিটিয়ে তার হবু জামাইকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল।

পবনদেব ও সূর্যদেব ॥ ৫৭ ॥

সূর্য এবং পবন—দুজনের মধ্যে তর্ক বেধে গেল --কার শক্তি বেশী। শেষ পর্যন্ত এক পথচারীকে দেখে, দুজনেই এই সর্তে রাজী হল—যে আগে ওর গায়ের পোষাক খোলাতে পারবে, সেই-ই বিজয়ী প্রতিপন্ন হবে।

সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড এক ঝড় বইলো। কিন্তু ঝড়ের বেগ যত বাড়ে, লোকটা তত তার কাপড়-চোপড় ভালো করে জড়িয়ে নেয় এবং দুহাতে শক্ত করে ধরে রাখে।

এর পর এল সূর্যের পালা। সূর্যের কিরণে, মেঘ উড়ে পালাল—শীতও গেল পালিয়ে। লোকটা ক্রমশঃ বেশ গরম অনুভব করতে লাগল। সূর্যের তাপ যত বাড়ে, সে তত বেশী গরম অনুভব করে। শেষ পর্যন্ত সূর্যের প্রখর তেজ সহ্য করতে না পেরে, এক গাছের তলায় বসে গায়ের পোষাক খুলে মাটিতে রাখল।

এই ভাবে সূর্যেরই জয় হল। দেখা গেল, শক্তির দাপট না দেখিয়ে অনুরোধের পর অনুরোধেই কাজ হয় বেশী। স্নিগ্ধ সূর্য-কিরণ যে ভাবে কারুর হৃদয় জয় করতে পারে, ঝড়ের ভয়ঙ্কর শক্তি তা পারে না।

কৃষক ও তার পুত্রগণ ॥ ৫৮ ॥

মৃত্যুশয্যায় শুয়ে এক কৃষক কৃষিকার্যে সাফল্যলাভের উপায় সম্বন্ধে তার শেষ উপদেশ দেবার জন্য তার ছেলেদের ডাকল। সে বলল, আমার জীবন শেষ হতে চলল, কিন্তু আমার যা-কিছু সম্পদ, সবই ঐ আঙুর ক্ষেতের মধ্যে রেখে যাচ্ছি। ছেলেরা ভাবল, তাদের বাবা নিশ্চয়ই ক্ষেতের মধ্যে

পোতা আছে এমন সব কিছু গুপ্তধনের কথা বললেন। ফলে, পিতার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই শাবল-গাঁইতি, কোদাল-লাঙল প্রভৃতি হাতের কাছে যে যা পেল, তাই নিয়ে ছুটল। তারপর ক্ষেতের মাটি ওলোট্-পালট করে দিল সবাই মিলে। কিন্তু না, কোন গুপ্তধনত পাওয়া গেল না। কিন্তু যথেষ্ট কর্ষনের ফলে আঙুর গাছগুলো বেশ তাজা হয়ে উঠলো। আর সে বছর খুব তাড়াতাড়ি প্রচুর পরিমানে আঙুর হল—যা কোনও দিন এর আগে হয় নি।

[শ্রমই সম্পদ]

গাছ এবং কুঠার ॥ ৫৯ ॥

এক কুঠারিয়া বনের সব গাছকে বলল, দাও না ভাই, একটা বাঁট—আমার কুঠারের জন্য। ওর কাতর আবেদন ও সুন্দর ব্যবহারে বড় বড় গাছগুলো তখুনি রাজী হয়ে গেল। ঠিক হল, সরল সাধাসিধে অ্যাশ গাছ কাঠুরিয়াকে বাঁট যোগাবে। কাঠুরিয়া বাঁট পেয়ে, কুড়লে লাগিয়ে নিল আর সেই কুড়ল দিয়ে বড় বড় গাছ কেটে ফেলে দিতে লাগল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ওক্ গাছ, সেডার গাছকে ফিস্‌ফিস করে বলল, লোকট্যকে করুণা করতে গিয়ে আমরা সব হারাচ্ছি। আমরা যদি প্রতিবেশী অ্যাশ গাছকে এভাবে আত্মদান করতে না দিতাম, তাহলে আমরা যুগের পর যুগ ধরে বেঁচে থাকতে পারতাম।

[ধনীরা যখন অধিকার কেড়ে নেয়, তখন গরীবদের নিজেদের মৃত্যুর হাতিয়ার তুলে দেয় ধনীদের হাতে]

গর্দভ ও কুকুর ॥ ৬০ ॥

এক ব্যক্তির একটি ছোট্ট কুকুর আর একটি গাধা ছিল। গাধা, থাকতো আস্তাবলে বাঁধা আর যথেষ্ট পরিমাণে ঘাস, খড় ইত্যাদি খেতে পেত। কোন গাধার পক্ষেই তার চেয়ে ভালোভাবে থাকবার কথা নয়। আর সেই ছোট্ট কুকুরটি লাফ-ঝাঁপ করে, পা শুঁকে, কাপড় ধরে টানটানি করে আর হাজার রকমের মজার কাণ্ড করে মনিবকে এমন মুগ্ধ করে ফেলল যে, সে শেষ পর্যন্ত মনিবের কোলে চড়ার অনুমতি পেয়ে গেল।

ওদিকে গাধাকে অবশ্য খাটতেও হত অনেক। সারাদিন ধরে কাঠের বোঝা টেনে রাতে গিয়ে বিশ্রাম করতে পেত। নিজের এই দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে কষ্ট হত তার। দেখত, ওর চোখের সামনেই আরামে আর বিলাসে কুকুরটার দিন কাটছে। কুকুরের সৌভাগ্য দেখে ওর মনোকষ্ট আরও বেড়ে গেল। তাই মনে মনে চিন্তা করে দেখল, কুকুরটা মনিবকে যে-ভাবে খুশি করতে পেরেছে, সেই ভাবে সে-ও যদি মনিবকে খুশি করতে পারে, তা হলে সেও নিশ্চয়ই ওরই মত আদর-যত্ন পাবে।

একদিন হঠাৎ আস্তাবল থেকে, দড়ি ছিড়ে, গাধা মালিকের ঘরে ঢুকে পড়ল। তারপর লাথি ছুঁড়ে, লাফিয়ে, ঝাঁপিয়ে, চীৎকার করে, লেজ নেড়ে উদ্ভট সব কাণ্ড করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ওর মনিব যে টেবিলে বসে খাচ্ছিল, সেই টেবিলটা দিল উল্টে। সঙ্গে সঙ্গে টেবিল ভেঙে চৌচির। ঘরময় খাবারের ছড়াছড়ি। শুধু কি তাই! শেষ পর্যন্ত তার মনিবের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার শক্ত আর কর্কশ খুর বুলিয়ে আদর করতে গেল মনিবকে।

চাকর-বাকররা তাদের মালিকের বিপদ দেখে, ছুটে এল সবাই। ছুটে এসে গাধার কবল থেকে তাঁকে বাঁচাল আর লাঠিপেটা করে মূর্খ গাধার পিঠ ভেঙে দিল। গাধাটা মরবার সময় বলল, হায় রে, যদি ঐ ছোট্ট কুকুরটাকে ঈর্ষা না করে, আমি আমার নিজের কাজ করে যেতুম, তাহলে কি আমার এই দশা হয়?

অন্ধ ও নেকড়ে-শিশু ॥ ৬১ ॥

এক অন্ধ কোন জন্তুকে হাত দিয়ে স্পর্শ করে বলে দিতে পারত, ওটা কোন জন্তু। একদিন অন্ধের কাছে নেকড়ের বাচ্চাকে নিয়ে আসা হল। অন্ধ বাচ্চাটার সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে, বুঝে উঠতে না পেরে সন্দেহ করেই বলল, বুঝতে পারছি না, তোমার বাবা কুকুর না নেকড়ে। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারছি যে, ভেড়ার পালে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে বিশ্বাস করা চলবে না।

[যার চরিত্র মন্দ হবে, ছোটবেলাতেই তা ধরা পড়বে]

ঘুঘু এবং কাক ॥ ৬২ ॥

এক খাঁচার মধ্যে একটা ঘুঘু, নিজেকে ধন্য ধন্য করছিল, কেন না তার পরিবারে, অনেক অনেক ঘুঘু। এক কাক, ঘুঘুর সেই আত্ম-প্রশংসা শুনে বললে, ওহে সহৃদয় ঘুঘু, অহঙ্কার কর না। তোমার বয়স যত বাড়বে, তত বেশী খাঁচায় ঢুকবে ওরা ; তখন কাঁদতে হবে তোমাকে।

[স্বাধীনতার মধ্যে যা আশীর্বাদ, দাসত্বের মধ্যে তা অভিশাপ]

নেকড়ের পাল ও ভেড়ার পাল ॥ ৬৩ ॥

একবার এক নেকড়ের পাল, তাদের দূত পাঠিয়ে এক ভেড়ার পালকে বললে,—"এর পর থেকে আর যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই ; হিংসা নয়, ভালোবাসা চাই ; চিরকাল ধরে এমন মারাত্মক লড়াই চালিয়ে কি লাভ আমাদের ? ওই শয়তান কুকুরগুলোই তো এর জন্য দায়ী। আমাদের দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে ওঠে ; তাতেই তো আমরা রেগে যাই এবং উত্তেজিত হয়ে উঠি। ওদের তাড়িয়ে দাও তোমরা। দেখবে, চিরকালের মত আমরা তোমাদের বন্ধু হয়ে যাব। আমাদের মধ্যে আর কোন দিন কোন অশান্তি থাকবে না।

বোকা ভেড়ার দল, ওদের কথায় বিশ্বাস করে, কুকুরগুলোকে দিল তাড়িয়ে। রক্ষকদের তাড়ানোর ফল হল এই যে, ওরা সহজেই ভক্ষকদের হাতে মারা পড়তে লাগলো।

সিংহ এবং শেয়াল ॥ ৬৪ ॥

এক শেয়াল, সিংহের ভৃত্য হিসাবে, তার সঙ্গে শিকারে উপস্থিত থাকবে বলে সম্মত হল। শেয়ালের কাজ হল, শিকার খুঁজে বার করা আর সিংহকে ইঙ্গিত করা। সিংহের কাজ হল, সেই শিকারকে বধ করা। হঠাৎ শেয়ালের একবার মনে হল সে-ই বা কম কিসে! তাই সিংহকে বললো,—আমি এবারে থেকে নিজেই শিকার করতে চাই। সিংহ বললো, তথাস্তু—তাই হোক্।

শেয়াল একদিন এক ভেড়ার পালে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তখন রাখালরা এসে, লাঠির ঘায়ে ওকে যমালয়ে পাঠিয়ে দিলে।

[নিজের জায়গায় থাক, তাহলে জায়গাই তোমাকে রক্ষা করবে। যার কাজ তারে সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে]

জুপিটার[১] ও উষ্ট্র ॥ ৬৫ ॥

অনেককাল আগের কথা। অন্যান্য প্রাণীর শিঙ্ দেখে উটের মনে ঈর্ষা হল। তাই সে জুপিটারের কাছে আবেদন জানালো যে তাকেও যেন একজোড়া শিঙ্ দেওয়া হয়। সব প্রাণীকেই জুপিটার শিঙ্ দিয়েছেন, শুধু তাকেই শিঙ্ থেকে বঞ্চিত করেছেন।

জুপিটার উটের এই বাজে আবদার শুনে, শিঙ্ তো দিলেনই না, বরং ওর কান দুটোকে ছেঁটে আরো ছোট করে দিলেন।

গাধা ও ফড়িং ॥ ৬৬ ॥

ফড়িং-এর ডাক শুনে এক গাধা খুব মুগ্ধ হল। তারও হচ্ছে হল, ফড়িং-এর মত সুরালো গলা পেতে। তাই সে ওদের কাছে গিয়ে জানতে চাইল, 'কি খাও ভাই তোমরা,--যার জন্য এত সুন্দর গানের গলা তোমাদের ?'

ওরা বললো—"আমরা শিশির-বিন্দু ছাড়া অন্য কিছু খাই না তো !"

তারপর থেকে গাধাও অন্য খাবার ছেড়ে শুধু শিশির খেতে লাগলো। ফলে, তার মৃত্যু ঘটল।

[একজনের সুখাদ্য আর এক জনের বিষ]

হারকিউলেস[২] ও গাড়োয়ান ॥ ৬৭ ॥

একজন গ্রাম্য গাড়োয়ান অন্যমনস্ক হয়ে গাড়ী চালাচ্ছিল। ফলে, এক জলারাস্তায় উপর দিয়ে যাবার সময়, গাড়ীর চাকা দুটো কাদার মধ্যে বসে যায়। তখন গাড়ীটানা ঘোড়া দুটোও আর নড়তে পারলো না।

১। গ্রীকপুরাণোক্ত স্বর্গাধিপতি, দেবরাজ।

২। গ্রীক পুরাণোক্ত মহাবীর।

গাড়োয়ান গাড়ীকে তোলার কোন রকম চেষ্টা না করেই হতাশ হয়ে, হারকিউলেসকে জোর গলায় ডাকতে লাগলো—তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য। হারকিউলেস গাড়োয়ানের ডাক শুনে, উপস্থিত হলেন, কিন্তু গাড়ী তুলতে কোনরূপ সাহায্য না করে বললেন, চাকাতে নিজের কাঁধ লাগাও ; যারা নিজের কাজ নিজে করে, দেবতারা তাদের সহায় হন।

[কাজ না করে, শুধুমাত্র প্রার্থনা করলেই কার্যসিদ্ধি হয় না—দৈব ও পুরুষকারের মিলনেই সম্যক্ ফললাভ হয়]

লাঙ্গুলহীন শৃগাল ॥ ৬৮ ॥

এক শেয়াল একবার এক ফাঁদে আটকা পড়ে যায়। শেষে কোনরূপে ঘাড় বাঁকিয়ে সে পালিয়ে এলো—কিন্তু তাকে লেজটি হারিয়ে আসতে হয়।

প্রকাশ্য দিবালোকে নিজের এই দুর্দশা দেখে একেবারে মুসড়ে পড়লো সে ভাবলো, লেজ-কাটা হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরণই শ্রেয়ঃ।

যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত একটা খারাপ কিছুকে মূলধন করে লাভ উঠানোর ইচ্ছায়, সে একদিন সব শেয়ালকে এক সভায় ডাকলো।

ওদের বললো, 'আমি সবাইকে ডেকেছি, আমার আদর্শ অনুসরণ করার জন্য। লেজ কাটিয়ে আমি যে কিরূপ আরাম আর আনন্দে আছি, তা যদি তোমরা একবার বুঝতে পারতে! অবশ্য, আমি কি নিজেই বিশ্বাস করতে পারতাম যে লেজ হারিয়ে এত আরাম!—সত্যি, তোমরা বুঝে দেখ, লেজের মত বিশ্রী অপ্রয়োজনীয় আর ঘোরতর অসুবিধাজনক বাড়তি একটা জিনিস বহন করার কোন মানে হয়? অথচ সব চেয়ে আশ্চর্য কথা হচ্ছে, আমরা, শেয়ালরা, সবই এতদিন ধরে ওটাকে সযত্নে বহন করে চলেছি। তাই, হে আমার ভাই-বোনরা, আমার ইচ্ছে, আজ থেকে সবাই নিজেদের লেজ কেটে ফেলুক আর আরামে থাকুক।

বক্তৃতা শোনার পর সবচেয়ে বয়সে প্রবীণ এক শেয়াল ভীড় ঠেলে এগিয়ে এল। তারপর বললো, ভাই—তোমার লেজটি ফিরে পাওয়ার যদি কোন সম্ভাবনা থাকতো, তাহলে কিন্তু আমাদের কাছে, লেজ কেটে ফেলার উপদেশ দিতে না।

বৃদ্ধা ও চিকিৎসক ॥ ৬৯ ॥

এক বৃদ্ধা, চোখের দৃষ্টি হারিয়ে অন্ধ হয়ে গেল। একজন চিকিৎসককে ডেকে সাক্ষী রেখে সেই বৃদ্ধা বললো আপনি যদি আমার চোখ ভালো করে দিতে পারেন, তাহলে আপনাকে অনেক টাকা-কড়ি দেব। আর যদি ভালো করতে না পারেন, তাহলে এক কানা-কড়িও দেব না। এই চুক্তিতে সম্মতি দিয়ে, চিকিৎসক বৃদ্ধার চক্ষু-চিকিৎসা সুরু করে দিলেন। এর জন্য প্রতিদিনই তাঁকে বৃদ্ধার বাড়ীতে আসতে হত এবং প্রতিদিনই তিনি কিছু কিছু জিনিষপত্র সেখান থেকে নিয়ে যেতেন।

শেষ পর্যন্ত চিকিৎসক, বৃদ্ধার চোখ ভালো করে ফেললেন। তারপর বৃদ্ধাকে বললেন,—তা হলে, এবার আমার পাওনা দিয়ে দাও।

বুড়ী ভালো হয়ে দেখলো তার বাড়ীতে আর একটি জিনিষও অবশিষ্ট নেই। তাই সে নীরব থাকলো।

বুড়ীর কাছে চিকিৎসক পাওনা আদায় করতে না পেরে গেলেন, বিচারকের কাছে বিচাব চাইতে।

বিচারক বুড়ীকে ডেকে পাঠালেন। তারপর তিনি বললেন, চিকিৎসকের পাওনা দাওনি কেন?

বৃদ্ধা বললো, পাওনা দিইনি, এ কথা ঠিক নয়! আমি বলেছিলুম, আমাব চোখ ভালো করতে পারলে, অনেক অর্থ দেব, আর না করতে পারলে কিছুই দেব না। এখন চিকিৎসক বলছেন, আমার চোখের দৃষ্টি ফিরে এসেছে। কিন্তু, আমি ঠিক বিপরীতটাই মনে করছি। কারণ, আমার চোখ নষ্ট হওয়ার আগে, আমার বাড়ীর সবকিছু জিনিষপত্র দেখতে পেতাম। কিন্তু উনি যখন বলছেন যে আমার চোখ আগের মত হয়ে গিয়েছে, তখন আমি আমার সেই সব জিনিষপত্র দেখতে পাচ্ছি না কেন?

[যদি চালাকী কর, তাহলে তামাসাতে আপত্তি কেন]

শশক ও ভেক ॥ ৭০ ॥

নিরীহ এবং নিরুপায় শশকের দল। শত্রুর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত ঠিক করলো যে তাদের মত দুর্বল প্রাণীদের একসঙ্গে মৃত্যুবরণ

করা ছাড়া আর কোন গতি নেই। তাই সকলে একত্রে মৃত্যুবরণ করবার জন্য সেই দুর্ভাগা প্রাণীগুলি এক হ্রদের ধারে এসে পৌঁছুলো। একদল ব্যাঙ সেই সময় হ্রদের তীরে উঠে বসেছিল। হঠাৎ একদল শশককে দেখে ভয় পেয়ে ঝপ্‌ঝপ্ করে জলে লাফিয়ে পড়ে, জল তোলপাড় করে ফেললো।

ব্যাপার দেখে, এক প্রাচীন শশক অন্য সবাইকে বললো, তাহলে আমাদেরও ভরসা আছে দেখছি; একেবারে হতাশ হবার মত অবস্থা আমাদের নয়; কেননা, আমাদের দেখে ভয় পায়, এমন দুর্বল প্রাণীও আছে।

[অন্যের দুর্দশা দেখে খুশী না হয়ে, সাহস অবলম্বন কর, আর মনে রেখো, যত দুঃখই তুমি পাওনা কেন তোমার চেয়েও দুঃখী আছে—যার ভাগ্যের সঙ্গে তুমি নিজের ভাগ্য বদল করতে চাইবে না]

সারস ও কৃষক ॥ ৭১ ॥

সবেমাত্র এক চাষী তার ক্ষেতে বীজ বপন করেছে আর সেই বীজ খাবার জন্যে এক ঝাঁক সারস এসে হাজির। চাষী তখন সারস ধরার জন্য জাল পেতে রাখলো। পরে যখন সে জাল গুটোতে যায়, তখন দেখে যে, সারসদের সঙ্গে একটা বকও ধরা পড়েছে। বকটি মিনতি করে বললো, মশায়, দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন। আমি সারস নই বক। আমি আপনার ক্ষেতের বীজ খাইনি। দেখতেই পাচ্ছেন, আমি সত্যি সত্যি নিরপরাধ বক। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, পাখিদের মধ্যে আমিই সব চেয়ে বেশী কর্তব্যপরায়ণ এবং সব চেয়ে বেশী ধার্মিক। আমি—

ওর কথা শেষ হতে না হতেই কৃষক ওকে থামিয়ে দিয়ে বললো—না হয়, বুঝলাম যে তুমি যা বলছ, সবই ঠিক। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এই, তোমাকে আমি সারসদের সঙ্গেই ধরেছি, তারা ক্ষেতের বীজ নষ্ট করেছে। ওদের সঙ্গে থাকার ফল তোমাকেও ভোগ করতে হবে।

[অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ]

বঁড়শী-ওয়ালা ও ছোটমাছ ॥ ৭২ ॥

এক বঁড়শী-ওয়ালা, মাছ ধরে তার জীবিকা নির্বাহ করতো। একবার সারাদিন বহু চেষ্টা করেও একটি ছোট মাছ ছাড়া সে আর কিছুই ধরতে পারেনি।

ছোট মাছটি কাকুতি-মিনতি করে বললো, আমাকে ছেড়ে দিন। আমি এত ছোট যে, আপনার খাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠতে পারিনি। আমাকে এখন জলে ছেড়ে দিন ; তারপর যখন পুরোপুরি বড় হয়ে উঠবো, তখন আবার এখানে এসে আমাকে ধরে নিয়ে যাবেন।

বঁড়শী-ওয়ালা বললো, না-না, তা হয় না। তুমি এখন আমার হাতের মুঠোয়। কিন্তু একবার যদি তোমাকে জলে ছেড়ে দিই, তাহলে তখন তুমিই বলবে, পার তো ধর।

[হাতেব একটি পাখি, ঝোপের দুটি পাখির চেযে ভালো]

বানর এবং উট ॥ ৭৩ ॥

পশুদেব এক সভায় বানর উঠলো নাচ দেখাতে। নাচ দেখে সবাই হর্ষধ্বনি করে বাহবা দিল। তাই দেখে উটেব খুব ঈর্ষা হল। হঠাৎ, সেও এগিয়ে গেল নাচ দেখাতে। কিন্তু উটেব নাচ এমন উদ্ভট হল যে সবাই মিলে ওকে মেরে তাড়িয়ে দিল।

[যার কাজ তারে সাজে]

ছুঁচো ও তার মা ॥ ৭৪ ॥

এক বাচ্চা ছুঁচো, তার মা-কে বললো, মাগো আমি দেখতে পাচ্ছি চোখ দিয়ে। ওর কথা সত্যি কি না তা পরখ করার জন্য মা-ছুঁচো সামনে এক গুচ্ছ সুগন্ধি সবজির পাতা রেখে জিজ্ঞাসা কবলো, তোমার সামনে কি আছে, বাছা ?

বাচ্চাটি বললো—একটা পাথর।

মা বিস্মিত হয়ে বললো, ওম্ মা,—তুমি দেখতে তো পাচ্ছই না, গন্ধও পাচ্ছ না!

[এক দোষ ঢাকতে গিয়ে আর এক দোষকে অস্বীকার করা]

সিংহী ॥ ৭৫ ॥

যে সব বন্য প্রাণী এক সঙ্গে অনেকগুলি সন্তান প্রসব করে, তারা একবার সারা বন তোলপাড় করে ফেললো। কি ?—না,—আমাদের মত কেউ নয়!

অহঙ্কারে মত্ত হয়ে সবাই চললো সিংহীর কাছে। গিয়ে বললো, একসঙ্গে কটি শিশু তুমি প্রসব কর?

সিংহী গম্ভীরভাবে বলল—একটি মাত্র; কিন্তু সেই একটির নাম সিংহ।..

[সংখ্যার চেয়ে গুণ বড়]

এক বোঝা লাঠি ॥ ৭৬ ॥

এক চাষীর ছেলেরা সব সময় ঝগড়া-ঝাটি করতো। কৃষক অনেক চেষ্টা করেছিল, ঝগড়া-ঝাটি না করে যাতে ওরা শান্তিতে বাস করতে পারে। কিন্তু অনেক উপদেশ দিয়েও ওদের বোঝানো যায় নি। তাই কিছু একটা উদাহরণ দিয়ে সে ছেলেদের মতি-গতির পরিবর্তন করতে চাইলে।

একদিন চাষী সবাইকে ডাকলো। তারপর অনেকগুলো লাঠিকে এক সঙ্গে বেঁধে বেশ বড় একটা বাণ্ডিল তৈরী করতে বললো। বোঝা তৈরি হলে, কৃষক এক ছেলেকে ডেকে বললো, দেখ ত ভাঙতে পার কিনা এই বাণ্ডিলটা। সবাই চেষ্টা করলো, কিন্তু সব চেষ্টাই বৃথা হল।

কৃষক তখন বাঁধন খুলে লাঠিগুলোকে আলাদা করে দিয়ে বললো, এবারে এক একটা লাঠি ভাঙতে পার দিনা দেখ। সবাই তখন মট্ মট্ করে এক একটা লাঠি অনায়াসে ভেঙে ফেললো।

তখন সেই চাষী বললো, বৎসগণ! তোমরা যতদিন মিলে-মিশে এক সঙ্গে থাকতে পারবে, ততদিন শত্রুর সঙ্গে লড়তে পারবে এবং হারাতেও পারবে। কিন্তু মিলেমিশে একসঙ্গে কাজ করতে না পারলেই, তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য।

[একতাই বল]

এক ব্যক্তি ও এক সিংহ ॥ ৭৭ ॥

এক সময় একজন লোক এক সিংহের সঙ্গে একত্রে পথে যেতে যেতে তর্ক-বিতর্ক চালাচ্ছিল। বিষয় হচ্ছে, পৃথিবীতে যত জীব সৃষ্টি হয়েছে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী বলবান আর সাহসী কে?

তর্ক জমতে জমতে ক্রমশঃ যখন বেশ গরম হচ্ছিল সেই সময় হঠাৎ ওরা

রাস্তার ধারে একটা পাথরের মূর্তি দেখতে পায়। মূর্তিটা আর কিছুই নয়, একটা লোক এক সিংহের গলা টিপে ধরে, তার উপর বসে আছে।

সিংহের সঙ্গে যে লোকটি পথ হাঁটছিল, সে সিংহকে বললো, কি হে, দেখলে তো, সিংহের চেয়ে মানুষ যে ঢের শক্তিশালী আর সাহসী, তার প্রমাণ তো রাস্তার ধারেই আছে। এর চেয়ে বেশী কি প্রমাণ চাও?

সিংহ বললো, এ হচ্ছে তোমাদের বানানো গল্প। আমরা যদি মূর্তি গড়তে পারতাম, তা হলে, তোমরা যেমন একটা সিংহকে মানুষের পায়ের তলায় দেখেছ, তেমনি দেখতে, আমরাও একটা সিংহের থাবার তলায় কুড়িটা মানুষকে রেখেছি।

[মানুষ তার নিজের দুর্বলতাকে ঢেকে রাখাব সাক্ষী নিজেই]

ধাত্রী এবং নেকড়ে বাঘ ॥ ৭৮ ॥

এক নেকড়ে বাঘ খাবারের সন্ধানে ঘুরতে ঘুবতে এক বাড়ীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় সেই বাড়ীব এক শিশুর কান্নায় বিরক্ত হয়ে, তার ধাত্রী শিশুটিকে ভয় দেখিয়ে বলছিল, চুপ কর বাছা, নৈলে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দেব, তোমাকে নেকড়ের কাছে।

কথাটা শুনেই নেকড়ে দাঁড়িয়ে পডলো, যদি সত্যি সত্যি শিশুটিকে ওর কাছে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে আজ ভোজের মত একটা ভোজ হয়ে যায়! কিন্তু সন্ধ্যের অন্ধকার যখন ঘনিয়ে এল, তখন শিশুর কান্নাও থেমে গেল। নেকড়ে শুনতে পেল, ধাত্রী তখন শিশুটিকে আদর করছে এই বলে, খুব ভাল তুমি, সোনা ছেলে, যদি শয়তান নেকড়েটা আসে তাহলে বাছাধনকে আর বাঁচাতে হচ্ছে না, মেরে একেবারে শেষ করে দেব।

নেকড়ে, শুনে ভয় পেয়ে গেল, খুব হতাশও হল। চলে যেতে যেতে বক্ বক্ করতে করতে গেল, কি আশ্চর্য, মানুষ জাতটার কথার কি কিছু ঠিক নেই; বলবে এক, করবে আর এক!

বানর এবং শুশুক ॥ ৭৯ ॥

নাবিকদের মধ্যে অনেক দিনের একটি প্রথা ছিল,—সমুদ্রযাত্রার সময়, ক্ষুদ্রাকার জাতের কুকুর কিম্বা বানর নিয়ে যাওয়া। উদ্দেশ্য অন্য কিছু নয়, একটু আমোদ করে সময় কাটানো।

একবার এক নাবিক সমুদ্রযাত্রার সময় একটি বানর নিয়ে গেল, সঙ্গী হিসাবে। হঠাৎ এক সামুদ্রিক ঝড়ে জাহাজটি ডুবে যায়। নাবিকরা সাঁতার কেটে ডাঙায় ওঠার চেষ্টা করে। বানরটিও সাঁতার কাটতে কাটতে ডাঙায় ওঠার চেষ্টা করে হাবুডুবু খাচ্ছিল।

ওকে কোন বিপদগ্রস্ত মানুষ ভেবেই, এক শুশুক ওকে পিঠে চড়িয়ে কুলের দিকে এগিয়ে যায়। যখন ওরা এথেন্সের পিরিয়াস নামক পোতাশ্রয়ের বিপরীত দিকের তীরভূমিতে পৌঁছিবার মুখে, তখন শুশুক বানরকে জিজ্ঞাসা করলো—তুমি কি এথেন্সের লোক?'

বানর বললো,—হ্যাঁ, আমি এথেন্সেরই লোক; শুধু তাই নয়, আমি এথেন্সের এক নামজাদা বংশেরই লোক।

'তাহলে পিরিয়াস চেন নিশ্চয়ই--শুশুক আবার প্রশ্ন করলো।

বানর বললো,—বাঃ, তা, আর চিনি না! ও-যে আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু! বানর ভেবেছিল, পিরিয়াস বোধ হয় কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম।

বানরের এই মিথ্যা ভাষণ শুনে, শুশুক রেগে, এক ডুবে বানরকে নিয়ে জলের তলায় চলে গেল এবং বানরকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে, তাকে তার ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে দিল।

ঘোড়া এবং হরিণ ॥ ৮০ ॥

এক বিরাট তৃণভূমিতে একটি ঘোড়া মনের সুখে চরে বেড়াতো। এক হরিণ এসে হঠাৎ সেই তৃণভূমিতে ভাগ বসিয়ে ইচ্ছে মত চরে বেড়াতে লাগলো। ঘোড়া এই ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখতে পারলো না। হরিণকে সেই তৃণভূমি থেকে বিতাড়িত করার জন্যে, একজন লোককে বললো, ভাই, তুমি যদি আমাকে একটু সাহায্য কর, তাহলে ওই পাজি হরিণটাকে একটু শিক্ষা দিই। লোকটি বললো, খুব ভালো কথা। আনন্দের সঙ্গেই আমি তোমাকে সাহায্য করবো; তবে তুমি যদি আমার কথামত কাজ কর, তাহলেই—।

ঘোড়া বললো, রাজী আছি। কি করতে হবে বল।

লোকটি বললো, কঠিন কিছু নয়; তুমি আমাকে তোমার পিঠে চড়তে

দাও, আর মুখে একটা কিছু পরিয়ে দিতে দাও ; তারপর দেখ, কি ভাবে হরিণটাকে জব্দ করি।

ঘোড়া তক্ষুনি রাজী হয়ে গেল। আর লোকটি, ঘোড়ার মুখে লাগাম দিয়ে ওর পিঠের উপর চড়ে বসলো। ফলে, প্রতিশোধ নেওয়া তো হলই না, উল্টে ওকে চিরকালের জন্য মানুষের দাসত্ব করতে হল।

[যদি প্রতিশোধ নিতে চাও, তাহলে তার জন্য মূল্য দিতে হবে—স্বাধীনতা]

নেকড়ে বাঘ ও ভেড়া ॥ ৮১ ॥

একবার এক নেকড়ে কুকুরের কামড় খেয়ে বেশ দুর্দশায় পড়ে গেল : নড়াচড়া সব বন্ধ। একটি ভেড়াকে তার কাছ দিয়ে যেতে দেখে, সে বললে,—ভাই, ঐ নালা থেকে যদি একটু জল এনে দাও, তাহলে আমার খাবার আমি নিজেই খুঁজে নিতে পারবো। বেশ কাতর ভাবেই নেকড়ে এই অনুরোধ জানালো।

ভেড়া বললো, বলেছ ঠিকই ; আমারও কোন সন্দেহ নেই যে তোমার কাছে যদি জল দিতে যাই, তা হলে আমাকেই তুমি তোমার খাবার হিসাবে পেয়ে যাবে।

বিধবা ও তার ভেড়া ॥ ৮২ ॥

এক বিধবার একটিমাত্র ভেড়া ছিল। ভেড়ার শরীর থেকে খুববেশী পরিমাণ লোম সংগ্রহ করার জন্য সে কাঁচি দিয়ে এমনভাবে লোম কাটতে আরম্ভ করলো, তার চামড়া পর্যন্ত কেটে যেতে লাগলো। ভেড়াটি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে বললো, এমনভাবে কষ্ট দিচ্ছ কেন আমাকে ? আমার রক্তে ভিজে গেলে কি লোমের ওজন বাড়বে ? আর তুমি যদি আমার মাংসই চাও, তাহলে কসাইকে ডেকে পাঠাও ; সে এসে আমাকে এই দুঃখের জীবন থেকে এক্ষুনি মুক্তি দিক্। আর যদি শুধু লোম চাও, তাহলে লোমকাটা লোককে ডাক, যে রক্তপাত না করেই আমার লোম কেটে নিতে পারবে।

কুকুর ও তার প্রভু ॥ ৮৩ ॥

এক ব্যক্তি দেশ ভ্রমণে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। সেই সময় দেখলো যে, তার কুকুরটা দরজা গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি রেগে চীৎকার করে বললে, হাঁ করে দেখছো কি? আমার সঙ্গে যেতে হবে না? তৈরী হবে কখন?

কুকুরটি লেজ নাড়তে নাড়তে বললো, আমি অনেকক্ষণ থেকেই প্রস্তুত; আপনারই শুধু গুছিয়ে নেওয়া বাকী।

দুষ্টমতি কুকুর ॥ ৮৪ ॥

এক ব্যক্তির একটি কুকুর ছিল। কুকুরটা বুনো স্বভাব আর শয়তানীতে পাকা ছিল। সেজন্য তার মনিব, তার গলায় একটা ভারী কাঠ ঝুলিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল, যাতে সে চলাফেরা করতে পারলেও পাড়া-প্রতিবেশীদের যেন কামড়াতে বা বিরক্ত করতে না পারে।

পাজী কুকুরটা কিন্তু বেশ গর্বের সঙ্গেই সেই কাঠটাকে টানতে টানতে দোকান পট্টিতে হাজির হল। সকলের দৃষ্টি এবার ওর উপর পড়ল।

ওকে দেখে, এক চালাক কুকুর ফিস্‌ফিস্ করে বললো, যত কম গোলমাল করবে, তত তোমার পক্ষে ভালো। কেননা, তোমার গলায় যে চিহ্নটি আছে, ওটি তোমার গুণের পুরস্কার নয়—তুমি যে একটি শয়তান তা জানিয়ে দেবার চিহ্ন।

[অনেক সময় অনেকে তার কুখ্যাতিকেই সুখ্যাতি বলে মনে করে। অনেকে বরং শয়তানির দ্বারা পরিচালিত হবে, তবু অখ্যাত হয়ে থাকতে চায় না]

পক্ষী-শিকারী ও ভরত পাখি ॥ ৮৫ ॥

একজন শিকারী এক মাঠে জাল পাতছিল। তাই দেখে এক ভরত-পাখি দূর থেকেই জানতে চাইলো, শিকারী ওখানে কি করছে। শিকারী

বললো, তেমন কিছু নয়, একটা উপনিবেশ তৈরী করবো। তারই প্রথম শহরের ভিৎ তৈরী করছি। এই বলে, জাল পাতা শেষ করে, শিকারী কিছুদূর গিয়ে আত্মগোপন করে থাকলো। ভরত পাখি শিকারীর কথায় বিশ্বাস করে, ওখানে যেতেই সে ফাঁদে পড়ে গেল। শিকারী দৌড়ে এসে ওকে ধরে ফেললো। ভরত পাখি বললো, আচ্ছা লোক তো তুমি! এই যদি তোমার উপনিবেশ হয়, তা হলে বেশী লোকে তোমার এখানে বসবাস করতে আসবে না।

চাতক ও দাঁড়কাক ॥ ৮৬ ॥

এক চাতক এবং দাঁড়কাকে তুমুল তর্ক—তাদের মধ্যে কে বেশী সুন্দর। দাঁড়কাক এই বলে শেষ করলো, তোমার যত সৌন্দর্য, সে তো শুধু গ্রীষ্মকালেই কিন্তু আমার সৌন্দর্য চিরকালের। কত শীতই যে আমি কাটিয়ে দিতে পারি।

[ক্ষণস্থায়ী আড়ম্বরের চেয়ে দীর্ঘস্থায়িতা অনেক ভালো][১]

একটি ছোট মোমবাতি ॥ ৮৭ ॥

একবার একটা মোমবাতি সন্ধ্যের সময় পুড়তে পুড়তে মোমের ঝুরি নামিয়ে যখন বেশ থক্‌থকে আর মোটাসোটা হয়ে উঠলো, তখন সে অনেক লোকের সামনে এই বলে অহঙ্কার করছিল যে, সে সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল; চাঁদ আর তারা তো তার কাছে কিছুই নয়!

হঠাৎ সেই সময় এক দম্‌কা বাতাস এসে মোমবাতিটা নিবিয়ে দিল।

১। ওয়ারিংটনের অনুবাদে এই শিরোনামার কাহিনীটি অন্য ধরনের:

এক চাতক এক দাঁড়কাককে তেরেউস্‌-এর পুরা-কাহিনী শোনাচ্ছিল। বললো, আমি আসলে এথেন্সের এক রাজকুমারী, এথেন্সের রাজার মেয়ে, তারপর সে বলে গেল তেরেউসের অপরাধের কাহিনী। বলে গেল, কি ভাবে তার জিভ্‌ কেটে নিয়েছিল তেরেউস্‌…ইত্যাদি।

দাঁড়কাক বললো, জিভ্‌ না থাকতেই এত কথা; জিভ্‌ থাকলে তুমি আরো কত দুঃসাহসিকতার গল্প বলতে।

নীতি:—যারা বেশী কথা বলে তাদের মিথ্যা কথাও তাদের মুখ থেকেই ধরা পড়ে।

একজন লোক মোমবাতিটা আবার জ্বেলে দিয়ে বললো, বন্ধু! জ্বলতে থাক কিন্তু তুমি মুখ বন্ধ করে থাক। আর মনে রেখো, আকাশের আলো কোনদিনই নেভে না।

এক রাখাল ও তার হারানো ষাঁড় ॥ ৮৮ ॥

এক রাখালের একটি ষাঁড়কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না; তাই সে বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, যদি তার সন্ধান পাওয়া যায়। যখন কিছুতেই ষাঁড়ের খোঁজ পেল না, তখন সে অরণ্য-পর্বতের দেবদেবী মার্কাজি[১] ও প্যানেজ[২] নাম ধরে বললো, যদি সে একবার খোঁজ পেয়ে যায়, কে তার ষাঁড়টিকে চুরি করেছে, তাহলে সে দেবতাদের কাছে মেষ বলি দেবে।

বলতে বলতে সে যখন একটা চড়াই বেয়ে উঠে উৎরাই-এর দিকে দৃষ্টিপাত করলো, দেখতে পেল তার সেই সুন্দর ষাঁড়টি মৃতদেহের উপর দাঁড়িয়ে আছে এক সিংহ।

তখন সেই রাখাল আবার দেবদেবীদের নাম ধরে বললো যে, সে যদি চোর সিংহের কবল থেকে নিজেই রক্ষা পায়, তাহলে একটা ষাঁড় বলি দেবে।

[আমাদের সব প্রার্থনা সব সময় পূরণ হলে কে বা নিজে ইচ্ছে করে মরতো]

কুকুরদষ্ট মানুষ ॥ ৮৯ ॥

এক ব্যক্তিকে কুকুরে কামড়েছিল। তাই সে এমন কাউকে খুঁজছিল যে তাকে ভালো করে তুলতে পারে। একজন ওকে উপদেশ দিল, মশাই, যদি ভালো হয়ে উঠতে চান, তাহলে যেখানে কুকুরে কামড়েছে সেই জায়গার রক্ত একটুকরো রুটিতে মাখিয়ে, যে কুকুরটা আপনাকে কামড়েছে, তাকে খেতে দিন।

লোকটি হেসে বললো, আমি যদি তোমার উপদেশ অনুসারে কাজ করি, তাহলে রাজ্যের যত কুকুর এসে আমাকে কামড়াবে।

[শত্রুকে উৎকোচ দিয়ে যদি কেউ বশীভূত করতে চায়, তাহলে শত্রু বাড়তেই থাকবে]

১-২। গ্রীক পুরাণোক্ত দেবতাদ্বয়।

একদল পথিক ও প্লেন গাছ ॥ ৯০ ॥

তখন গ্রীষ্মকাল। মাথার উপর মধ্যাহ্নের সূর্য। একদল পথিক গরমে ক্লান্ত হয়ে অদূরে একটা প্লেন গাছকে দেখতে পেয়ে গাছের তলায় শুয়ে বিশ্রাম করতে লাগলো। তারপর উপরের দিকে তাকিয়ে এক পথিক আর এক পথিককে বললো—গাছটা একেবারে অকেজো আর বন্ধ্যা—কোন মানুষের কাজেই লাগে না।

প্লেন গাছ ওদের কথা শুনে বললো, অকৃতজ্ঞ জীব, শোনো, তোমরা তো এই মুহূর্তে আমার কাছ থেকেই উপকার পাচ্ছো, অথচ বিদ্রূপ করে বলছো, আমি নাকি একটা অপদার্থ।

[অকৃতজ্ঞতা যেমনি অন্ধ, তেমনি হীন]

ওকগাছ এবং শরগাছ ॥ ৯১ ॥

এক ওকগাছ, ঝড়ে পড়ে গিয়ে, নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল। নদীর ধারে অনেক শরগাছ ছিল। ওকগাছ ওদের দেখে অবাক। ভাবলো—কি আশ্চর্য, সে নিজে কত বড় আর শক্ত গাছ। কিন্তু ঝড়ের দাপট সে সহ্য করতে পারলো না ; অথচ কত ছোট এবং সরু এই শরগাছগুলো—তারা ঠিক দাঁড়িয়ে আছে।

শরগাছ বললো, অবাক্ হচ্ছ কেন ? তুমি ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েছিলে, তাই ঝড় তোমাকে উপড়ে ফেলে নদীর জলে ছুঁড়ে দিয়েছে। আর আমরা কত ছোট, একটু হাওয়ার কাছেও নতিস্বীকার করি, তাই আমরা নিশ্চিন্ত।

বিষধর সাপ ও র‍্যাঁদা ॥ ৯২ ॥

এক বিষধর সাপ খাদ্যের সন্ধানে হঠাৎ এক কামারের দোকানে ঢুকে পড়ে। একধারে একটা লোহার যন্ত্র দেখে সাপটা সেদিকে এগিয়ে গিয়ে

তার উপর ছোবল মারতে লাগলো। লোহার যন্ত্র (র‍্যাদা) বললো, কিছু লাভ নেই; আমাকে শতবার কামড়ালেও কিচ্ছু পাবে না, কেন-না আমারও কাজ হচ্ছে কামড়ানো।

মার্কারী[১] ও কাঠুরিয়া ॥ ৯৩ ॥

এক কাঠুরিয়া, নদীর ধারে একটা বড় গাছ কাটছিল। হঠাৎ তার হাত থেকে কুড়ুলটা ফস্‌কে নদীর জলে পড়ে তলিয়ে যায়। কাঠুরিয়া তখন হতাশ হয়ে নদীর ধারে বসে করুণ স্বরে বিলাপ করতে লাগলো। মার্কারি ওর কান্না শুনে, সদয় হয়ে ওর সামনে এলেন। কাঠুরিয়ার কাছে ওর কুড়ুল হারানোর কাহিনী শুনে তিনি জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা সোনার কুড়ুল নিয়ে ফিরে এলেন। বললেন, দেখ ত এইটাই তোমার কুড়ুল কি-না! কাঠুরিয়া বললো, না না, এটা আমার নয়। মার্কারী আবার জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, ফিরে এলেন একটা রূপোর কুড়ুল নিয়ে। বললেন, দেখ তো, এইটাই বোধহয় তোমার। কাঠুরিয়া আগের মতই বলল, না-না, এটাও আমার নয়। মার্কারী তৃতীয় বার জলের তলায় গিয়ে, কাঠুরিয়ার নিজের কুড়ুলটা নিয়ে ফিরে এলেন। কাঠুরিয়া দেখেই চিনতে পারলো, আর আনন্দে হাত বাড়িয়ে বললো, এইটাই আমার কুড়ুল। মার্কারী নির্লোভ কাঠুরিয়ার সততায় এত খুশী হলেন যে, তিনি তাকে আগের ছুটো কুড়ুলও দিয়ে দিলেন।

কাঠুরিয়া যখন গ্রামে ফিরে এল, তখন ওর কাছে সবাই এই ঘটনা শুনলো। ওদের মধ্যে একজন ভাবলো, তার কুড়ুলটাকে যদি জলে ফেলে দিয়ে কাঁদে, তাহলে সেও দু-তিনটে কুড়ল পেয়ে যাবে। তাই, নির্দিষ্ট জায়গাতে গিয়ে কাঠ কাটতে কাটতে ইচ্ছে করেই কুড়ুলটা নদীর জলে ফেলে দিয়ে নদীর তীরে বসে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগলো।

মার্কারী এসে ওর কান্নার কারণ শুনে, ঝাঁপ দিয়ে নদীর জলে পড়ে তলিয়ে গেলেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এলেন, একটা সোনার

১। গ্রীক পুরাণোক্ত দেবতা, মুনিটারের পুত্র।

কুড়ুল নিয়ে। বললেন—দেখ তো, এইটাই বোধ হয় তোমার! কাঠুরিয়া সঙ্গে সঙ্গে বললো, আজ্ঞে হ্যাঁ। এইটাই আমার। সে ব্যগ্র হয়ে দু-হাত বাড়িয়ে কুড়ুলটাকে ধরতে যায় আর কি। মার্কারী তখন লোভী আর আর মিথ্যাবাদী লোকটাকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য সোনার কুড়ুল তো দিলেনই না, ওর নিজেরটাও এনে দিলেন না।[১]

[সততাই শ্রেষ্ঠ পথ]

রাজহংস ও বক ॥ ৯৪ ॥

একদল রাজহাঁস ও একদল বক একই জায়গায়, খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছিল। একদিন হঠাৎ একদল শিকারী সেখানে এসে হাজির। বকগুলো হাল্কা পাখি, তাই ওরা সঙ্গে সঙ্গে উড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু মোটা বলে রাজহাঁসগুলো পালাতে পারলো না, শিকারীদের হাতে ধরা পরে গেল।

[গৃহযুদ্ধে তারাই বাঁচে, যাদের বিশেষ কোন বন্ধন নেই]

সিংহ ও তার সহচরগণের শিকার পর্ব ॥ ৯৫ ॥

এক সময় সিংহ ও অন্যান্য প্রাণীরা ঠিক করলো, এক সঙ্গেই তারা শিকার করে বেড়াবে। শিকার করতে গিয়ে ওরা যখন একটা বিরাট হরিণ মারলো, তখন সিংহ, নিজেই সেই হরিণটাকে তিনভাগ করে বললো—আমি বনের রাজা, তাই এক ভাগ আমার। আর এক ভাগও আমারই, কারণ হরিণটাকে তাড়া করে আমিই মেরেছি। বাকীটা যার গায়ে জোর আছে, সে-ই নিয়ে নিক্।

ঈগল ও তীর ॥ ৯৬ ॥

এক তীরন্দাজ, এক ঈগলকে লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লো। সেই তীর গিয়ে লাগলো, ঈগলের বুকে। ঈগল যখন মৃত্যুযন্ত্রণায় চীৎকার করছিল, তখন হঠাৎ তার নজরে পড়লো, তীরের পেছনে ঈগলের পালকই লাগানো

১। জন ওয়ারিংটনের অনুবাদে, মার্কারীর অন্য নাম হার্মিস (Hermes) ব্যবহৃত হয়েছে। শেষোক্ত কাঠুরিয়ার কাহিনীটিও সেখানে অনুপস্থিত।

আছে দেখে' বললো,—হায়রে, যে অস্ত্রের জন্য আমরা নিজেরাই দায়ী, তার আঘাতই সবচেয়ে গুরুতর।

কুকুর ও জাড় ॥ ৯৭ ॥

এক কুকুর, ঘোড়ার দানাখাবার তাড়ের মধ্যে শুয়ে থাকতো। ঘোড়াগুলো এলে দাঁত বার করে, তর্জন গর্জন করে ওদের ভয় দেখাত। একদিন একটি ঘোড়া বললো, কি শয়তানী দেখ,—শয়তানটা নিজে তো খড়কুটো খাচ্ছেই না, আমাদেরও খেতে দিচ্ছে না।

মাছি ও ষাঁড় ॥ ৯৮ ॥

একটা মাছি, এক ষাঁড়ের মাথার উপর গুন্‌গুন্ করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ; শেষে ষাঁড়ের শিঙে বসে বললো, একটু বিরক্ত করলাম, মাপ করো। অবশ্য আমার ভার যদি সহ্য করতে না পার, তাহলে বলো ; বললেই আমি উড়ে যাব। ষাঁড় বললো—ও নিয়ে মাথা ঘামিও না হে ; তুমি থাক বা যাও—আমার কাছে একই কথা। আর সত্যি বলতে কি, আমি জানতামই না যে, তুমি আমার শিঙের উপর বসে আছ। [১]

[যত ছোট তত অহঙ্কার]

জুপিটার[১], নেপচুন[২], মিনার্ভা[৩] ও মোমাস[৪] ॥ ৯৯ ॥

শোনা যায়, জুপিটার, নেপচুন ও মিনার্ভা একবার যাচাই করতে চেয়েছিলেন, দেবতাদের মধ্যে কে সব চেয়ে ভালো জিনিস তৈরী করতে পারে।

১। জন ওয়ারিংটনের অনুবাদে ষাঁড়ের পরিবর্তে উটের কথা বলা হয়েছে। "এক মাছি, বোঝাই করা এক উটের পিঠে চড়ে অহঙ্কার করতে লাগলো। পুরো একদিন পথ চলার পর যখন যাত্রা শেষ হল, তখন, মাছিটা মাটিতে নেমে বললো, ভাই উট, তুমি নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত, তাই আমি খুব তাড়াতাড়ি তোমার পিঠ থেকে নেমে পড়েছি। উট বললো, ধন্যবাদ, আমি কিন্তু তুমি আছ কি নেই তা বুঝতেই পারিনি।

এই কাহিনী থেকে এই কথাই বোঝা যায় যে, একজন নিজেকে যখন কেউ কেটা বা কেষ্ট বিষ্টু মনে করে, তখন আসল স্বরূপটি প্রকাশিত হলে, তার হতাশ হবারই কথা।

১। দেবরাজ, স্বর্গাধিপতি। ২। সমুদ্রাধিপতি—জুপিটারের ভ্রাতা

৩। জুপিটারের কন্যা, জুপিটারের মস্তক থেকে উদ্ভূতা।

৪। গ্রীকপুরাণোক্ত দেবতা।

জুপিটার তৈরী করেছিলেন একটি মানুষ। প্যালাস[১] তৈরী করলেন একটি বাড়ী; নেপচুন তৈরী করলেন একটি ষাঁড়, আর মোমাস-কে (যাঁকে তখনও ওলিম্পাস থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি) ভার দেওয়া হল জিনিসগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করার জন্য।

মোমাস সব চেয়ে আগে ষাঁড়ের দোষ দেখাতে আরম্ভ করলেন। বললেন, ওর শিঙ দুটো যদি চোখের নীচে থাকতো, তাহলে গুঁতোগুঁতি করার সময়, দেখতে পেত, সে কাকে গুঁতোচ্ছে। এর পর মানুষের দোষ দেখাতে গিয়ে বললেন—ওর বুকে কোন জানালা নেই, যার ফলে ওর মনের ভাব আর চিন্তা কিছুই দেখা যাবে না। সব শেষে বাড়ীর দোষ দেখিয়ে বললেন—ওর কোন চাকা নেই, যাতে ওর অধিবাসীরা ইচ্ছে করলে অসৎ প্রতিবেশীদের কাছ থেকে দূরে সবে যেতে পাবে।

জুপিটার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমালোচকটিকে স্বর্গ থেকে এই বলে বিতাড়িত করলেন যে, দোষ দেখা-ই যাদের অভ্যাস, তাদের কেউ-ই সন্তুষ্ট করতে পারবে না। আর, দোষ ধরা তারই সাজে, যে নিজে কিছু ভালো কাজ করে দেখিয়েছে।

সূর্যের বিয়ে ॥ ১০০ ॥

একবার রোদের তাপ খুব বেশী বেড়ে গেল। লোকে বললে,—সূর্যের বিয়ে হচ্ছে। পশুপক্ষীরা এ সংবাদ শুনে খুব খুশী হল; ব্যাঙের দল তো আনন্দে উৎসব শুরু করতে মনস্থ করলো। কিন্তু এক বুড়ো ব্যাঙ, হঠাৎ একটি কথাতেই ওদের উৎসব করার ইচ্ছেটি বানচাল করে দিল। কারণ, বুড়ো ব্যাঙ, বুঝতে পেরেছিল—সূর্যের বিয়ে হচ্ছে—এ ত আনন্দের সংবাদ নয়, দুঃখের সংবাদ—বিপদের সংবাদ। সে ব্যাঙদের ডেকে বললো, দেখ হে, এক সূর্যের তাপেই যখন জলাভূমি শুকিয়ে যায় এবং তাতে আমাদের ঘোরতর অসুবিধা হয়। এর পর কমপক্ষে গোটাছয়েক বাচ্ছা সূর্য এসে যদি ওদের বাপের সঙ্গে যোগ দেয়, তখন কি অবস্থা হবে আমাদের?

১। মিনার্ভার অপর নাম—প্যালাস এথেনা।

চোর ও তার মা ॥ ১০১ ॥

এক ছাত্র, তার সহপাঠীর একটি বই চুরি করে তার মাকে রাখতে দিল। মা, ওকে তিরস্কার না করে, বাহবা দিল। কালক্রমে সেই ছেলে যখন বড় হল তখন সে এক পাকাচোর হয়ে গেল। পরে একদিন যখন ধরা পড়লো, তখন তার কোমরে দড়ি বেঁধে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হল। চোরের মৃত্যু দেখার জন্য বিরাট এক কৌতূহলী জনতা চোরকে অনুসরণ করতে করতে বধ্যভূমির দিকে যেতে লাগলো। জনতার মধ্যে চোরের মা-ও ছিল। সে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে, হাহাকার করতে করতে যাচ্ছিল।

চোর তার মায়ের ঐ অবস্থা দেখে একজন প্রহরীকে অনুরোধ করলো, তাকে যেন একটিবার তার মায়ের কানে কানে একটিমাত্র কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়। প্রহরী চোরকে তার মায়ের কাছে নিয়ে গেল। তার মা, ছেলের কথা শোনার জন্য, তার কানটি এগিয়ে দিল ছেলের মুখের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই চোর তার মায়ের কানটা কামড়ে ছিঁড়ে দিল। চোরের মা যন্ত্রণায় চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। অন্যান্য সবাই তখন চোরের মা-কে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। বললো, লোকটা এমনিতে চোর আর পাজী, কিন্তু ওর শয়তানীর হাত থেকে মাকেও নিষ্কৃতি দিলে না।

চোরটা তখন বললো—আমার অধঃপতনের কারণ হচ্ছে, আমার মা। যখন ছেলেবেলায় আমি আমার সহপাঠীদের বই চুরি করেছিলাম, তখন যদি মা আমাকে বেশ করে ধমক দিতো—তিরস্কার করতো—মারধোর করতো,—তাহলে আজ আমার এমন দশা হত না।

[বিষবৃক্ষের অঙ্কুরকে বিনষ্ট কর। দণ্ড না দিয়ে সন্তানকে মানুষ করা যায় না]

বিড়াল ও ইঁদুরের পাল ॥ ১০২ ॥

এক বিড়াল বুড়ো হয়ে আর আগের মত ইঁদুর ধরতে পারতো না। তখন মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো, কি উপায়ে ইঁদুর ধরা যায়। শেষ পর্যন্ত তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ভাবলো, যদি নিজেকে এমন এক অবস্থায় রাখা যায়, যাতে ইঁদুরগুলো ওকে একটা থলি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারবে না, অন্ততঃপক্ষে মরা বলে ভাবতেও দ্বিধাবোধ করবে না; তাহলে, ইঁদুরগুলো ওর কাছে আসতে ভয় পাবে না।

এই ভেবে, সে নিজের পেছনের পা দুটোকে দেয়ালের একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে, মুখটা নীচের দিকে করে এবং সামনের পা দিয়ে মাটিতে ভর করে ঝুলে থাকলো।

একটা বুড়ো ইঁদুর, বেড়ালের কাছে না এসে দূর থেকেই ফিস্‌ফিস্ করে বললো, কত কত থলে দেখেছি, কিন্তু বেড়ালের মাথাওয়ালা থলে কোন দিনই দেখিনি!

আর একটা ইঁদুর বললো, যতদিন খুশী ঝুলে থাক মা-জননী, তোমার পেটে যদি খড়ও পোরা থাকে, তাহলেও বিশ্বাস করে তোমার পাশটি দিয়ে হাঁটবো না।

[বুড়ো পাখিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ধরা যায় না]

সিংহ এবং তার তিনজন মন্ত্রী ॥ ১০৩ ॥

সিংহ, ভেড়াকে ডেকে বললে, দেখ ত' আমার নিঃশ্বাসে কি কোন দুর্গন্ধ পাচ্ছো? ভেড়া বললো—পাচ্ছি। সিংহ বললো, মূর্খ! এই বলেই সঙ্গে সঙ্গে ভেড়ার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নিল। এরপর নেকড়েকে ডেকে বললো, গন্ধ পাচ্ছো কি? নেকড়ে বললো, কৈ না-তো! সিংহ বললো,—চাটুকার! বলেই সঙ্গে সঙ্গে নেকড়েকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেললো। এর পর শেয়ালকে বলল—তুমি কি বল? শেয়াল বললো,—খুব ঠাণ্ডা লেগেছে আমার—ভীষণ সর্দিতে ভুগছি ক'দিন ধরে, তাই নাক আমার পুরোপুরি বন্ধ।

[বিজ্ঞ ব্যক্তি বিপদের সময় নির্বাক থাকাই বাঞ্ছনীয় মনে করে]

গাঁয়ের মেয়ে ও তার দুধের ভাঁড় ॥ ১০৪ ॥

এক গাঁয়ের মেয়ে মাথায় দুধের ভাঁড় নিয়ে পথ হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিল: এই দুধ বিক্রি ক'রে যে টাকা পাবো, তা'তে আমি অনেক ডিম কিনতে পারবো—অন্ততঃপক্ষে আগের ও পরের টাকা মিলিয়ে শ' তিনেক ডিম তো কিনতে পারবোই। পচা কিংবা পোকামাকড়ে নষ্ট করা ডিম বাদ দিলেও কমপক্ষে আড়াই শ' বাচ্চা তো ডিম থেকে পাবোই। বাচ্চাগুলো একটু বড় হ'লে, যে সময়টাতে বাজারে তত বেশী মুরগী পাওয়া যায় না,—ঠিক সেই সময় ওগুলোকে বিক্রি করবো। তাতে নোতুন

বছরের উৎসব আসবার আগেই —একটি গাউন কিনতে পারবো, বেশ সবুজ রঙের গাউন, —না সবুজ না, অন্য রঙের—, ভেবেই দেখি,—হ্যাঁ সবুজেই আমাকে মানাবে ভালো, সবুজই চাই—। ঐ পোষাক 'পরেই মেলায় যাবো। আমাকে দেখে এগাঁয়ের ওগাঁয়ের তরুণরা মুগ্ধ হ'য়ে আমাকে বিয়ে করতে চাইবে—। কিন্তু না, কাউকেই পাত্তা দেব না আমি! বরং একটুখানি ব্যঙ্গ করতে করতেই ঘুরে বেড়াবো আমি।...”

শুধু ভাবা নয়, মাথা নেড়ে যে কায়দায় ওদের পাত্তা না দিয়ে, ব্যঙ্গ ক'রে ঘুরে বেড়াবে, তারই ভাবভঙ্গী দেখাতে গিয়ে, তার মাথার হাঁড়ি মাটিতে পড়ে চৌচির।

একমুহূর্তে তার সুখস্বপ্ন ভেঙে গেল।

গোরুর পাল ও কসাই ॥ ১০৫ ॥

কসাইদের কাজই হচ্ছে গো-বংশ ধ্বংস করা। তাই সব কসাইকে বধ করার জন্য কৃতসংকল্প হয়ে, সব গোরু এক জায়গায় সম্মিলিত হয়ে এবং শিঙ্ বাগিয়ে প্রস্তুত হ'ল। সেই সময় এক বুড়ো ষাঁড়—অনেকদিন ধরে যে ক্ষেতে লাঙ্গল টেনেছে,—বললো, বন্ধুগণ, ভেবেচিন্তে কাজ ক'রো। কসাইরা আমাদের কাটে ঠিকই, কিন্তু তাদের কাজের মধ্যেও একটু ভব্যতা আছে। কিন্তু কসাইদের পরিবর্তে আমরা যদি আনাড়ীদের হাতে পড়ি, তা হ'লে আমাদের মরতে হবে দু'বার। কারণ মনে রেখো, মানুষ গো-মাংস খাবেই, কসাই থাকুক আর না থাকুক।[১]

[বরং মন্দ যা আছে তা থাকুক, ভালোর জন্য অজ্ঞাত কিছুর কাছে না যাওয়াই ভালো]

দুই পাত্র ॥ ১০৬ ॥

এক মাটির কলসী এবং এক পেতলের কলসী, নদীর স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল। পেতলের কলসী, মাটির কলসীকে বললো,—ভাই, কাছাকাছি এসো, আমিই তোমাকে রক্ষা করবো। মাটির কলসী বললো,—ধন্যবাদ,

১। কাহিনীতে butcher বা কসাইদের কর্মকুশলতার দিকটাকে তবু ভালো বলা হয়েছে। এদের পরিবর্তে যদি botcher-দের বা আনাড়ী ও নির্মম লোকের হাতে পড়তে হয় তা'হলে কষ্ট পেয়ে মরতে হবে।

আমি ঠিক ঐ ভয়েই তোমার কাছে যাচ্ছি না। তুমি যদি একটু দূরে দূরে থাক, তা'হলেই আমি নির্ভয়ে যেতে পারি। কিন্তু তুমি যদি কাছে আস, তা হ'লে সত্যি বলছি, আমার দুর্দশার সীমা থাকবে না।

[শক্তিশালী প্রতিবেশীর কাছ থেকে দূরে থেকো। কারণ—সংঘর্ষ বাধলে, দুর্বলের বিপদ অনিবার্য।]

চিকিৎসক ও তার রোগী ॥ ১০৭ ॥

এক চিকিৎসক, কিছুদিন ধরে এক রোগীর তত্ত্বাবধান করছিল। পরে সেই রোগী মারা যায়। তার শবযাত্রার সময়, চিকিৎসকও দলের মধ্যে ছিল। চিকিৎসক রোগীর আত্মীয়-স্বজনদের বলছিল,—আহা, বেচারার মৃত্যু হত না, যদি সে মদটা ছাড়তে পারতো, নিজের ভালোমন্দ বুঝতো, আর ভালো খাওয়া-দাওয়া করতো।

শবযাত্রীদের মধ্যে একজন, চিকিৎসকের কথা শুনে বললো,—মশাই, ও কথা এখন বলে কি হবে? রোগী যখন বেঁচেছিল, তখন তাকে এ সব নির্দেশ দিলেই পারতেন।

[সবচেয়ে ভালো উপদেশ তখন আসে, যখন আর উপদেশ কোন কাজে লাগে না]

মূষিক সভা ॥ ১০৮ ॥

বিড়ালের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, তার হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভের উপায় খোঁজার জন্য একবার সব ইঁদুর এক সভায় মিলিত হ'ল। কত মত, কত পরিকল্পনা! সবই অগ্রাহ্য হল। অবশেষে এক ছোকরা ইঁদুর বললো, বেড়ালের গলায় একটা ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া হোক্, তা'হলে সে যখন আসবে তখন ঘণ্টার শব্দ শুনে আমরা পালিয়ে যেতে পারবো। এই প্রস্তাবে খুশী হয়ে সবাই সমস্বরে হর্ষধ্বনি ক'রে সম্মতি জ্ঞাপন করলো।

একটি বুড়ো ইঁদুর গোড়া থেকেই চুপ ক'রে বসেছিল। সে উঠে বললো,—বাঃ, এ খুব ভালো যুক্তি সন্দেহ নেই; এতে আমাদের সাফল্য অনিবার্য। কিন্তু আমার ছোট্ট একটি প্রশ্ন আছে, বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে যাবে কোন্ ইঁদুর?

[বলা আর করা, এক নয়]

সিংহ এবং ছাগল ॥ ১০৯ ॥

দারুণ খরা। সূর্যের তাপে সব কিছু শুকিয়ে যাচ্ছে। সেই সময় এক ছাগল ও এক সিংহ পিপাসায় কাতর হ'য়ে একই সময় ছোট্ট এক ঝর্ণাতে হাজির হ'ল, জল খাবার জন্য। তারপরেই লাগল তাদের ঝগড়া—কে আগে জল খাবে! দেখা গেল যে উভয়েরই মরণ পণ। জল খাওয়া হোক্ আর না হোক, কেউই দাবী ছাড়তে রাজী নয়। একটু দম নেবার জন্য, ঝগড়া থামিয়ে ওরা যখন আকাশের দিকে তাকালো, তখন দেখলো যে তাদের মাথার উপর এক ঝাঁক শকুনি উড়ে বেড়াচ্ছে। শকুনির ঝাঁক অপেক্ষা করছে, ওদের মধ্যে যার আগে মৃত্যু হবে, তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। ওরা তখন নিজেদের ঝগড়া থামিয়ে বললো, ঐ সব শকুনির আহার জোগানোর চেয়ে বন্ধুভাবে থাকাই ভালো।

স্বর্ণডিম্বপ্রসূ হংসী ॥ ১১০ ॥

এক ভাগ্যবান ব্যক্তির একটি হাঁস ছিল। হাঁসটি প্রতিদিন একটি ক'রে সোনার ডিম পাড়তো। লোকটি কিন্তু এতে সন্তুষ্ট না হ'য়ে, সব ডিম একসঙ্গে হস্তগত করার জন্য হাঁসটিকে হত্যা করলো। কিন্তু পেট চিরে দেখলো, সোনার ডিম আর নেই—সব কিছু সাধারণ হাঁসের মতই।

[বেশী চাইলে সব হারাবে]

গ্রাম্য লোক ও ভাঁড়[১] ॥ ১১১ ॥

রোমদেশের এক অভিজাত, বর্ধিষ্ণু এবং গণ্যমান্য ব্যক্তির ইচ্ছে হল,—তিনি রোমের অধিবাসীদের আনন্দ দেবার জন্য এক অভিনব অভিনয় দেখাবার ব্যবস্থা ক'রবেন। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, যে অভিনব অভিনয় করতে পারবে, তিনি তাকে প্রচুর পুরস্কার দেবেন। পুরস্কারের নামে প্রলুব্ধ হ'য়ে দেশের সব জায়গা থেকে, শিল্পীরা এসে হাজির হল, তাদের কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য। ওদের মধ্যে এক বুদ্ধিমান ভাঁড়ও ছিল।

ভাঁড় এসে বললো,—সে এক অভিনব ধরণের অভিনয় করতে পারে, যা কোন দিন কোন রঙ্গমঞ্চে প্রদর্শিত হয়নি। এই সংবাদ যখন

১। The mountebank and the country man. শব্দটির ইংরাজী অর্থ (1) a boastful pretender (2) a quack doctor boasting

চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো তখন সমস্ত শহর ভেঙে পড়লো ওকে দেখার জন্য। রঙ্গমঞ্চের আশেপাশে আর তিলধারণের জায়গা নেই।

এদিকে সেই অভিনেতা যখন, দলবল না নিয়ে এমন কি কোন জিনিষপত্র না নিয়ে, একাই রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়াল, তখন কৌতূহলে আর উত্তেজনায় সব দর্শক অস্থির। হঠাৎ, লোকটা নিজের মাথাটাকে বুকের কাছে ঝুঁকিয়ে দিয়ে শুয়োরছানার ডাক ডাকতে লাগলো। ফলে দর্শকরা বললো, তোমার জামার তলায় শুয়োরছানা লুকানো আছে, আমরা খুঁজে দেখবো। খুঁজে দেখার পর যখন কিছুই পাওয়া গেল না তখন তাদের কি হর্ষধ্বনি! সবাই সাবাস্ সাবাস্ ক'রে উঠলো।

দর্শকদের মধ্যে একজন গ্রাম্য লোক ছিল। সে বললো, এ আর কি হল? এর চেয়ে অনেক ভালো খেলা দেখাতে পারি আমি! আর, কালই আমি করে দেখাবো।

ফলে, পরের দিন সকালে, আর-ও বেশী লোক জমে গেল। লোকে অবশ্য আগের অভিনেতাব কথা স্মরণ করেই, গ্রাম্য লোকটিকে বাহবা দেওয়া তো দূরের কথা, ওকে নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগলো।

যাই হোক্—দু'জনেই রঙ্গমঞ্চে এল। প্রথমে সেই ছলনাকারী-ই অভিনয় দেখিয়ে খুব হাততালি আব বাহবা পেল। তখন সেই গ্রাম্যলোকটি ওর জামার তলায় লুকোনো একটি শুয়োরছানার কানধরে খুব জোরে মলতে লাগলো—যতক্ষণ পর্যন্ত না ছানাটি চীৎকার করে উঠে।

দর্শকরা চেঁচিয়ে উঠলো। বললো, ভাঁড় একেবারে সত্যিকারের শুয়োর ছানার মত ডাক ডেকেছে; এর চেয়ে অনেক ভালো। গ্রাম্য লোকটিকে ওবা সবাই মিলে ধিক্কার দিতে লাগলো।

গ্রাম্য লোকটি তখন ওদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য, শেষ পর্যন্ত, জামার তলা থেকে শুয়োরছানাটি টেনে বার করে দেখালো। বললো,—তা'হলে ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা ভেবে দেখুন, আপনারা কি রকম সমঝদার!

নিমন্ত্রিত কুকুর ॥ ১১২ ॥

একবার এক ভদ্রলোক, তাঁর এক বন্ধুকে, নিজের বাড়িতে এক ভোজে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ভদ্রলোকের কুকুরটিও আমন্ত্রিত বন্ধুর কুকুরটিকে

আমন্ত্রণ জানিয়ে বলেছিল,—তুমিও এসো, আজ রাতে আমাদের ওখানেই খাওয়া-দাওয়া হবে!

কুকুর তো আমন্ত্রণ পেয়ে খুব খুশী। খেতে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভোজের প্রস্তুতি দেখতে দেখতে নিজের মনেই বললো,—বিরাট ভোজই বটে! সত্যি বলতে কি, আমার নিজেকে তো বেশ সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছে। খুব তৃপ্তি করেই খাবো আজকে; বেশ কিছুটা জমিয়ে রাখতেও হবে, কারণ কাল হয়তো কিছুই জুটবে না। বলতে বলতে, আনন্দে লেজ নাড়তে নাড়তে—ওর বন্ধুর দিকে তাকালো, চোখে বেশ ধূর্ততা।

ওর এই লেজনাড়া কিন্তু একজন পাচক দেখতে পেল। কোত্থেকে একটা কুকুর এসে জুটেছে দেখে, সে কুকুরের পা ধরে জানালা গলিয়ে নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আচম্‌কা মাটিতে পড়ে, কেঁউ কেঁউ করে রাস্তা ধরে ছুটতে লাগলো কুকুরটা। ওকে সেই অবস্থায় দেখে পাশের বাড়ির এক কুকুর ছুটতে ছুটতে এসে বললো,—কেমন ভোজ হল হে? কুকুরটি একটু বেদনার্ত হাসি হেসে বললো,—ওঃ, এত বেশী খাওয়া হয়ে গেছে যে, কোন্‌ রাস্তা দিয়ে যে বেরিয়ে এসেছি, তাও মনে পড়ছে না এখন।

(যারা খিড়কির দরজা দিয়ে ঢোকে, জানালা দিয়েই তাদের বেরিয়ে আসতে হয়)

ছাগল ও রাখাল ॥ ১১৩ ॥

খুব ঝড় সেদিন, তুষারপাতেরও বিরাম ছিল না। সেই সময় এক রাখাল তার ছাগলের পালকে তাড়িয়ে নিয়ে, এক গুহায় ঢুকে পড়লো, আশ্রয় নেবার জন্য। ওর ছাগলগুলো তখন তুষারে সাদা হয়ে গেছে। রাখাল দেখলো যে সেই গুহাতে একপাল বুনো ছাগল আগেই ঢুকে পড়েছে, সেগুলো দেখতে অনেক বড়; সংখ্যাতেও অনেক বেশী। নিজের ছাগল-গুলোকে বুনো ছাগলদের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য, রাখাল ডালপালা যা' সঙ্গে এনেছিল, সব ছুঁড়ে দিল, বুনো ছাগলদের দিকে। পরে আকাশ যখন পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন দেখলো যে তা'র ছাগলগুলো না খেতে পেয়ে সব মরে গেছে, আর বুনো ছাগলগুলো পাহাড়ে-বনে ফিরে গেছে।

রাখাল যখন একাই ফিরে এল, তখন ওর পাড়াপ্রতিবেশীরা, সব কথা শুনে, ওকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে ছাড়লো না,—কারণ সে না-পারলো।

নিজের ছাগলগুলোকে বাঁচাতে, না পারলো বুনো ছাগলগুলোকে ধরে আনতে।

[নতুন বন্ধু পাবার জন্য যারা পুরোনো বন্ধুদের অবহেলা করে, শেষ পর্যন্ত নিজের দোষে তারা দুইই হারায়]

এক জেলে ॥ ১১৪ ॥

এক জেলে নদীতে গিয়েছিল মাছ ধরতে। নদীতে জাল পাতার পর, একটা লম্বা দড়িতে পাথর বেঁধে, সেই পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে জালের দু'ধারের জল আলোড়িত করতে লাগলো ধারের মাছগুলোকে জালের ভেতরে তাড়িয়ে দেবার জন্য। একজন পড়শী, ওর এই কাজ দেখে, ওকে মৃদু ভৎর্সনা করে বললো,—জল ঘোলা করছো কেন এমন করে, লোকে খাবে না ?

জেলে বললে,—আমি দুঃখিত। এ'তে তোমার অবশ্য আনন্দিত হবার কথা নয়। কিন্তু এভাবে জল ঘোলা করেই আমাকে জীবিকা-নির্বাহ কবতে হয়।

ব্যাঙ্‌দের প্রার্থনা ॥ ১১৫ ॥

অনেক কাল আগের কথা। তখন ব্যাঙ্‌দের স্বাধীনতা ছিল অনেক। যে যার খুশীমত সব কাজ করত। শেষ পর্যন্ত ঐ অবস্থার উপব বিরক্ত হয়ে একদিন সবাই মিলিত হয়ে, হট্টগোল ক'রে, জুপিটারের কাছে প্রার্থনা করলো—তিনি যেন ওদের জন্য একজন রাজা পাঠিয়ে দেন। রাজা পেলে তারা শৃঙ্খলার সঙ্গে এবং সৎভাবে জীবনযাপন করতে পারবে।

জুপিটার বুঝতে পারলেন যে, ওদের মনে—দেমাক দেখা দিয়েছে। তাই তিনি একটু হেসে, জলাশয়ে একটা কাঠের গুঁড়ি ছুঁড়ে দিলেন। ফলে,—জল তোলপাড়। আলোড়নের শব্দে ভয় পেয়ে—ব্যাঙেরা যে দিকে পারলো,—কেউ জলের তলায়, কেউ পাঁকের নীচে,—লুকিয়ে পড়লো। শুধু তাই নয়, সেই গুঁড়ির দশ হাত দূরেও থাকতে সাহস করলো না।

অবশেষে এক ব্যাঙ্—বেশ দূর থেকেই জলের উপর চোখ দুটি তুলে, ওদের নোতুন রাজাকে একবার ভালো করে দেখে নিল। যখন দেখলো যে নোতুন রাজা একেবারে অচল এবং অনড়, তখন সবাই মিলে সাঁতার

কেটে ওর কাছাকাছি এসে ঘুরে বেড়াতে লাগলো, পরে ক্রমশঃ সাহস সঞ্চয় করে ওরা লাফ দিয়ে গুঁড়ির উপর চড়ে বসলো। তারপর লাফালাফি আর দাপাদাপি করে নোতুন রাজাকে অগ্রাহ্য করতে লাগলো।

এ ধরণের রাজা পেয়ে ওরা খুশী হল না। দ্বিতীয়বার ও'রা জুপিটারের কাছে প্রার্থনা জানালো, একজন কর্মদক্ষ আর 'রাজার মত রাজা' পাঠাতে। জুপিটার তখন এক বককে পাঠালেন ওদের রাজা করে। বক এসে যত পারে, ব্যাঙ্‌ ধরে মনের সুখে গবগব করে গিলতে লাগলো। ওর গ্রাস থেকে ব্যাঙের দল আর নিষ্কৃতি পেল না।

তখন ওরা মার্কারিকে অনুরোধ করে জুপিটারের কাছে পাঠালো এই প্রার্থনা করে যে,—জুপিটার যেন তাদেব অপরাধ মার্জনা করেন এবং তাদের উপর অনুগ্রহ করেন।

জুপিটার বলে পাঠালেন যে, নিজেদের অপরাধের শাস্তি তারা পেয়েছে, তারা যেন এর পর থেকে নিজেদের স্বাভাবিক অবস্থাতে খুশী থাকতে শেখে।

গাধা ও তার মালিক ॥ ১১৬ ॥

এক মালিব একটি গাধা ছিল। গাধাকে খাটতে হত অনেক, কিন্তু পরিবর্তে খেতে পেত অনেক কম। ফলে, গাধা জুপিটারের কাছে প্রার্থনা জানালো, এই মালিকের বদলে, তাকে যেন ভাল আর একজন মালিক দেওয়া হয়। গাধার প্রার্থনা শুনে বিরক্ত হয়ে জুপিটার ওকে পাঠালেন এক কুমোরের কাছে। কিন্তু কুমোরের কাছে, গাধাকে আগের চেয়ে আরও বেশী খাটতে হল। গাধা আবার জুপিটারের কাছে প্রার্থনা করলো কুমোরের হাত থেকে ওকে মুক্তি দেবার জন্য। জুপিটার ওকে পাঠালেন এক মুচির কাছে। গাধা এবারে সব চেয়ে খারাপ মালিকের হাতে পড়লো! ওর খাটুনির আর শেষ থাকলো না। গাধা তখন দুঃখে হাহাকার করে বলতে লাগলো,—হায় হায়, পোড়া কপাল আমার ; আমার উচিত ছিল, প্রথম মালিকের কাছেই খুশী মনে থাকা। এখন দেখছি, আমার বর্তমান মনিব আমাকে শুধু খাটিয়ে খাটিয়ে শেষ করে দিচ্ছে না,—যখন আমি মরে যাব, তখন আমার চামড়াটাকে পর্যন্ত রেহাই দেবে না।

[এক জায়গায় যে অ-খুশী, অন্য জায়গায় গিয়েও সে খুশী হয় না]

চোর ও কুকুর ॥ ১১৭ ॥

এক চোর এক বাড়ীতে চুরি করতে এসে কিছু খাবারের টুকরো ছুঁড়ে দিয়ে সেই বাড়ীর কুকুরের মুখ বন্ধ করতে চেয়েছিল।

কুকুর বললো,—তফাৎ যাও। তোমাকে দেখে আগেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, এখন তোমার এই অকারণ ভব্যতা দেখে, বুঝতে পারছি, তুমি একটি পাকা শয়তান।

[ঘুষ দিয়ে নিজের খলতাকেই ঢাকবার চেষ্টা করা হয়]

জুপিটার ও মৌমাছি ॥ ১১৮ ॥

অনেক কাল আগের কথা। পৃথিবীর বয়স তখন অল্পই। এক মৌমাছি, তা'র বিরাট মৌচাক থেকে মধু নিয়ে, স্বর্গে গেল দেবতাদের কাছে উৎসর্গ করতে। জুপিটার, এই উপহার পেয়ে এত খুশী হলেন যে, মৌমাছিকে বললেন, যা চাও তাই পাবে তুমি ; কি চাও বল।

মৌমাছি বললো, হে মহান জুপিটার, হে আমার স্রষ্টা, আমার বিনীত প্রার্থনা—তোমার এই দুর্বল পরিচারককে একটি হুল দাও ; যখন কোন লোক আমার মৌচাক থেকে মৌ চুরি করতে আসবে, তখন যেন হুল ফুটিয়ে আমি তার প্রাণান্ত ঘটাতে পারি।

জুপিটার মানুষকে ভালোবাসতেন। তাই মৌমাছির এই ধরণের প্রার্থনায় তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। বললেন, তোমার প্রার্থনা, ঠিক তোমার অভিরুচি অনুসারে পূর্ণ করতে পারবো না। তবে, হুল তুমি পাবে। যখন কেউ তোমার মধু নিতে আসবে, তখন তুমি হুল বিদ্ধ করতে পারবে কিন্তু তোমার হুলে তার কিছুই হবে না। আর, সেই হুল তোমার নিজেরও মৃত্যুর কারণ হবে ; হুল ফোটানোর সঙ্গে সঙ্গে তুমিও প্রাণ হারাবে।

[যে তার প্রতিবেশীর ক্ষতি করার ক্ষমতা চায়, সে নিজের অভিশাপই ডেকে আনে]

শিকারী ও জেলে ॥ ১১৯ ॥

এক শিকারী, পাহাড় থেকে ফিরছিল, শিকার করে। সঙ্গে অনেক শিকার-করা প্রাণী। সেই সময় এক জেলেও মাছ ধ'রে, চুপড়ী ভর্তি ক'রে বাড়ী ফিরছিল। শিকারীর মাছের ঝোল খাবার ইচ্ছা হ'ল। জেলে

ভাবলো, মাংস হলে ভালো হয়। তাই ওরা দুজনে পরস্পরের শিকার অদল-বদল করে নিল। এভাবে প্রতিদিনই এর মাছ ও নেয়, ওর মাংস এ নেয়। একদিন ওদের এই ব্যাপার দেখতে পেয়ে একজন লোক বললো—এভাবে অদল-বদল করে মাছ মাংস খেতে খেতে, খাবারের এক ঘেয়েমিতে যখন অরুচি জন্মে যাবে, তখন আবার যে যার শিকারেই সন্তুষ্ট থাকবে।

ভরত পাখি ও তার বাচ্ছা ॥ ১২০ ॥

এক গমের ক্ষেতে কতকগুলো বাচ্ছা ভরতপাখি জন্মেছিল। ক্ষেতের গম তখন প্রায় পেকে এসেছে। মা-পাখি সব সময় চিন্তিত—কখন চাষীরা গম কাটতে এসে পড়বে। তাই খাবারের খোঁজে বেরুবার আগে প্রতিদিন সে তার বাচ্ছাদের বলে যেত, ওরা যেন চাষীদের সব কথাবার্তা শোনে। একদিন মা-পাখি যখন খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে গেল, তখন ক্ষেতের মালিক বললো—এবারে গম কাটবার সময় হয়ে গেছে দেখছি; পাড়া-পড়শীদের ডেকে নিয়ে এসে কেটে নিয়ে যেতে হবে। মা-পাখি ফিরে আসতেই বাচ্ছারা বললো, মা-মা—এক্ষুনি আমাদের নিয়ে চল অন্য কোথাও, ওরা গম কাটতে আসবে বলেছে।

মা-পাখি বললো,—এখনও তো সময় আছে তা হলে; লোকটা যখন পাড়া-পড়শীর উপর নির্ভর করে আছে, তখন এখনও ওকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে আর-ও কিছু দিন।

পরের দিন ক্ষেতের মালিক ক্ষেতে এসে দেখলো, সূর্যের তাপ যত বাড়ছে, গমও তত পাকছে। দেখে বললো,—না, আর দেরী করা চলে না। পাড়া-পড়শীদের উপর নির্ভর করে আর বসে থাকা চলবে না। আমাদের আত্মীয়-স্বজনদেরই ডাকতে হবে দেখছি। তারপর, তার ছেলেকে বললো, যাও, তোমার খুড়োকে আর খুড়তুতো ভাইদের বলে এসো যে কালই আমাদের গম কাটতে হবে।

মা-পাখি ফিরে এলে, বাচ্ছারা ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে মাকে ঐ সব কথা বললো। মা বললো, "ওঃ! তা' যদি হয়, তা' হলে এখনও সময় আছে। ভয় পাবার কিছু নেই। ওর আত্মীয়-স্বজনরা এখন নিজেদের ক্ষেতের কাজেই ব্যস্ত আছে। কিন্তু এর পরের দিন কি বলবে, বেশ মন দিয়ে শুনে রেখো।

পরের দিন মা-পাখি অনেক দূরে চলে গেল। চাষী সে দিন এসে দেখলো যে, গমের গাছগুলো প্রায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। দেখে, চাষী তাব ছেলেকে বললো,—না, আর কারুর জন্য অপেক্ষা করা যাবে না, আজ বাতেই কিছু মজুর ঠিক করো, কালই আমবা গম কাটা সুরু ক'বে দেব।

বাচ্ছারা যখন মা-কে এই কথা বললো, তখন মা বললো, হ্যাঁ, এখন উঠতেই হয়। কারণ কেউ যখন অন্য কারুব অপেক্ষা না করে নিজেব কাজে নিজেই লেগে যায়, তখন মনে রাখতে হবে যে কাজটা তখন হবেই।

সিংহ এবং শুশুক ॥ ১২১ ॥

এক সিংহ সমুদ্রতীরে ঘুবে বেড়াচ্ছিল। এক শুশুককে জলের ভেতব থেকে মাথা তুলতে দেখে, সিংহ বললো, এসো, আমবা মিতালি পাতাই. কাবণ, আমি হচ্ছি পশুরাজ আর তুমি হচ্ছ মৎস্যবাজ; আমাদের বন্ধুত্ব সবচেয়ে সেরা আর সবচেয়ে দৃঢ় হবে বলেই মনে করি। শুশুক মহাখুশী হয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করলো। কিছুদিন পব এক বুনো ষাঁড়ের সঙ্গে সিংহেব যুদ্ধ বেধে গেল। সিংহ এসে শুশুকেব সাহায্য চাইল। কিন্তু, সাহায্য করার ইচ্ছা থাকলেও শুশুক কিছুতেই জল ছেড়ে ডাঙায় উঠতে পারলো না। সিংহ তখন ক্রুদ্ধ হয়ে বললো,—এ তোমার বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছু নয়। শুশুক বললো, বৃথাই আমাকে দোষ দিচ্ছ বন্ধু; দোষ আমার স্বভাবের, কারণ জলের মধ্যে আমি যতই শক্তিশালী হইনা কেন, ডাঙায় একেবারে দুর্বল আর অসহায়।

[নিজের দলে টানাব আগে, দেখা উচিত যাদের দলে টানা হচ্ছে, তাদের ক্ষমতা কত এবং তারা সাহায্য করতে প্রস্তুত কিনা]

বন্দী তূর্যবাদক ॥ ১২২ ॥

এক যুদ্ধে এক তূর্যবাদক বন্দী হয়। সে কাতর ভাবে প্রার্থনা জানালো, —মহাশয়, অনুগ্রহ করে আমাকে ছেড়ে দিন; আমার প্রাণবধ করবেন না, কারণ আমি নিজে কাউকেই হত্যা করি নি। আমার কাছে কোন অস্ত্রশস্ত্রও নেই, শুধু এই শিঙাই আমার সম্বল।

যারা ওকে ধরেছিল, ওরা বললো,—"এই কারণেই তোমাকে আগে

মরতে হবে। কারণ, তুমি যুদ্ধ করনি বটে, কিন্তু রক্তপাত করার জন্য উৎসাহিত করছিলে।

[যে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহ দেয়, সেও যুদ্ধের একজন বড় অংশীদার]

মৌমাছি, পুরুষ মৌমাছি ও বোল্‌তা ॥ ১২৩ ॥

এক ওক গাছের কোটরে, মৌমাছিরা মৌচাক তৈরী করেছিল। পুরুষ মৌমাছিরা ভাবলো যে, এ কাজ ওরাই করেছে। অতএব পুরো চাকটাই ওদের। ওদিকে অন্য মৌমাছিরাও দাবী ছাড়তে চাইলো না। বিষয়টি বিতর্কিত ব'লে—বোল্‌তাকে বিচার করার ভার দিল ওরা।

দু'পক্ষের কথা শুনে সে বললো, বাদী এবং আসামী—দু দলের চেহারাতে এবং রঙে এত বেশী মিল আছে যে ঠিক করে বলা মুস্কিল, মৌচাকের আসল মালিক কারা। অবশ্য, ব্যাপারটা বিচারের জন্য আমার কাছে নিয়ে এসে ভালোই করেছ। আমি একটা প্রস্তাব করছি, তাতে ন্যায় বিচারের মর্যাদা রক্ষিত হবে ; তা হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক দলই তাদের নিজেদের মৌচাক তৈরী করুক ; মৌচাকের কুঠরী এবং তার আকৃতি দেখে এবং মৌচাকের মধু চেখে, অনায়াসে তখন বলা যেতে পারবে, কে মৌচাকের ন্যায়সংগত মালিক।

মৌমাছিরা সঙ্গে সঙ্গে বোল্‌তার প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল। পুরুষ মৌমাছিরা বললো, না ওতে আমরা রাজী নই।

তখন বিচারক বোল্‌তা রায় দিল, এখন অনায়াসে বোঝা যাচ্ছে, কারা ঐ মৌচাক তৈরী করেছে এবং কারা মৌচাক তৈরী করতে অক্ষম ; তাই ন্যায় বিচারে মোচাক মৌমাছিদেরই প্রাপ্য।

সিংহ ও গাধার শিকার ॥ ১২৪ ॥

এক সিংহ এবং এক গাধা স্থির করলো যে একত্রে শিকারে যাবে। শিকার খুঁজতে খুঁজতে ওরা এক গুহার কাছে এসে পৌঁছুলো, যেখানে অনেক বুনো ছাগলের আস্তানা। সিংহ গুহার সামনে ওঁৎ পেতে বসে থাকলো, আর গাধা ভেতরে ঢুকে, চীৎকার ক'রে, লাথি ছুঁড়ে, ছাগল-গুলোকে ভয় পাইয়ে বাইরের দিকে তাড়িয়ে দিতে লাগলো।

সিংহ যখন অনেকগুলো ছাগলকে হত্যা করলো, তখন গাধা বেরিয়ে এসে সিংহকে বললো,—'কেমন, বেশ জোরসে লড়াই ক'রে ছাগলগুলোকে বাইরে তাড়াতে পেরেছি তো?'

সিংহ বললো,—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,—তোমাকে যদি গাধা বলে আগের থেকেই না জানতুম,—তা'হলে তোমার তর্জন গর্জন শুনে আমিই ভয় পেয়ে যেতুম!

[ফোঁপরা ঢেঁকির আওয়াজ ভারী। যারা নিজের শক্তিসামর্থ্যের কথা না জেনেই অকারণে দম্ভ দেখায়, তারা যখন তাদের চেয়ে ঢের বেশী শক্তিশালীব দলে ঢুকে পড়ে, তখন হাস্যাস্পদ হয়]

পশুপাখির যুদ্ধ ও বাদুড় ॥ ১২৫ ॥

একবার পশু ও পাখির মধ্যে ভীষণ লড়াই বেধেছিল। অনেক দিন ধরে বোঝাই গেল না, কোন পক্ষ জিতবে। সেই সময়, বাদুড় কিন্তু কোন পক্ষে যোগ না দিয়ে নিরপেক্ষ থেকে গেল। কারণ, পশু আব পাখী, - উভয় জাতের চরিত্রই তার মধ্যে বর্তমান।

শেষে যখন পশুরা যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল, তখন বাদুড় ওদের দলে যোগ দিল এবং পাখীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো। পবে যখন পাখীবা এক ব্যূহ রচনা করে, পশুদের হারিয়ে দিতে লাগলো, তখন দেখা গেল,—দিনের শেষে, বাদুড় পাখীদের মধ্যে।

শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হল। তখন, বাদুড়ের চরিত্র দেখে, দু'দলেই ওকে ধিক্কার দিল এবং কোনপক্ষই ওকে আর দলভুক্ত করতে চাইলো না। সন্ধির সর্তে, বাদুড় একেবারেই বাদ পড়ে গেল।

সেই দিন থেকে বাদুড়কে গর্তে কিংবা অন্য কোন গুপ্ত স্থানে লুকিয়ে থাকতে হল। আবছা অন্ধকার ছাড়া অন্য কোন সময় বাইরে এসে সে আর মুখ দেখাতে সাহস করে না।

শেয়াল ও সজারু ॥ ১২৬ ॥

এক শেয়াল নদী পেরুতে গিয়ে, জলের তোড়ে এক সংকীর্ণ খাড়িতে ঢুকে পড়ে। খাড়ি থেকে বেরুতে না পেরে, শেয়ালকে অনেক দিন থাকতে হল সেখানে। ওর গায়ে তখন ঝাঁকে ঝাঁকে ডাঁশ। ডাঁশের উৎপাত সহ্য

করেই তাকে থাকতে হল। এক সজারু ওদিকে যেতে যেতে শেয়ালের দুরবস্থা দেখে, দয়াপরবশ হয়ে, শেয়ালকে বললো,—'ডাঁশগুলোকে কি তাড়িয়ে দেব ?—তোমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে নিশ্চয়ই।'

শেয়াল বললো, না ভাই, কিছু করতে হবে না।

সজারু অবাক হয়ে বললো,—'কেন হে ?'

শেয়াল বললো,—এই মাছিগুলো এখন আমার গায়ে বসে আছে, রক্ত খেয়ে ওদের পেট ভরে গেছে ; এখন ততবেশী রক্ত আর খাচ্ছে না। কিন্তু যেই তুমি এদের তাড়াবে, অমনি আর নোতুন এক ঝাঁক ডাঁশ ক্ষিদে মেটাবার জন্য ছুটে আসবে। তখন আমার শরীরে আর এক ফোঁটা রক্তও অবশিষ্ট রাখবে না।

নেকড়ে ও মেষপালক ॥ ১২৭ ॥

এক নেকড়ে অনেক দিন ধরেই এক ভেড়ার পালের পেছনে ঘুরঘুর করছিল, কিন্তু কিছুতেই ওদের কোন ক্ষতি করার সুযোগ পাচ্ছিল না। মেষপালকের অবশ্য সন্দেহ ছিল, তাই সেও সব সময়, নেকড়ের উপর কড়া নজর রাখছিল। কিন্তু যখন দেখলো যে, অনেক দিন ধরে পালের পেছনে ঘুরেও নেকড়ে ওদের কিছু ক্ষতি করার চেষ্টা করলো না, তখন মেষপালক ওকে শত্রু না ভেবে, মিত্র বলে ভাবতে লাগলো।

এরপর একদিন যখন মেষপালককে শহরে যেতে হল, তখন সে নেকড়েকে ডেকে তারই উপর ভার দিয়ে গেল, ভেড়াগুলোকে দেখাশোনা করার জন্য।

নেকড়ে এই সুযোগ পেয়ে ভেড়ার পালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাদের শেষ ক'রে ফেললো। মেষপালক শহর থেকে ফিরে এসে যখন দেখলো যে —তার ভেড়ার পাল নিঃশেষ হ'য়ে গেছে, তখন সে বললো,—যেমন মূর্খ আমি, নেকড়েকে বিশ্বাস ক'রে এর চেয়ে আর কি বেশী আশা করতে পারি!

[জানা শত্রুর চেয়ে অজানা বন্ধু ঢের বেশী বিপজ্জনক]

ভ্রমণকারী ও কাটারী ॥ ১২৮ ॥

দু'জন লোক একসঙ্গে ভ্রমণে বেরিয়েছিল। তাদের মধ্যে হঠাৎ একজন একটা কাটারি কুড়িয়ে বললো,—দেখ হে, আমি কি পেলুম! অন্য লোকটি

বললো,—আমি পেলুম বলছো কেন? বল, আমরা পেলুম। কিছুক্ষণ পরেই যার কাটারি হারিয়েছিল, সে এসে হাজির। যে কাটারি পেয়েছিল তাকে বললো, তুমি চোর, আমার কাটারি চুরি করেছ। লোকটি বললো— হায়রে, আমরা এবারে গেলুম।

অন্য লোকটি তখন বললো—আমরা গেলুম বলছো কেন? বল—আমি এবারে গেলুম। কারণ, যে, বন্ধুকে তা'র লাভের অংশ দিতে চায় না, সে কি আশা করতে পারে যে, বন্ধু তার বিপদের অংশীদার হবে।

ইঁদুর ও উদ্‌বিড়াল ॥ ১২৯ ॥

একবার বেশ কিছুদিন ধরে ইঁদুর ও উদ্‌বিড়ালের মধ্যে লড়াই চলছিল। ইঁদুরের দল, সবসময়ই প্রায় হারতো। তাই ওরা এক সভায় মিলিত হয়ে বিচার-বিবেচনা করতে বসলো। সবাই বললো যে ওদের হেরে যাবার কারণ হচ্ছে, ওদের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব। ঠিক করলো, এর পর তারা স্থায়ী সেনাপতি নির্বাচন করবে। তাই ওদের মধ্যে—যাদের সাহস ও ক্ষমতা বেশী তাদেরই ওরা সেনাপতির পদে নির্বাচিত করলো।

নোতুন সেনাপতিদের তো অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না। ওরা আরও বেশী ক'রে নিজেদের প্রাধান্য দেখাবার জন্য, মাথায় শিঙ্ বেঁধে নেয়—, যাতে শিঙ্‌গুলোকে একধরণের শিরস্ত্রাণ বলে মনে হয়, আর ওদের যেন অন্য সকলের কাছ থেকে আলাদা বলে মনে হয়।

আবার যখন যুদ্ধ সুরু হল, তখন আগেকার মতই ইঁদুরের দল পালাতে লাগলো। সবাই গিয়ে ঢুকলো গর্তের মধ্যে, সেনাপতিরা কিন্তু পালাতে পারলো না। ওদের শিঙ্‌গুলো আট্‌কে গেল। ফলে সেনাপতিদের ধরে উদ্‌বিড়ালেরা খেয়ে ফেললো।

[গুরুত্ব বাড়লে, বিপদও বাড়ে]

বালক এবং বিছুটি ॥ ১৩০ ॥

এক বালক মাঠে খেলা করছিল; সেই সময় ওর হাতে পায়ে বিছুটির পাতা লেগে যায়। বালকটি দৌড়ে বাড়ী গিয়ে তার মাকে বললো, মাগো, যেই-না ঐ নোংরা আগাছায় আমার হাত লেগেছে, অমনি ওরা আমার হাতে হুল ফুটিয়ে দিয়েছে।

মা বললো,—শুধু হাত লেগেছে, তাই হুল ফুটিয়েছে; পরে যখন আগাছার কাছে যাবে তখন হাতের মুঠোয় বেশ জোর করে ধরো, তখন আব হুল ফুটোবে না।

[যা করবে, সাহসের সঙ্গেই করো]

এক পীড়িত চিল ॥ ১৩১ ॥

এক চিল অনেকদিন ধরেই রোগে ভুগছিল। চিলটি তার মাকে বললো, মা-গো—তুমি কেঁদো না। বরং দেবতাদের কাছে প্রার্থনা কর, যাতে আমি ভালো হয়ে উঠি। মা-চিল বললো, হায় বাছা,—কোন্ দেবতার কাছে আমার প্রার্থনা জানাবো? সকলের বেদী থেকেই যে উৎসর্গ করা ভোজ্যাদি অপহরণ করেছি!

[মৃত্যুশয্যায় শুয়ে সারা জীবনের পাপের জন্য অনুতাপ কবা বৃথা]

ঈগল ও দাঁড়কাক ॥ ১৩২ ॥

এক উচু পাহাড়ের উপর থেকে নীচে ছোঁ মেরে এক ঈগল একটি ভেড়ার বাচ্চাকে তুলে নিয়ে যায়। এক দাঁড়কাক ঈগলের কার্যকলাপ দেখে ভাবলো, সেও ঐ ভাবে ছোঁ মেরে একটা ভেড়াকে তুলে নেবে। তাই সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে, সোঁ করে—নীচে নেমে এক বড় ভেড়ার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো, পুরস্কারটা বেশী করে পাবে বলে। কিন্তু ওর নখগুলো ভেড়ার লোমে এমন ভাবে আটকে গেল যে, সে ছাড়া পাবার জন্য খুব জোরে ডানা ঝটপট করতে লাগল। মেষপালক সবই দেখছিল। দাঁড়কাকের দশা দেখে, কাকটাকে ঝপ করে ধরে ফেললো। তারপর ডানা কেটে সন্ধ্যের সময় ওকে বাড়ীতে নিয়ে গেল।

ছেলে-মেয়েরা হৈ-চৈ করে জানতে চাইলো,—আমাদের জন্য ওটা কি এনেছ বাবা? মেষপালক বললো,—পাখিটাকে জিজ্ঞাসা কর; ও বলবে 'আমি ঈগল।' আর আমার কাছে শুনতে চাইলে বলবো,—ওটা একটা দাঁড়কাক ছাড়া অন্য কিছু নয়।

এক গাধা ও তার মনিব ॥ ১৩৩ ॥

একজন লোক তার গাধাটিকে সোজা রাস্তা ধরে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু গাধাটা রাস্তা ছেড়ে বে-রাস্তায় চলতে সুরু ক'রে এক খাদের ধারে

চলে এল। গাধাটা প্রায় খাদে পড়ে যায় আর কি, সেই সময় লোকটি তার লেজ ধরে টেনে রাখবার চেষ্টা করলো। কিন্তু একগুঁয়ে গাধা সামনের দিকেই এগিয়ে যেতে লাগলো। তখন লোকটি ওর লেজ ছেড়ে দিয়ে বললো,—"বেশ, তুমি যদি মনিব হতে চাও, তা'হলে আমার আর কি করবার আছে।"

[একগুঁয়ে জীব তার পথ ধরে যাবেই]

বৃদ্ধ ও মৃত্যু ॥ ১৩৪ ॥

এক বৃদ্ধ একবোঝা কাঠ মাথায় নিয়ে যেতে যেতে এত ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো যে কাঠের বোঝা মাটিতে ফেলে বললো, হে মৃত্যু, আমাকে এসে নিয়ে যাও ; এ ভাবে কষ্ট পেয়ে আমি আর বেঁচে থাকতে চাই না! ওর ডাক শুনে মৃত্যু এসে হাজির। বললো,—কি চাও তুমি? বুড়ো বললো, মশায়, এই বোঝাটা দয়া করে আমার মাথায় তুলে দিন।

['মৃত্যু কামনা করা' এক জিনিষ, আর 'মরণ এসে গেছে'—জানা আর এক জিনিষ]

শিকারী ও তিতির ॥ ১৩৫ ॥

এক পাখি-শিকারীর জালে একটি তিতির ধরা পড়েছিল। ধরা পড়ে তিতিরটি প্রাণভয়ে চীৎকার করতে করতে বললো, শিকারী মশাই, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি কথা দিচ্ছি, ভুলিয়ে-ভালিয়ে অন্য তিতিরদের আমি আপনার কাছে এনে দেব।

লোকটি বললো, না,—তোমাকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না ; নিজের আত্মীয়-স্বজনদের যে মৃত্যু ঘটাতে চায়, তার পক্ষে মৃত্যুদণ্ড খুব বেশী শাস্তি নয়।

গাধা, শেয়াল ও সিংহ ॥ ১৩৬ ॥

এক গাধা এবং এক শেয়াল, একসঙ্গে শিকার করতে গেল। রাস্তায় ওদের সঙ্গে এক সিংহের দেখা হল। বিপদের সম্ভাবনা আছে বুঝে, শেয়াল সিংহের কানে কানে বললো যে, সিংহ যদি তাকে অভয় দেয়, তা'হলে সে গাধাকে সিংহের কবলে ফেলে দেবে। সিংহ রাজী হল। শেয়াল তখন গাধাকে এক ফাঁদের দিকে নিয়ে গিয়ে ফাঁদে ফেলে দিল। সিংহ যখন দেখলো যে গাধা আর পালাতে পারবে না, তখন সে আগে শেয়ালের উপরই ঝাঁপিয়ে পড়ল। গাধাটাকে রেখে দিল, পরে ভোজে লাগবে বলে।

ফার গাছ ও কাঁটা ঝোপ ॥ ১৩৭ ॥

এক ফার গাছ, কাঁটা গাছের ঝোপকে বেশ অহংকারের সঙ্গেই শুনিয়ে দিল, সে হচ্ছে একটি অপদার্থ। আর, ফারকে বাদ দিয়ে ত' কোন ঘরবাড়ীই তৈরী হ'তে পারে না! কাঁটাগাছ বললো, মশায়, যখন কাঠুরিয়া তার কুড়ুল নিয়ে এখানে আসবে, তুমি কি তখন নিজেকে কাঁটাঝোপ বলবে, না ফার গাছ বলবে?

[বেশী বাড় বেড়ে বিপদ ডেকে আনার চেয়ে, ক্ষুদ্র হ'য়ে নির্ভয়ে থাকা ভালো।]

আঙর ক্ষেতে হরিণ ॥ ১৩৮ ॥

এক হরিণ শিকারীদের তাড়া খেয়ে এক আঙর ঝোপে এসে লুকিয়ে থাকলো। শিকারীরা ওকে খুঁজে না পেয়ে, পাশ কাটিয়ে চলে গেল। হরিণ দেখ্‌লো, শিকারীরা চলে গেছে। তখন সে আঙুর পাতা চিবোতে লাগলো মশমশ করে। সেই শব্দ শুনে একজন শিকারী বুঝতে পারলো যে ওদের শিকার আঙুরঝোপের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। তাই সে সাঁই ক'রে তীর ছুঁড়ে হরিণটাকে মেরে ফেললো। মরবার সময় হরিণ বললো, আমার অকৃতজ্ঞতার শাস্তিই আমি পেলাম। যে আঙুরঝোপ বিপদের সময় আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল, সেই আঙরের পাতা খেয়ে, তার ক্ষতি করছিলাম।

এক কৃপণ ॥ ১৩৯ ॥

এক কৃপণ তার সব সম্পত্তি বিক্রি ক'রে একটি মাত্র সোনার তালে পরিণত ক'রে গর্তের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল। প্রতিদিন একবার ক'রে সেই জায়গাটি ও সোনার তালটি ঠিক আছে কি না, দেখে আসতো। ওকে প্রতিদিন এই অবস্থায় দেখে ওর এক মজুরের সন্দেহ হল। মালিকের অসাক্ষাতে সে একদিন সোনার তালটি চুরি করলো।

কৃপণ যখন তা'র সোনার তালটি দেখতে পেল না, তখন হাহাকার ক'রে চুল ছিঁড়ে কাঁদতে লাগলো। ওর এক প্রতিবেশী কৃপণের হাহাকার শুনে ব্যাপারটা যখন জানতে পারলো, তখন বললো,—দেখ ভাই, হাহাকার করে

কি লাভ? তুমি, একটা পাথর নিয়ে সেই জায়গায় রেখে দাও; আর মনে ভেবে নাও যে, ঐ পাথরটাই তোমার সোনার তাল। কারণ ওটা যখন তুমি কোনদিনই ব্যবহার করবে না, তখন সোনার তালও যা, পাথরও তাই।

[মুদ্রার সার্থকতা সঞ্চয়ে নয়, ব্যবহারে]

এক বৃদ্ধা ও তার দু'জন দাসী ॥ ১৪০ ॥

কৃপণ-স্বভাবের এক বুড়ীর দু'জন দাসী ছিল। মোরগ ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই খুব ভোরে বুড়ী ওদের ঘুম থেকে তুলে দিয়ে কাজে পাঠাত। ওরা অবশ্য এত ভোরে ওঠা কিছুতেই পছন্দ করতো না। ওরা ভাবলো যে, ঐ মোরগটাই যত নষ্টের গোড়া, ওর ডাকেই বুড়ীর ঘুম ভেঙে যায়—মোরগটার গলা টিপে শেষ করে দেওয়া দরকার। করলো-ও তাই। এদিকে বুড়ী আর মোরগের ডাক শুনতে না পেয়ে, পাছে বেশী ঘুমিয়ে পড়ে, তাই সজাগ থাকতে সময় ভুল করতে লাগলো, আর প্রতিদিন মাঝরাতেই দাসীদের জাগিয়ে দিতে লাগলো।

[বেশী চালাকীতে নিজের বিপদই বাড়ে। অতি চালাকের গলায় দড়ি]

সিংহ, ভালুক ও শেয়াল ॥ ১৪১ ॥

এক সিংহ ও এক ভালুক, একটা হরিণের মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছিল এবং সেটি দখল করার জন্য অবিরাম লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। লড়াইটা বেশ জোরেই চলেছিল। শেষ পর্যন্ত দু'জনেই অর্ধমৃত অবস্থায় চোখে ঝাপসা দেখতে দেখতে মাটিতে পড়ে আর্ত চীৎকার করছিল। ওদের শরীরে আর এমন শক্তিও ছিল না যে, ওরা সেই হরিণের মৃতদেহটা পর্যন্ত স্পর্শ করে।

এক শেয়াল ওদের ঐ অবস্থা দেখে, হরিণটাকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। সিংহ আর ভালুক দু'জনেই তখন কাতর চীৎকার করতে করতে বললো: আমাদের মত হতভাগ্য আর কে আছে! নৈলে, আমরা আমাদের সব শক্তি নিঃশেষ করে পরস্পরকে আহত করে এক শয়তানের খাবার জুগিয়ে দিই!

পীড়িত সিংহ ॥ ১৪২ ॥

এক সিংহ যখন বুড়ো হয়ে গেল, তখন আর শিকার ধরতে না পেরে, নিজের গুহাতেই শুয়ে থাকতো। খুব কষ্টে নিঃশ্বাস ফেলতো, আর খুব আস্তে কথা বলতো। ফলে প্রচারিত হয়ে গেল যে, সিংহ গুরুতর পীড়িত।

এই খবর দ্রুতবেগে বনের পশুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। শুনে সবাই খুব দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলো। শুধু তাই নয় ওকে দেখার জন্য একে একে অনেকেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে লাগলো। ফলে, ওদের একা একা পেয়ে সিংহ অনায়াসে এক একটি প্রাণীকে হত্যা করে আর ভুরি ভোজনে দিন দিন মোটা হতে থাকে।

শেয়ালের কেমন যেন সন্দেহ হল, তাই একদিন সিংহের খবর নিতে এসে, বেশ একটু দূরত্ব বজায় রেখেই বললো,—মহারাজ কেমন আছেন? সিংহ বললো—এস, এস আমার প্রিয় বন্ধু, কাছে এস ; তুমি এত দিন পরে এসেছ! কিন্তু অতদূরে কেন ভাই! আমার প্রাণের প্রিয় তুমি, কাছে এসে এই বেচারী সিংহের কানে কানে দুটো মিষ্টি মিষ্টি কথা বল, কারণ আমি আর বেশী দিন বাঁচবো না ভাই।

শেয়াল বললো,—আপনার মঙ্গল হোক্। কিন্তু মহারাজ—আর আমি থাকতে পারছি না। সত্যি বলতে কি, আমি খুব ঘাবড়ে গেছি ; কারণ—গুহার ভেতরে যাবার পায়ের ছাপ দেখছি, কিন্তু ফিরে আসার পায়ের ছাপ একেবারেই দেখছি না।

[প্রবেশ করা সহজ ; বেরিয়ে আসা সহজ নয়। কোথাও ঢুকে পড়ার আগে ভেবে দেখা উচিত]

কৃষক ও সারস ॥ ১৪৩ ॥

কতকগুলো সারস এক চাষীর নোতুন চাষ করা ক্ষেতে বাসা বেঁধেছিল। কৃষক প্রথমদিকে একটি দড়ি ঘুরিয়ে ওদের ভয় দেখাত। কিন্তু সারসগুলো যখন বুঝতে পারলো যে দড়িটা একেবারে খালি, তখন তারা আর উড়ে পালাত না। তখন কৃষক দড়িতে পাথর বেঁধে ঘোরাতে লাগলো এবং পাথরের আঘাতে বেশ কিছু সারস নিহত হল। বাকী যারা ছিল, বললো, চল এবারে বামনদের দেশে উড়ে পালিয়ে যাই, কারণ, লোকটা এখন শুধু ভয় দেখাচ্ছে না ; আমাদের তাড়িয়ে দিতেও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

এক অহংকারী ভ্রমণকারী ॥ ১৪৪ ॥

এক ভ্রমণকারী বিদেশ ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে সব সময় বড়াই করে বেড়াত—কোথায়, কি ভাবে, সে নানা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। সে বললো, রোহড়স্-এ যা' করেছি, তার সাক্ষী এখনও সেখানে আছে; এমন লম্বা লাফ দিয়েছি যে, কোন লোক আমার কাছে আসবারও অবকাশ পায় নি।

একজন শ্রোতা বললো, তা হয়তো হবে! তবে, তা যদি হয়ে থাকে তা হলে ভেবে নাও,—তুমি রোহড়স্-এ-ই আছ, আর দাও দেখি তেম্‌নি লম্বা লাফ!

মেষচর্মাবৃত নেকড়ে ॥ ১৪৫ ॥

এক নেকড়ে একবার ভাবলো যে, সে ছদ্মবেশেই থাকবে! তা হলে, সে অনায়াসে শিকার ধরতে পারবে। এই ভেবে, ভেড়ার চামড়ায় আপাদমস্তক ঢেকে এক ভেড়ার পালেই সে ঢুকে পড়লো এবং ভেড়াদের সাথে চরে বেড়াতে লাগলো। মেষপালক পর্যন্ত ওর ভাবভংগী দেখে সন্দেহ করতে পারলো না। রাত্রে, মেষপালক যখন তার সব ভেড়াকে খোঁয়াড়ে পুরে, অর্গল বন্ধ করলো, তখন নেকড়েও ভেতরে থেকে গেল। পরে, রাতের খাবারের জন্য একটা ভেড়াকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য খোঁয়াড়ে এসে, মেষপালক সব চেয়ে আগে নেকড়েকেই ধরলো এবং ভেড়া মনে করে নেকড়েকেই কেটে ফেললো।

নেকড়ে এবং ঘোড়া ॥ ১৪৬ ॥

এক নেকড়ে, এক খামার বাড়ীতে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে ওট্ ক্ষেতে ঢুকে পড়লো, কিন্তু ওট্ ছাড়া অন্য কিছু খাবার না পেয়ে, ওখান থেকে চলে গেল। একটু দূরে এক ঘোড়ার সঙ্গে ওর সাক্ষাৎ হল।

নেকড়ে বললো, এস আমার সঙ্গে, আমি অনেক ওটের খোঁজ পেয়েছি, কিন্তু নিজে না খেয়ে সব তোমার জন্য রেখে এসেছি। তুমি মনের আনন্দে চিবিয়ে খাবে আর তোমার চিবোনোর শব্দ আমার কানে গানের সুর হয়ে বেজে উঠবে।

ঘোড়া বললো, বেশ মজার লোক তো তুমি! নেকড়ে যদি ওট খেতে

পারতো, তা হলে, আমার মনে হয় সে কানের মধ্যে গানের সুর না খুঁজে, ওট্ ক্ষেতে পেটের ক্ষুধা মিটিয়ে নিতো আগে।

[নিজের কাছে অপ্রয়োজনীয় বলেই, কোন বস্তুকে যে দান করে তাকে ধন্যবাদ দেবার কিছু নেই]

বালক এবং বাদাম ॥ ১৪৭ ॥

এক বালক, এক কলসীর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কলসীতে রাখা বাদাম আর ডুমুরের এক মুঠো নিয়ে, কলসীর ভেতর থেকে যখন হাত বার করতে যায়, তখন কলসীর সরু গলায় ওব হাত গেল আটকে। কিছুতেই আর বার করতে পারে না। হাতের মুঠোয় যা আছে, সেগুলোকেও ছাড়বার ইচ্ছে নেই, অথচ মুঠো না খুলে, হাত বার করারও উপায় নেই দেখে, বালকটি শেষ পর্যন্ত ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললো। তারপরই বিলাপ। এক ভদ্রলোক, ব্যাপারটা আগাগোড়া লক্ষ্য করছিলেন। তিনি এসে বালকটিকে উপদেশ দিলেন, মুঠোর মধ্যে কম করে ধরো বাছা, হাত বেরিয়ে আসবে।

শেয়াল এবং মুখোশ ॥ ১৪৮ ॥

এক শেয়াল গোপনে এক অভিনেতার বাড়ীতে ঢুকে পড়েছিল। তারপর, অভিনেতার প্রয়োজনীয় নানা জিনিষ দেখতে দেখতে হঠাৎ বেশ ভালো একটি মুখোশ দেখতে পায়। শেয়াল বললো,—বাঃ, একটি সুন্দর মাথা তো! কিন্তু কি আশ্চর্য, মাথার ভেতরে কিছু নেই দেখছি!

[বাইরে দেখতে ভালো হলে কি হবে, ভেতরটা ভালো নয়]

দাঁড়কাক এবং রাজহাঁস ॥ ১৪৯ ॥

রাজহাঁসের সাদা ঝকঝকে পালক দেখে এক দাঁড়কাকের খুব ঈর্ষা হল। কাক ভাবলো, জলে থাকে বলেই রাজহাঁসের পালক এত সুন্দর! ভেবে শেষ পর্যন্ত, যে মন্দিরের ধারে থেকে সে এটা-ওটা খেতে পেত, সেখানে না থেকে হ্রদের মধ্যে থাকতে লাগলো, আর সেখানে ডানা ধুয়ে পালক পরিষ্কার করতে লাগলো। কিন্তু কাকের পালক কিছুতেই আর পরিষ্কার হয় না; আগে যেমন কালো ছিল, তেমনি থেকে গেল।

অবশেষে হ্রদে স্বাভাবিক খাদ্য না পেয়ে দাঁড়কাক অনাহারে মরে গেল।

[জায়গা ছাড়লেই স্বভাব ছাড়ে না]

এঁড়ে বাছুর ও বলদ ॥ ১৫০ ॥

এক এঁড়ে বাছুব দাপাদাপি কবে মাঠময় ঘুরে বেড়াবার সময়, এক 'বলদকে লাঙল টানতে দেখে একটু বিদ্রূপ কবলো, বলদটি কিছু না বলে একমনে কাজ কবতে লাগলো। কিছু দিন পবে, কি এক বিরাট উৎসবেব দিনে, বলদ তার কাজ থেকে ছুটি পেল। কিন্তু সেই এঁড়ে বাছুবকে নিয়ে যাওয়া হল বলি দেবাব জন্য।

বলদ ওকে দেখে বললো—কোন কাজ না কবাব ফল যদি এই হয়, তা' হলে কাজ কবা অনেক ভালো। আমি গলায় জোয়াল চাপাতে বাজী আছি, কেননা, কুড়ুলেব কোপেব চেয়ে তা' অনেক ভালো।

সিংহ ও ষাঁড়ের পাল ॥ ১৫১ ॥

তিনটি ষাঁড়, একসঙ্গে, মনেব আনন্দে এক মাঠে চবে বেড়াত। এক সিংহ অনেকদিন ধবেই ওদেব উপব নজব বেখেছিল, কিন্তু বুঝতে পাবলো যে, যতদিন ওবা একসঙ্গে থাকবে, তত দিন ওদেব নিহত কবাব কোন আশা নেই। তখন সিংহ গোপনে ওদেব নামে এমন কুৎসা বটাতে আবম্ভ কবলো যে, ওবা পবস্পব পবস্পবকে অবিশ্বাস কবতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত সিংহেব চক্রান্তই সফল হল। ওবা আব এক সঙ্গে না চ'বে একে অপবকে এড়িয়ে দূবে দূবে চবতে লাগলো। এবপব সিংহ অনায়াসে তিনটি ষাঁড়কেই একে একে হত্যা করলো।

[বন্ধুরা ঝগড়া কবলে শত্রুব লাভ]

পিপাসার্ত্ত পারাবত ॥ ১৫২ ॥

এক পাটার উপব এক পাত্র জলেব ছবি আঁকা ছিল। এক পায়বা খুব পিপাসার্ত হয়ে ছবির জলকেই আসল ভেবে এত জোরে উড়ে এসে তার উপর আছড়ে পড়লো যে, তাব ডানা গেল ভেঙে আর সে অসহায় ভাবে মাটিতে পড়ে থাকলো। ওকে ঐ অবস্থায় দেখে একজন লোক ওকে ধরে ফেললো।

[খুব তাড়াহুড়ো করা অনেক সময় দুর্গতির কারণ হয়]

ছাগল ও রাখাল ॥ ১৫৩ ॥

এক ছাগল পাল ছেড়ে পালিয়েছিল। রাখাল বহু চেষ্টা করেছিল, ওকে পালে ফিরিয়ে আনবার জন্য। হাঁক ডাক ক'রে, বাঁশী বাজিয়ে—কোনও রূপে ওকে যখন পালে ফিরিয়ে আনা গেল না, তখন সে একটা পাথর তুলে, জোরে ছুঁড়ে মারলো। ফলে পাথরের আঘাতে ছাগলের শিঙ গেল ভেঙে। ছাগলের ঐ অবস্থা দেখে, সে ভয় পেয়ে বললো,—তুমি কিন্তু মনিবের কাছে এ কথা বলে দিও না, ভাই।

ছাগল বললো,—ওরে মূর্খ রাখাল। আমি যদি মুখ ফুটে কোন কথা নাও বলি—তা হলেও মনিব সব কিছু জানতে পারবে, কারণ আমার শিঙই তো সব কথা বলে দেবে।

[কথার চেয়ে ঘটনাই বেশী মুখর]

শিকারী কুকুর ও খরগোশ ॥ ১৫৪ ॥

এক শিকারী কুকুর অনেকক্ষণ ধরে এক খরগোশের পেছনে তাড়া করে শেষ পর্যন্ত তাকে ধরে ফেললো। তারপর, খরগোশটাকে আগে কামড়াল। পরে আবার জিভ দিয়ে চাট্‌তে লাগল। খরগোশ হতভম্ব হয়ে বললো, তুমি যদি বন্ধু হও, তা' হলে কামড়াচ্ছ কেন ? আর যদি শত্রু হও, তা' হলে জিভ দিয়ে চেটে আদর করছো কেন ?—কিছুই বুঝতে পারছি না।

[জানা শত্রুর চেয়ে সন্দেহভাজন বন্ধু অনেক খারাপ। হয় বন্ধু হও, না হয় শত্রু]

আরবদেশের লোক ও উট ॥ ১৫৫ ॥

এক আরব, তার উটের পিঠে মাল বোঝাই ক'রে বললো, এখন তুমি কোন্ দিকে যাওয়া পছন্দ করবে ; পাহাড়ের উপর দিকে না নীচের দিকে ? উট নিরাসক্ত ভাবে বললো,—মালিক ! সমতল ভূমি দিয়ে সোজা যাবার পথ কি বন্ধ ?

মূর্তিবাহী গাধা ॥ ১৫৬ ॥

এক গাধা একবার এক ধর্মীয় উৎসবের শোভাযাত্রায়, একটি দেবী মূর্তিকে বহন করে শহরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। দর্শকরা রাস্তার দু'ধারে

দাঁড়িয়ে, মাথা নুইয়ে তাদের ভক্তিশ্রদ্ধা জানাচ্ছিল। গাধা ভাবলো,—সবাই বুঝি ওকেই পূজো করছে ; তাই সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো, কিছুতেই আর নড়তে চাইলো না। গাধার চালক তখন ওর পিঠে দমাদ্দম লাঠি মারতে লাগলো, আর বলতে লাগলো—মূর্খ, ওরা তোমাকে প্রণাম করছে না, যে দেবতাকে তুমি বহন করছো, প্রণাম করছে সেই দেবতাকেই।

[মূর্খ লোকে ভাবে, তাকেই সম্মান দেখানো হচ্ছে,—যে সম্মান আসলে তার পদমর্যাদাকে]

শেয়াল ও সারস ॥ ১৫৭ ॥

এক শেয়াল একবার এক সারসকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল এবং ঐ সম্মানিত অতিথির সঙ্গে একত্রে বসে খাবার জন্য একটি থালায় মাত্র সামান্য একটু পাতলা ঝোলের ব্যবস্থা করেছিল। যথাসময়ে দু'জনেই ভোজে বসে গেল। শেয়াল, চক্‌চক্ ক'রে জিভ দিয়ে চেটে দিব্যি ঝোল খেতে লাগলো, কিন্তু সারস আগে যেমন ক্ষুধার্ত ছিল, পরেও তেমনি ক্ষুধার্ত থেকে গেল ; কারণ,—সে তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে কিছুতেই সেই পাতলা ঝোল খেতে পারেনি।

সারস কিছুই খাচ্ছে না দেখে, শেয়াল অবশ্য দুঃখ প্রকাশ করে ওকে বললো,—খাবারটা বোধ হয় তেমন ভালো হয়নি, না ? উত্তরে, সারস কিছু বললো না বটে, তবে যাবার আগে শেয়ালকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে অনুরোধ করে গেল,—ওর বাড়ীতে পরের দিন ভোজ খাওয়ার জন্য। পরের দিন যথাসময়ে শেয়াল গিয়ে হাজির হল সারসের আস্তানায়। সঙ্গে সঙ্গে খাবারও এসে গেল। শেয়াল হতভম্ব হয়ে দেখলো, খাবার আছে, একটা গলা-সরু কলসীর মধ্যে। সারস দিব্যি তার লম্বা ঠোঁট আর গলা ঢুকিয়ে খেতে লাগলো, আর শেয়াল নিরুপায় হয়ে কলসীর কানা চাটতে লাগলো।

শেয়ালের ক্ষুধা যেমন ছিল, তেমনি থেকে গেল। ফিরে আসার সময় অবশ্য মনে মনে ভাবলো যে, তার আমন্ত্রণ-কর্তাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই ; শেয়ালের চালাকী দিয়েই সে শেয়ালকে জব্দ করেছে।

সিংহচর্মাবৃত গর্দভ ॥ ১৫৮ ॥

এক গাধা, সিংহের চামড়া পরে, চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো আর বোকা প্রাণীগুলোকে ভয় দেখাতে লাগলো। এক শেয়ালকে দেখে, তর্জন-গর্জন ক'রে তাকেও ভয় দেখাতে লাগলো। কিন্তু বুদ্ধিমান শেয়াল, ওর গলার স্বর শুনেই বুঝতে পেরেছিল। তাই বললো, ওহে গর্দভ! তোমার ডাকের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে, আমিও কিন্তু ভয় পেয়ে যেতাম।

[যার স্বভাবে যা নেই, বেশী অভিনয় ক'রে তা প্রকাশ করতে গেলে ধরা তাকে পড়তেই হবে]

টেকো বীর ॥ ১৫৯ ॥

এক বীর পুরুষের বয়স যেমন বাড়তে লাগলো, তার মাথার চুলও তেমনি পাতলা হ'তে হ'তে ঝরে পড়তে লাগলো। শেষপর্যন্ত থাকলো শুধু মাথাভরা টাক। টাক ঢেকে রাখবার জন্য সে একটা খাটো পরচুলা পরে থাকলো। একবার যখন ঘোড়ায় চড়ে শীকারে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ এক দমকা বাতাস এসে সেই খাটো পরচুলাটিকে উড়িয়ে নিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বীরপুরুষের টাকটিও প্রকাশ পেল। ব্যাপার দেখে ওর সংগীরা না হেসে পারলো না। বীরপুরুষ নিজেও হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। তারপর বললো, নিজের চুলকেই মাথায় রাখতে পারিনি, পরের চুল-ই বা মাথায় থাকবে কেন?

মাংসল শুয়োর ও ভেড়ার পাল ॥ ১৬০ ॥

এক মাংসল সুপুষ্ট শুয়োর, ভেড়াদের আস্তানায় গিয়ে আশ্রয় নিল। একদিন মেষপালক ওকে ধরে ফেললো। শুয়োর তো ছাড়া পাবার জন্য চেঁচিয়ে-মেচিয়ে গায়ের জোরে হুটোপুটি করতে লাগলো। এক ভেড়া ওর চেঁচামেচি শুনে বললো,—শোনো ভাই, আমাদের মালিক, প্রায়ই এসে আমাদের ধরেন, আমরা কেউ কিন্তু কোন শব্দও করিনা।

শুয়োরটি বললো, ঠিকই,—কিন্তু তোমাদের অবস্থা আর আমার অবস্থা এক নয়; কারণ, তোমাদের ধরা হয় লোম কাটবার জন্য; আমাকে কিন্তু ধরা হয়েছে আমার মাংসের লোভে।

ঝোপের বেড়া ও আঙুর ক্ষেত ॥ ১৬১ ॥

এক মূর্খ যুবক, তার বাবার মৃত্যুর পর, ওর আঙুর ক্ষেতের চারদিকের আগাছার বেড়া উপড়ে ফেলে দিল; কেন না তাতে আঙুর ফলে না। ফলে, আঙুর ক্ষেতে মানুষ, পশু—যে পারে,—অনায়াসে ঢুকে পড়তে লাগলো এবং শেষপর্যন্ত পুরো ক্ষেতটা নষ্ট হয়ে গেল। তখন সেই মূর্খের যথেষ্টশিক্ষা হল যে,--আগাছার বেড়া থেকে কোনদিনই আঙুর পাওয়া যায় না, কিন্তু আঙুরের ক্ষেত রক্ষা করতে হলে আগাছার বেড়া না হলেও চলে না।

গাধার ছায়া ॥ ১৬২ ॥

এথেন্স থেকে মেগারা যাবার জন্য একজন লোক, গ্রীষ্মকালে এক গাধা ভাড়া করলো। দুপুর বেলায় রোদের তেজ যখন আগুনের মত হ'য়ে উঠলো, তখন সে গাধার পিঠ থেকে নেমে পড়লো এবং বিশ্রাম করার জন্য গাধার ছায়ায় বসে পড়লো। কিন্তু এ নিয়ে গাধার চালকের সঙ্গে বচসা হয়ে গেল। চালক বললো যে, গাধার ছায়াতে তারও সমান অধিকার। লোকটি বললো, কি?—তোমারও সমান অধিকাব? কিন্তু, গাধাতো আমিই ভাড়া নিয়েছি—আমাকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবার জন্য। চালক বললো,—তা' গাধা ভাড়া নিয়েছ বটে, কিন্তু গাধার ছায়া তো আর ভাড়া নাওনি। এই ভাবে ওরা যখন তর্ক-বিতর্ক করতে ব্যস্ত ছিল, তখন গাধাটা সুযোগ বুঝে এক দৌড়ে পালিয়ে গেল।

ষাঁড় এবং ছাগল ॥ ১৬৩ ॥

সিংহের তাড়া খেয়ে এক ষাঁড় প্রাণভয়ে গুহার মধ্যে ঢুকে পড়লো। সেখানে আগের থেকেই এক বুনো ছাগল আশ্রয় নিয়েছিল। ষাঁড়কে দেখে, সেই বুনো ছাগল, শিঙ দিয়ে ষাঁড়কে গুঁতোতে আরম্ভ করলো।

ষাঁড় বললো, দেখ—তোমার এই গোঁয়ার্তুমি আমি সহ্য করে যাচ্ছি বলে, ভেবো না যে, আমি তোমাকে ভয় করি। একবার শুধু সিংহটা চলে যাক্, তা'হলেই আমি তোমাকে—ষাঁড় আর ছাগলের তফাৎটা—বুঝিয়ে দিতে পারবো।

[প্রতিবেশী বিপদগ্রস্ত হ'লে হীন ব্যক্তিরাও প্রতিবেশীকে বিব্রত করার চেষ্টা করে; কিন্তু সময় এলে, ওরাই অনুতপ্ত হয়]

হাতুড়ে বদ্যি ব্যাঙ ॥ ১৬৪ ॥

এক ব্যাঙ জলাভূমির কাদা-জল থেকে বেরিয়ে, সকলের কাছে ঘোষণা করলো যে, সে পৃথিবীতে এসেছে সকলের রোগ সারাবার জন্য। বললো,. সবাই শোনো,—তোমরা এস, এমন একজন চিকিৎসক তোমাদের সামনে, সমস্ত ওষুধ যার নখদর্পণে; যার নাম কেউ শোনোনি আগে—এমন কি স্বর্গের রাজা জুপিটারের খাস বৈদ্য অ্যাস্‌ক্যুলাপিয়ানও যার নাম শোনেননি।

শেয়াল বললো,—কিন্তু, কি ক'রে সকলের রোগ সারাবে তুমি? নিজের খোঁড়া পায়ের থপ্‌থপিয়ে চলা আর ফোস্কা পড়া কোঁচকানো চামড়া-ই তো সারাতে পারোনি।

[বদ্যি, আগে নিজেকে সারাও]

ঘোড়া এবং গাধা ॥ ১৬৫ ॥

একজন লোকের একটি ঘোড়া ও একটি গাধা ছিল। একবার ঘোড়ার পিঠে কোন বোঝা না চাপিয়ে গাধার পিঠেই সব বোঝা চাপিয়ে, পথ চলছিল। গাধাটা এম্‌নিতে একটু অসুস্থ ছিল, তাই সে ঘোড়াকে অনুরোধ করলো, তার কিছু বোঝা পিঠে নিয়ে ওর ভার একটু কমিয়ে দেবার জন্য। বললো,—তা' হলেই সে সুস্থ হ'য়ে উঠবে। গাধা বলেই চললো,—আমার কিছু ভার যদি না নাও, তা'হলে বোঝার ভারে আমি কিন্তু মরেই যাবো।

ঘোড়া গাধার কথাকে আমলই দিল না। বললো, যেমন যাচ্ছো তেম্‌নি চল, আমাকে বিরক্ত করো না।

গাধা নীরবে পথ হাঁটতে লাগলো। কিন্তু অতি ভারের চাপে মাটিতে পড়ে শেষপর্যন্ত মরেই গেল।

তখন মালিক এসে মরা গাধার পিঠ থেকে সব মালপত্র নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চাপালো। শুধু কি তাই? মরা গাধাকেও দিল ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে। ঘোড়া তখন অনুতাপ করতে করতে বললো, আমার যেমন বদ্‌ স্বভাব—গাধার পিঠ থেকে সামান্য কিছু বোঝা নিজের পিঠে চাপাতে অস্বীকার ক'রে এখন পুরো বোঝাই আমাকে বইতে হল—উপরি বোঝা হিসাবে মরা গাধার দেহটাকেও বইতে হল।

[একগুঁয়ে বদ্‌মেজাজীরা এইভাবেই শাস্তিভোগ করে]

আঙুর লতা ও ছাগল ॥ ১৬৬ ॥

এক আঙুর লতায় প্রচুর আঙুর ধরেছিল। আর কচি কচি পাতায় সারা লতা ভরে গিয়েছিল। এক উদ্‌মো ছাগল এসে আঙুর গাছ আব কচি কচি পাতা মনের আনন্দে খেতে লাগলো। আঙুরলতা বললো, এ অপমানের প্রতিশোধ নেবো। কয়েকদিন পরেই তোমাকে মন্দিরে নিয়ে আসবে বলি দিতে, তখন আঙুরের রস তোমার মাথায় ঢেলে দেওয়া হবে, তোমার মৃত্যুর হিম-কণা।

[দেরীতে হলেও প্রতিশোধ আসবেই]

এক দ্বি-পত্নীক ব্যক্তি ॥ ১৬৭ ॥

অনেককাল আগে, যখন একজন লোক—একটির চেয়ে বেশী বিবাহ করার অনুমতি পেত, তখন এক মাঝবয়সী আইবুড়ো একসঙ্গে দুটি মেয়েব প্রেমে পড়ে গেল এবং একসঙ্গে দু'জনকেই বিয়ে কবলো। তখন তাব চুলে সবেমাত্র পাক ধরেছে। ওর দু'জন স্ত্রীর মধ্যে একজন ছিল, যৌবনবতী তরুণী আর একজনের বয়স তরুণীর চেয়ে একটু বেশী। তরুণীর ইচ্ছে,—স্বামীকে যেন যুবক মনে হয়, আর অপব পত্নীর ইচ্ছে, স্বামীকে যেন একটু বয়স্ক দেখায়, যাতে তাব সঙ্গে মানানসই হয়।

তাই, তরুণী পত্নী সময় পেলেই স্বামীর আধপাকা চুল তুলতে লেগে যেত ; আবার তেমনি বয়স্কা পত্নীও সময় পেলেই স্বামীর কালো চুল তুলে ফেলতো। লোকটি কিছুদিন ধরে ওদের ভালোবাসার অত্যাচার সহ্য ক'রে হঠাৎ একদিন দেখলো, তার মাথায়, কালো কিংবা আধপাকা—কোন চুলই আর অবশিষ্ট নেই।

[অন্যের মতের কাছে যে নতি স্বীকার করে, কোন দিনই তার কোন নিজস্ব মত থাকে না]

লবণবাহী গাধা ॥ ১৬৮ ॥

এক মুদির একটি গাধা ছিল। মুদি একদিন শুনলো যে, সমুদ্র উপকূলের গ্রামে, নুন খুব সস্তা দরে পাওয়া যাচ্ছে, তখন সে গাধা নিয়ে সেখানে চলে গেল নুন কেনার জন্য। তারপর যতপারে, গাধার পিঠে নুন বোঝাই করে বাড়ী ফেরার সময়, যখন একটা শ্যাওলাধরা পেছল পাথরের উপর দিয়ে

আসছিল, তখন পা পিছলে গাধাটা নীচের একটা ছোট্ট নদীতে পড়ে যায়। ফলে, নুন গলে গেল এবং গাধার বোঝাও হাল্‌কা হয়ে গেল। তখন দেহে মনে বেশ আরাম পেয়ে ফুর্তির সঙ্গে পাড়ে উঠে নদীর ধার দিয়ে গাধাটা বাড়ীর পথে হাঁটতে লাগলো।

অল্প কিছুদিন পরে, সেই মুদি আবার সমুদ্র-উপকূলে গেল, নুন কেনার জন্য। এবারে আগের চেয়েও বেশী বেশ কিছু নুন বোঝাই করলো গাধার পিঠে। আসবার পথে, যে ছোট্ট নদীতে গাধা একবার পড়ে গিয়েছিল, সেই নদীতেই গাধা এবার ইচ্ছে করে পড়ে গেল। ফলে, নুন গলে গিয়ে এবারেও তার পিঠের বোঝা হাল্‌কা হয়ে গেল।

মালিক গাধার এই চাতুরী বুঝতে পেরে এবং নিজের ক্ষতির পরিমাণটাও বুঝতে পেরে, পরের বারে, গাধাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য ওর পিঠে 'স্পঞ্জ' বোঝাই করে দিল। যখন তারা আবার সেই নদীর ধার দিয়ে আসছিল তখন গাধা তার পুরানো চালাকী সুরু করে দিল। কিন্তু স্পঞ্জ গুলো ভিজে, ফুলে গিয়ে, ওজনে অনেক বেড়ে গেল। উঠে বাড়ী যাবার সময় গাধা বুঝতে পারলো যে তার বোঝা হালকা তো হয়ই নি, বরং বোঝা বেড়েছে দু'গুণ।

[চালাকী দিয়ে সব কাজ হয় না]

এক শিঙওয়ালা হরিণ ও জলাশয় ॥ ১৬৯ ॥

গ্রীষ্মকালে, এক হরিণ এল, জলাশয়ে জল খেতে। জল খাবার সময় তার দেহের পুরো ছায়া দেখতে পেল জলের মধ্যে। দেখে বললো—বাঃ, আমার শিঙ্‌জোড়া তো ভারী সুন্দর! কিন্তু আমার পাগুলো কি সরু আর দুর্বল! হরিণ এই ভাবে যখন কল্পনাতেই তার প্রকৃতি-দত্ত দেহের নিন্দা করছিল সেই সময় একদল শিকারী তাদের কুকুরের পাল নিয়ে সেইখানে হাজির হল। সঙ্গে সঙ্গে তার পা-ই তাকে শিকারীদের হাত থেকে রক্ষা করল,—কিছুক্ষণ আগেই যে পায়ের সে এত নিন্দা করছিল। কিন্তু যে শিঙের এত প্রশংসা করছিল, সেই শিঙ্‌ গেল ঝোপের লতায় আটকে। শিকারীরা ততক্ষণে সেখানে পৌঁছে গেল এবং হরিণকে হত্যা করল।

[অলঙ্কারের কথা না ভেবে, প্রয়োজনের কথা ভাব।]

জ্যোতিষী ॥ ১৭০ ॥

এক জ্যোতিষী প্রতি রাত্রে, হাঁটতে হাঁটতে আকাশের তারা দেখতো। একদিন গভীরভাবে মন দিয়ে, সহরের বাইরে আকাশের তারা দেখতে দেখতে সে পথ হাঁটছিল; তখন হঠাৎ এক কুয়োতে সে পড়ে যায়। ওর হাঁক-ডাকে আর চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে এক ব্যক্তি সেখানে ছুটে এল। জ্যোতিষীর কাছ থেকে সব ঘটনা শুনে লোকটি বললো,—মশাই, আকাশের রহস্য জানতে গিয়ে, আপনি আপনার পায়ের তলায়, পৃথিবীর সাধারণ জিনিষগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি!

সর্বোচ্চ বিচারালয়ে চাতক পাখি ॥ ১৭১ ॥

এক চাতক পাখি, বিচারালয়ের এক জায়গায় নিজের বাসা তৈরী করেছিল। তার বাচ্চারা উড়ে পালাবার মত অবস্থায় আসবার আগেই, এক সাপ তার গর্ত থেকে বেরিয়ে চাতকের বাসায় উঠে বাচ্চাগুলিকে খেয়ে ফেললো। বেচারী চাতক ফিরে এসে যখন দেখলো যে তার বাসা খালি, তখন সে করুণভাবে বিলাপ করতে লাগলো। একজন প্রতিবেশী ওকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললো, কেঁদে কি হবে,—তুমি তো আর একমাত্র পাখি নও—য'ার বাচ্চা হারিয়েছে!

চাতক বললো, তা অবশ্য ঠিকই। কিন্তু আমি শুধু আমার বাচ্চা হারিয়েছে বলেই যে বিলাপ করছি তা নয়; বিলাপ করছি এই কারণে যে, আমার উপর অবিচার করা হল, সেই জায়গাতেই,—যেখানে বিচার পাবার জন্য সবাই ছুটে আসে।

ব্যাঙের দল ও বালকগণ ॥ ১৭২ ॥

একদল বালক এক পুকুরের ধারে খেলা করছিল। খেলা করতে করতে পুকুরে একদল ব্যাঙ্ দেখতে পেয়ে, ওরা ওদের লক্ষ্য ক'রে ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করলো এবং বেশ কিছু ব্যাঙকে মেরে ফেললো। তখন ওদের মধ্যে বেশ একটু সাহসী ব্যাঙ জলের ভেতর থেকে মাথা তুলে বললো, ওহে তোমাদের নির্মম খেলা থামাও। বুঝে দেখ, তোমাদের কাছে যা 'খেলা— আমাদের কাছে তা মৃত্যু।'

নেকড়ে এবং ছাগল ॥ ১৭৩ ॥

এক ছাগল পাহাড়ের এমন এক জায়গায় ঘাস খাচ্ছিল, যেখানে নেকড়ে কিছুতেই উঠতে পারে না। তাই নীচের থেকে হাঁক দিয়ে নেকড়ে ছাগলকে বললো,—নীচে নেমে এস, হঠাৎ পা পিছলে পড়ে যেতে পার ওখান থেকে, —নীচে এত মিষ্টি মিষ্টি ঘাস রয়েছে, তুমি ওবকম জায়গায় কেন? ছাগল বললো, মাপ কব ভাই, তুমি কি আর আমাকে আমার খাদ্যের জন্য ডাকছো, ডাকছো তোমার খাদ্যের জন্য!

মেষপালক ও সমুদ্র ॥ ১৭৪ ॥

এক মেষপালক তার ভেড়ার পালকে, সমুদ্রের ধারে চরাতে নিয়ে গিয়ে ছিল। সমুদ্রের প্রশান্ত গাম্ভীর্য আর বিশালতা দেখে, ওর খুব ইচ্ছে হল, সাগব পাড়ি দেবার। তাই সে তার সব ভেড়া বিক্রি করলো, এবং এক খেজুব বোঝাই জাহাজ কিনে তাতে কিছু মদের জালা বোঝাই করে সমুদ্র যাত্রায় বেরিয়ে পড়লো। কিছুদূর যেতে না যেতেই বিবাট এক ঝড় উঠলো। তাতে জাহাজ গেল ভেঙে; খেজুর ও অন্যান্য জিনিষপত্র গেল নষ্ট হয়ে। সে নিজে অতি কষ্টে ডাঙায় উঠে এল।

কিছুদিন পরে সমুদ্র যখন আবার শান্ত, তখন এক বন্ধু সমুদ্রের সেই প্রশান্তরূপের প্রশংসা করতে লাগলো। তখন সে বলল—বন্ধু সমুদ্রের উপরটা বেশ শান্ত দেখায় বটে, কিন্তু সাবধান, তোমার খেজুরের জন্যই সে অপেক্ষা করছে।

ছোট এবং বড় মাছ ॥ ১৭৫ ॥

এক জেলে, সমুদ্রে জাল ফেলে যখন জাল তুললো, তখন দেখা গেল, জালে, ছোট বড় সব রকমের মাছ ধরা পড়েছে। ছোট মাছ গুলো জালের ফাঁক দিয়ে গলে, জলের তলায় পালিয়ে গেল। কিন্তু বড় মাছগুলো পালাতে পারলো না; ওদের ধরে জাহাজে নিয়ে আসা হল।

[আমাদের ক্ষুদ্রতাই অনেক সময় আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করে]

বাবা ও তার দুই মেয়ে । ১৭৬ ॥

এক ব্যক্তির দুটি মেয়ে ছিল। একটির বিয়ে হয়েছিল এক মালির সঙ্গে, অপরটির বিয়ে হয়েছিল এক কুমোরের সঙ্গে।

একবার সে মালির বাড়িতে যায়, আর মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে—'কেমন আছ ? মালি তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে ?'

মেয়ে বললো,—খুব ভালো বাবা, আমরা যা চাই—তা' সবই আমাদের আছে। অবশ্য আমাদের একটি কামনাও আছে। সে আর অন্য কিছু নয়, আমাদের গাছের জন্য জোর এক-পশলা বৃষ্টি !

এর পর সেই লোকটি আর এক মেয়ের বাড়ীতে গেল। এবং মেয়েকে সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলো। মেয়ে বললো,—আমাদের কিছুই চাই না ; শুধু এমনি সূর্যের তাপ আর খট্‌খটে আব্‌হাওয়া যদি থাকে তা'হলে আমাদের টালিগুলো অনায়াসে শুকিয়ে নিতে পারবো।

মেয়ের বাবা বললো, হায়রে, তুমি চাও খট্‌খটে আব্‌হাওয়া আর তোমার বোন চায় ঝড়-বৃষ্টি ; তা'হলে আমার নিজের জন্য কি চাইব আমি ?

ছাগলছানা ও নেকড়ে বাঘ ॥ ১৭৭ ॥

একবার এক ছাগলছানা দলছাড়া হয়ে পড়ে ছিল ; সেই সুযোগে এক নেকড়ে বাঘ ওকে অনুসরণ করছিল। ছাগল ছানাটি যখন দেখলো যে পালিয়ে বাঁচার আর কোন আশাই নেই, তখন সে নেকড়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললো,—আমি এখন মেনে নিচ্ছি যে আমি তোমার শিকার। তাই আমার আয়ু যখন আর বেশীক্ষণ নেই, তখন একটু আনন্দ করতে দাও ; তুমি কিছুক্ষণ বাঁশী বাজাও, আমি একটু নাচি। ওর কথা শুনে নেকড়ে বাঁশী বাজাতে লাগলো আর ছাগলছানা নাচতে লাগলো। বাঁশীর শব্দ শুনে কুকুরগুলো ছুটে এল, কি হচ্ছে, দেখার জন্য। তখন কুকুর গুলোকে দেখে, নেকড়ে প্রাণ ভয়ে ছুটে পালিয়ে গেল।

নদী ও সমুদ্র ॥ ১৭৮ ॥

একবার সব নদী এক জোট হয়ে সমুদ্রের কাছে গেল। ওরা সমুদ্রকে বললো—'আমরা তোমাকে মিষ্টি জল দিয়ে থাকি ; তুমি কেন সেই মিষ্টি-

জলকে অপেয় এবং লবণাক্ত করে তোল। সমুদ্র ওদের অহংকার দেখে, শুধু এইমাত্র বললো—'তোমরা যদি লোনা না হতে চাও, তা'হলে আমাকে আর জল দিও না।

[যারা সব চেয়ে বেশী উপকার পায়, তারাই সবচেয়ে বেশী অনুযোগ তোলে]

বন্যশূকর ও শৃগাল ॥ ১৭৯ ॥

এক বন্য শূকর এক গাছের গুঁড়িতে দাঁত শান দিচ্ছিল। তাই দেখে এক শেয়াল বললো,—অমন করছো কেন, এর কারণ তো কিছুই বুঝতে পারছিনা? —কাছাকাছি কোন শিকারীও তো নেই; কোন শিকারী কুকুরও নেই যে এই মুহূর্তে কোন বিপদ আছে বলে মনে করতে পার।'

শূকর বললো, তোমার সব কথাই ঠিক। তবে, যখন বিপদ এসে যাবে, তখন দাঁতে শান দেওয়া ছেড়ে আমাকে অন্য কিছু করতে হবে।

[যুদ্ধের বাজনা শুনে তলোয়ারে শান দিতে বলা অর্থহীন]

এক কৃষক ও সমুদ্র ॥ ১৮০ ॥

এক কৃষক দেখলো, নাবিকদের নিয়ে একটি জাহাজ সমুদ্রের ঢেউতে উঠছে আর পড়ছে। দেখে, কৃষক চীৎকার করে বললো—সমুদ্র, তুমি এতই নির্মম এবং বিশ্বাসহন্তা যে, যারাই তোমার উপর দিয়ে যায়, তাদেরই তুমি বিনষ্ট করে ফেল! সমুদ্র ওর কথা শুনে, নারীকণ্ঠে জবাব দিল,—আমাকে দোষ দিয়ে কি লাভ! এই টলমল অবস্থা, আমি ঘটাচ্ছি না,—ঘটাচ্ছে বাতাস। সে যখন আমার উপর পড়ে তখন আমাকেই বিব্রত করে তোলে। কিন্তু বাতাস চলে যাবার পর তুমি যদি আমার উপর দিয়ে নৌকা বেয়ে যাও, তা'হলে তুমিই বলবে,—সমুদ্র ঢের শান্ত; এমন কি তোমার ধরিত্রী-মাতার চেয়েও বেশী ভরসা রাখা চলে আমার উপর।

কৃষ্ণকায় মুর ॥ ১৮১ ॥

এক ব্যক্তি মুর জাতির এক ভৃত্য ক্রয় করেছিল। মুর জাতির সবাই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু যে ক্রয় করেছিল তার ধারণা হল যে মুরের

গায়ের চামড়া অত কালো হয়েছে, তার আগেকার মালিকের অবহেলার জন্যই। তাই সে তার অন্যান্য ভৃত্যদের বললো—বুরুষ চালিয়ে সাবান মাখিয়ে এবং শিরিষ কাগজ ঘসে ওকে আবার সাদা করে দাও। ভৃত্যবর্গ ওকে কয়েক ঘণ্টা ধরে জলে চুবিয়ে, বুরুষ দিয়ে আচ্ছা করে ওর শরীর মেজে দিল। কিন্তু সবই বৃথা। ওর চামড়া আগেও যেমন কালো ছিল, তেমনি কালো থেকে গেল। লাভের মধ্যে এই হল যে—ঐ সব প্রক্রিয়ার ফলে, ঠাণ্ডা লেগে বেচারী মরেই গেল।

[যা স্বভাবতই খারাপ তাকে ভালো করার চেষ্টাই বৃথা]

গাধা, মোরগ ও সিংহ ॥ ১৮২ ॥

এক গাধা ও এক মোরগ, এক খামারে একত্রে বাস করতো। একবার এক ক্ষুধার্ত সিংহ ঐ পাশ দিয়ে যাবার সময়, সুপুষ্ট গাধাটিকে দেখতে পেয়ে ভাবলো—গাধাটাকে ধরে ভোজে লাগাতে হবে। সেই সময় মোরগটা হঠাৎ কোকোর কোঁ কোঁ করে গলা ফুলিয়ে ডেকে উঠলো ; আর সেই ডাক শুনে, সিংহ সেখানে আর এক মুহূর্ত দেরী না করে সোজা রাস্তা ধরে দ্রুত বেগে চলে যেতে লাগলো। [এক প্রচলিত কথা আছে,—সিংহ নাকি মোরগের ডাক মোটেই সহ্য করতে পারে না, বরং খুবই ঘৃণা করে।]

মোরগের মত একটা পাখির ডাকে সিংহের মত একটা প্রাণী ভয় পায় দেখে গাধা বেশ মজা অনুভব করলো ; তাই কৌতুক করার জন্যই কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে বনের রাজা সিংহকে তাড়া করার জন্য খট্‌খট্‌ করে তার পেছনে পেছনে ছুটতে লাগলো। কিছু দূর যেতেই সিংহ হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে এক নিমেষে গাধার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার জীবনের অবসান ঘটিয়ে দিল।

[অজ্ঞতার মধ্যেই নিরালম্ব চিন্তার জন্ম, এবং তার মধ্যেই ধ্বংসের বীজ]

যুদ্ধের ঘোড়া ও এক গাধা ॥ ১৮৩ ॥

এক যুদ্ধের ঘোড়া, জিনে, রেকাবে সজ্জিত হয়ে বীরদর্পে রাস্তার উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। এক বেচারী গাধা, পিঠে এক ভারী বোঝা নিয়ে,

অতি মন্থর গতিতে সেই রাস্তা ধরে যাচ্ছিল, আর সেই তেজী ঘোড়াকে দেখে মনে মনে ঈর্ষ্যা অনুভব করছিল।

অহংকারে দৃপ্ত, সেই ঘোড়া গাধাকে বললো—রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়া, নৈলে আমার পায়ের তলায় পিষে মারবো। গাধা কিছু না বলে, রাস্তার একপাশে সরে গিয়ে ঘোড়ার পথ করে দিল।

কিছুদিন পরে ঘোড়াকে যুদ্ধে পাঠানো হল। যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুতর রূপে আহত হওয়ায় তাকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরৎ পাঠানো হয়। পরে তাকে যুদ্ধের কাজে অনুপযুক্ত দেখে, কৃষিকার্যের জন্য এক খামারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানেই, একদিন সেই গাধা দেখলো যে, সেই ঘোড়াই একটা বোঝাই গাড়ী টানছে।

গাধা তখন ভাবলো—যে, ঘোড়ার উপর অকারণেই তার ঈর্ষ্যা হয়েছিল। তখন ওর সুদিন ছিল, তাই তেজও ছিল, এখন সে তার বন্ধুদেরও হারিয়েছে—যারা প্রয়োজনের জন্যই ওর পরিচর্যা করেছিল।

ইঁদুর এবং উদ্‌বিড়াল ॥ ১৮৪ ॥

এক হ্যাংলা ইঁদুর কোনরূপে শস্যের মরাইতে ঢুকে পড়েছিল। সেখানে মনের আনন্দে কিছু দিন খেয়ে দেয়ে এমন মোটা হয়ে গেল যে,—যে সরু পথ দিয়ে সে ঢুকেছিল, সেই সরু পথ দিয়ে আর সে বেরুতে পারলো না। তখন সেই পথটির ধারে বসে ভাগ্যের দোষ দিয়ে সে বিলাপ করতে লাগলো। ওর কান্না শুনে, এক উদ্‌বিড়াল সেখানে হাজির হল এবং বললো, বন্ধু, ওইখানেই বসে থাক এবং উপোষ করে আবার রোগা হও। কারণ ওখান থেকে তুমি কিছুতেই বেরুতে পারবে না। যে অবস্থায় ঢুকেছিলে আগে, সেই অবস্থায় ফিরে এস।

ঈগল এবং গুবরে পোকা ॥ ১৮৫ ॥

এক খরগোশ, ঈগলের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এক গুবরে পোকার বাসায় ঢুকে পড়লো এবং তার প্রাণ বাঁচাবার জন্য অনুরোধ করলো। গুবরে পোকা তখন ঈগলকে মিনতি করে বললো,—'হে ঈগল, তুমি এই

দুর্বল আশ্রয়প্রর্থীকে হত্যা করো না।' শুধু তাই নয়, সে দেবরাজ জুপিটারের দিব্যি দিয়ে বললো—ঈগল যেন তার অনুরোধ রক্ষা করে এবং ধর্মনীতি ও আতিথ্যের অমর্যাদা না-ঘটায়। কারণ—সে নিজে ঈগলের কাছে একটি তুচ্ছ প্রাণী ছাড়া আর কি!

ঈগল কিন্তু, রেগে, গুবরে পোকাকে ডানার এক ঝাপটা দিয়ে সোজা খরগোশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে খেয়ে ফেলল। তারপর ঈগল যখন উড়ে গেল বাসায় তখন তার বাসা দেখার জন্য, তার পেছনে পেছনে গুবরে পোকাও উড়ে গেল। একদিন ঈগল যখন বাসাতে ছিল না তখন বাসায় ঢুকে ঈগলের ডিমগুলিকে একে একে ঠেলে মাটিতে ফেলে দিল। ফলে সব ডিমই ভেঙে গেল। ঈগল যখন ফিরে এসে দেখলো যে তার একটি ডিমও অবশিষ্ট নেই, তখন ক্ষোভে, দুঃখে—ঠিক করলো যে সে আরও উঁচুতে বাসা বাঁধবে যাতে ডিম ভাঙার মত ধৃষ্টতা আর কেউ না দেখাতে পারে! কিন্তু গুবরে পোকা সেখানেও পৌঁছে গেল এবং আগের মতই ডিমগুলিকে ফেলে দিয়ে এল। দেখে, ঈগল কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে, তার প্রভু এবং ত্রাতা জুপিটারের কাছে গিয়ে, তার তৃতীয়-প্রসবের ডিমগুলি গচ্ছিত রেখে এল জুপিটারের কোলে। গুবরে পোকা তখন নোংরা কাদার একটা গুলি তৈরী করে, গুলিটা নিয়ে উড়ে গেল এবং ওটাকে ফেলে দিল জুপিটারের কোলে। জুপিটার ডিমের কথা ভুলে গিয়ে, নোংরা গুলিটাকে ঝেড়ে ফেলতে গেলেন, অমনি ডিমগুলোও তাঁর কোল থেকে পড়ে ভেঙে গেল।—তারপর গুবরে পোকার মুখেই শুনলেন যে, ঈগলের উপব প্রতিশোধ নেবার জন্য সে এই কাজ করেছে; কারণ ঈগল শুধু গুবরে পোকার অনুরোধই যে রক্ষা করেনি, তাই নয়, সে জুপিটারকেও অগ্রাহ্য করেছে। জুপিটার ঈগলকে ডেকে বললেন, 'গুবরে পোকা হচ্ছে বাদী এবং তার অভিযোগও যথার্থ।' তবু যাতে ঈগলের বংশ ধ্বংস না হয়, তাই তিনি গুবরে পোকার সঙ্গে ঈগলের একটা মিটমাটের প্রস্তাব করলেন। গুবরে পোকা যখন কিছুতেই এ প্রস্তাবে রাজী হল না তখন জুপিটার এমন এক ঋতুতে ঈগলের ডিম পাড়ার সময় নির্দিষ্ট করে দিলেন, যে সময়টাতে গুবরে পোকা দেখা যায় না।

[আতিথ্যের নিয়ম ভঙ্গ করা অপরাধ। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে, অত্যাচার করে অত্যাচারিতের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে]

চিতা বাঘ ও শেয়াল ॥ ১৮৬ ॥

এক শেয়াল ও এক চিতাবাঘেব মধ্যে বিতর্ক বেধে গেল,—কে দু'জনের মধ্যে ভালো। চিতাবাঘ তাব দেহের অসংখ্য চাকা চাকা দাগের সৌন্দর্যের বড়াই কবলো। কিন্তু শেয়াল বললো,—চিত্রবিচিত্র দেহের চেয়ে বহুবুদ্ধি-সম্পন্ন একটি মন অনেক অনেক ভালো।

নেকড়ে বাঘ ও সিংহ ॥ ১৮৭ ॥

একবার এক নেকড়ে বাঘ, গোয়াল থেকে এক ভেড়াকে ধরে তার নিজের গুহায় নিয়ে যাচ্ছিল। সেই সময় এক সিংহের সঙ্গে তাব দেখা। সিংহ সোজাসুজি নেকড়ের কাছ থেকে ভেড়াটাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। সিংহ যখন কিছু দূবে চলে গেল তখন নেকড়ে চেঁচিয়ে বললো,—এটা খুব লজ্জার কথা যে সিংহের মত প্রাণী, নেকড়েব জিনিষকে ছিনিয়ে নিল। সিংহ হেসে বললো,—তা'হলে এই কথাই বুঝি বলতে চাও যে তোমার মহৎ বন্ধু মেষপালকই ভেড়াটা তোমাকে উপহার দিয়েছে!

বৃদ্ধ সিংহ ॥ ১৮৮ ॥

এক অসহায় সিংহ বার্ধক্যে জরাগ্রস্ত হয়ে, মাটিতে শুয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষা করছিল। এক বন্যশূকর তার পুরোনো ক্রোধ চরিতার্থ করার ইচ্ছায়, সিংহকে দাঁত দিয়ে আঘাত কবার জন্য ছুটে এল। এক ষাঁড়ও তার পুবোনো শত্রুতার প্রতিশোধ নেবার জন্য শিঙ্ বাগিয়ে গর্জন করতে করতে ছুটে গেল। সিংহকে এই ভাবে অপমানিত হতে দেখে, এক গাধা তার তেজ দেখাবার জন্য সিংহের কাছে এসে, তার মুখে জোড়া পায়ের লাথি মেরে দিল।

মুমূর্ষু সিংহ বললো,—যাদের সঙ্গে আমাকে লড়াই করতে হত, সেই শক্তিশালীদের অপমানই যথেষ্ট আঘাত দেয়, কিন্তু তোর মত এত নীচ

একটা প্রাণীর—যাকে প্রকৃতির লজ্জা ছাড়া অন্য কিছুই বলা চলে না, তার অপমান সহ্য করার অর্থ, দু দু-বার মরে যাওয়া।

নেকড়ে ও মেষপালকগণ। ১৮৯।

এক নেকড়ে দেখলো,—একটা কুঁড়ে ঘরে বসে কয়েকজন মেষপালক, একটা ঝলসানো, ভেড়ার মাংস কেটে কেটে, আনন্দের সঙ্গে খাচ্ছে। দেখে নেকড়ে বললো—আমাকে ভাগ দিতে হলে ওরা নিশ্চয়ই ঝগড়াঝাঁটি করতো।

[নিজের মত করে দেখা]

সমুদ্রতীরের পথিক ॥ ১৯০ ॥

একদল লোক সমুদ্রের ধার দিয়ে যাচ্ছিল। যেতে যেতে, ওরা এক পাথুরে উঁচু জায়গাতে এসে দেখলো, কিছুদূরে সমুদ্রের জলে একবোঝা কাঠ ভাসছে। দেখে, ওরা প্রথমে ভেবেছিল, ওটা নিশ্চয়ই একটা বড জাহাজ। ওরা অপেক্ষা করতে লাগলো, যদি ওটা কূলে এসে নোঙর ফেলে। কাঠের বোঝাটা যত তীরের দিকে ভেসে এল, ওরা তত ভাবতে লাগলো যে ওটা জাহাজ নয়, একটা নৌকা মাত্র। কিন্তু কূলে এসে যখন ওটা আছড়ে পড়লো, তখন ওরা দেখলো যে ওটা একটা কাঠের বোঝা মাত্র।

[দূর থেকেই বিপদকে ঘোরতর বিপদ মনে হয়, আর—যা আসছে তাকে যে যার খুশী মত ভাবতে আরম্ভ করে]

কুকুরের পাল ও চামড়া ॥ ১৯১ ॥

একপাল ক্ষুধার্ত কুকুর এক ছোট্ট নদীতে জলের মধ্যে কয়েকটা কাঁচা চামড়া দেখতে পেল। এক মুচি সেই চামড়াগুলো সেখানে ডুবিয়ে রেখে-ছিল। কুকুরগুলো স্বচ্ছ জলে চামড়া দেখতে পেল বটে। কিন্তু কিছুতেই চামড়ার কাছে যেতে পারলো না। তাই ওরা যুক্তি করলো, নদীর জলটা আগে খেয়ে নেবে। যুক্তি করে নদীর জল খেতে আরম্ভ করলো ওরা, কিন্তু জল খেয়ে শেষ করে চামড়ার কাছে পৌঁছুবার আগেই ওদের পেট ফেটে গেল।

[যুক্তিগ্রাহ্য পথে না গিয়ে যারা কাজ সুরু করে তাদের মৃত্যুই হয়]

পিঁপড়ে এবং কপোত ॥ ১৯২ ॥

এক পিঁপড়ে ঝর্ণাতে জল খেতে গিয়ে বেশী ঝুঁকে পড়েছিল ; ফলে সে ঝর্ণার জলে পড়ে ডুবে মরতে বসেছিল। একটা কপোত পাশের এক গাছ থেকে সব লক্ষ্য করছিল। পিঁপড়ের বিপদ দেখতে পেয়ে, গাছের একটা পাতা ঠোঁটে তুলে নিয়ে পিঁপড়ের সামনে ফেলে দিল। পিঁপড়েটি সেই পাতার উপর চড়ে ডাঙায় উঠে আসতে সক্ষম হল। সেই সময় এক ব্যাধ এসে কপোতটিকে ধরবার জন্য জাল পাতবার উপক্রম করছিল; পিঁপড়ে কপোতের বিপদের সম্ভাবনা বুঝতে পেরে, সেই ব্যাধের পায়ের গোড়ালিতে এমন জোরে কামড় দিল যে, জালটা তার হাত থেকে খসে পড়লো।—আর বিপদের সম্ভাবনা বুঝতে পেরে কপোতও উড়ে অন্য জায়গায় চলে গেল।

[উপকারের পরিণাম প্রতি-উপকার]

কাক ও শেয়াল ॥ ১৯৩ ॥

এক কাক, কোন এক বাড়ীর জানালা থেকে একটুকরো খাবার সংগ্রহ করে মনের সুখে খাবার জন্য এক উঁচু গাছের ডালে গিয়ে বসলো। এক শেয়াল সব কিছু লক্ষ্য করছিল ; কাকের ঐ খাবারটুকু বাগিয়ে নেবার লোভে, মনে মনে এক ফন্দি এঁটে—গাছের তলায় গিয়ে কাককে বললো—'ওগো কাকপক্ষী, কি সুন্দর—তোমার ডানাদুটি, বাঃ বাঃ কি উজ্জ্বল তোমার চোখ দুটি ; আর তোমার গ্রীবাটি তো অতুলনীয় ; বুক যেন ঈগলের বুক। তোমার কাক-নখ,—না-না মাপ করো,—তোমার ঈগল-নখ তো যে-কোন বন্য প্রাণীর নখের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে ; কিন্তু আশ্চর্য! এমন পাখিও বোবা! হায়, কাক যদি কথা বলতে পারতো!'

এই ধরণের চাটুবাক্যে মুগ্ধ হয়ে, কাক, শেয়ালকে তার কা-কা-ধ্বনি শুনিয়ে বিস্মিত করে দেবার জন্য যেই না মুখ খুলেছে, অমনি তার মুখ থেকে খাবারটি খসে পড়লো। শেয়াল সংগে সংগে খাবারটা খেয়ে নিল আর যাবার সময় বলে গেল, তোমার সৌন্দর্য সম্পর্কে কত কথাই না বলেছি, তোমার বুদ্ধি সম্পর্কে কিন্তু কিছুই বলি-নি।

[কোন কিছুর আশা না করে কেউ চাটু-বাক্য বলে না. যারা চাটু-বাক্যে বিগলিত হয়, তাদের প্রবঞ্চিত হবার সম্ভাবনাই বেশী]

কর্মকার ও তার কুকুর ॥ ১৯৪ ॥

এক কর্মকারের একটি ছোট্ট কুকুর ছিল। কর্মকার যখন কোন ধাতুর উপর, তার হাতুড়ির আঘাত করতো, তখন হাতুড়ির শব্দকে অগ্রাহ্য করেই কুকুরটি ঘুমোত। কিন্তু কর্মকার যখনই খেতে বসতো, তখনই কুকুরটি জেগে উঠতো। দেখে দেখে, কর্মকার একদিন একটা হাড়ের টুকরো ওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ওকে গালাগালি করলো ;—বললো— 'হতচ্ছাড়া পাজি, হাতুড়ির শব্দ হলেও দিব্যি ঘুমোতে পার, কিন্তু দাঁত দিয়ে আমার খাবার চিবোনোর সামান্য শব্দেই তোমার ঘুম ভাঙে কি করে!'

[স্বার্থের ব্যাপারে মানুষের জ্ঞান টনটনে, কিন্তু বন্ধুর দুঃখ দুর্দশার দিকে ফিরে তাকাবারও সময় তার নেই।]

কৃষক ও সিংহ ॥ ১৯৫ ॥

এক সিংহ একবার এক খামার বাড়ীতে ঢুকে পড়েছিল। কৃষক দেখতে পেয়ে সিংহকে ধরবার জন্য খামার বাড়ীর দরজাটি বন্ধ করে দিয়েছিল। সিংহ যখন দেখলো যে তার আর বেরিয়ে যাবার পথ নেই, তখন সে সঙ্গে সঙ্গে ভেড়ার পালকে আক্রমণ করে, গোয়ালে গেল গোরু ধরতে, কৃষক তখন ভয় পেয়ে খামারের দরজাটা খুলে দিল। সিংহ সেই মুহূর্তে দৌড়ে, পালিয়ে গেল। ওর স্ত্রী সব কিছুই লক্ষ্য করছিল। যখন দেখলো যে গোরু-ভেড়া হারিয়ে তার স্বামী খুবই মুষড়ে পড়েছে, তখন সে বললো —ঠিক হয়েছে ; তোমার যেমন বুদ্ধি, তেমনি ফল-ই পেয়েছ। নৈলে, যাকে দূরে দেখলেই প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যাও, সেই প্রাণীকে ধরে রাখবার সাধ হয় তোমার?

[চোরকে ধরতে গিয়ে বিপদে পড়ার চেয়ে ছেড়ে দেওয়াই ভালো]

তিন বণিক ॥ ১৯৬ ॥

এক নগর, শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হতে পারে ভেবে,—নগরের অধিবাসীরা এক সভায় মিলিত হয়ে, কি ভাবে নগরকে রক্ষা করা যায়,—আলোচনা করতে বসলো।

ইটের ব্যবসায়ী বললো, প্রতিরক্ষার জন্য ইটের চেয়ে ভালো কিছু—হতে পারে না। কাঠব্যবসায়ী বললো,—ইটের চেয়ে কাঠই হবে বেশী উপযোগী। চামড়ার ব্যবসায়ী বললো,—ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের যা' বলবার তা' সবাই বলেছেন, কিন্তু কে না জানে, প্রতিরক্ষার জন্য পৃথিবীর সব চেয়ে সেরা জিনিষ হচ্ছে চামড়া।

স্নানরত বালক ॥ ১৯৭ ॥

এক বালক নদীতে স্নান করতে গিয়ে ডুবে যাচ্ছিল। সেই সময় নদীর ধার দিয়ে একজন লোককে যেতে দেখে, বালকটি চীৎকার করে ডাকলো, তাকে উদ্ধার করার জন্য। লোকটি তখন বালকটিকে নানা ভাবে ভর্ৎসনা করে তার অপরিণামদর্শিতার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলো। বালকটি তখন চেঁচিয়ে কেঁদে কেঁদে বললো,—দোহাই মশায়, আগে আমার প্রাণ বাঁচান, তারপর বক্তৃতা দেবেন।

ভেনাস[৩২] এবং বিড়াল ॥ ১৯৮ ॥

এক বিড়াল একবার এক যুবকের প্রেমে পড়ে যায়। কিন্তু যুবক তো আর বিড়ালের প্রেমে পড়তে পারে না! তাই বিড়াল ভেনাসের কাছে প্রার্থনা করেছিল, তাকে যেন এক রমণীতে রূপান্তরিত করা হয়। দেবী ভেনাস বিড়ালের প্রার্থনা গ্রাহ্য করে ওকে এক সুন্দরী তরুণী করে দেন। তখন সেই যুবকও তার রূপমুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করে এবং বাড়ীতে নিয়ে যায়।

একবার তারা যখন নিজেদের ঘরে বসেছিল, তখন ভেনাসের কৌতুহল হল,—দেখি, চেহারা বদল হলেও স্বভাবের বদল হয়েছে কিনা! তাই, ভেনাস একটা ইঁদুর ছেড়ে দিলেন ওদের সামনে। তরুণী তখন তার বর্তমান অবস্থার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে খাট থেকে হঠাৎ ইঁদুরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাতের মুঠোয় ধরে,—এই খায় আর কি!

বিড়ালীর মানুষ হওয়ার ইচ্ছাটা কৃত্রিম বুঝতে পেরে, ভেনাস তক্ষুণি তাকে আবার পূর্ববৎ বিড়ালে পরিণত করে দিলেন।

[স্বভাব যায় না মলে]

৩২ গ্রীকপুরাণের এক দেবী।

মার্কারি[৩৩] এবং ভাস্কর ॥ ১৯৯ ॥

পৃথিবীর মানুষ তাঁকে কেমন সম্মান দেয়, তা' জানবার জন্য মার্কারির ইচ্ছে হল। তাই, পরিব্রাজকের ছদ্মবেশে ঘুরতে ঘুরতে তিনি এক ভাস্করের দোকানে এসে বিভিন্ন মূর্তির মূল্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে থাকেন। জুপিটারের একটি মূর্তি দেখিয়ে মার্কারি ওটির দাম জানতে চাইলেন।

ভাস্কর বললো ঃ এক দ্রাখ্‌মা[৩৪]।

মার্কারি তাঁর জামার হাতার আড়ালে একটু হেসে নিলেন। তারপর বললেন, জুনোর এই মূর্তিটার দাম কত ?

ভাস্কর একটু বেশী দাম চাইলো।

এবাবের মার্কারির দৃষ্টি পড়লো, তাঁর নিজের মূর্তির উপর। মার্কারি ভাবলেন, ভাস্কর বোধ হয় এটির জন্য দশগুণ বেশী দাম চাইবে; কারণ — মার্কারি হচ্ছে দেবদূত।

মার্কারি বললেন,—ঐ মার্কারি দেবের দাম কত হে ?

ভাস্কর বললো,—আপনি যদি জুপিটার আর জুনোর মূর্তি কেনেন, তাহলে ওটা আপনাকে ফাউ হিসাবেই ছুঁড়ে দেব।

[যারা নিজেব মূল্য জানবার জন্য বড় বেশী উদ্‌গ্রীব—তারা প্রায়ই কোন মূল্য পায় না]

কৃষক ও তার কুকুরের দল ॥ ২০০ ॥

প্রচণ্ড শীত আর প্রবল তুষারপাত ; এই অবস্থায় একজন কৃষক তার খামার বাড়ী থেকে বেরুতেই পারলো না। ফলে, তার খাওয়া-দাওয়া বন্ধ ; খাবার কেনার জন্য বাইরে যেতে না পাবলে আর উপায় কি ! তাই তার ভেড়ার পাল থেকে এক একটা ভেড়া কেটে তাকে দিনের পর দিন ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হল। এদিকে শীত আর কমে না, ফলে ভেড়া শেষ করে এক একটা ছাগল কেটে খেতে হল! তবুও যখন আবহাওয়ার কোন

৩৩ গ্রীকপুরাণের দেবতা।

৩৪ প্রাচীন গ্রীক মুদ্রাবিশেষ। ভারতীয় দাম (মূল্য) শব্দটি—এই দ্রাখমা শব্দেরই পরিবর্তিত রূপ।

পরিবর্তনই ঘটলো না, তখন তাকে, লাঙলটানার জন্য যে বলদ-জোড়া ছিল, তা ও খেতে হল। এই সব দেখে, তার কুকুরগুলো নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো:—চল এই সময় কেটে পড়ি; কারণ আমাদের মনিব যখন কাজের বলদগুলোকেও রেহাই দিলে না, তখন আমাদেরও যে ছেড়ে দেবে, তা' মনে হয় না।

[প্রতিবেশীর বাড়ীতে আগুন ধরলে, নিজের বাড়ী সম্পর্কে সাবধান]

শিকারী এবং কাঠুরিয়া ॥ ২০১ ॥

এক শিকারী বনে গিয়েছিল, সিংহ শিকার করতে। সেখানে এক কাঠুরিয়ার সঙ্গে তার দেখা হল। শিকারী কাঠুরিয়াকে জিজ্ঞাসা করলো, ওহে—কোন সিংহের পায়ের ছাপ দেখেছ নাকি? সিংহ কোথায় থাকে, বলতে পার?

কাঠুরিয়া বললো, হ্যাঁ দেখেছি বৈকি! আমার সঙ্গে চল, স্বয়ং সিংহের কাছেই পৌঁছে দেব।

শুনেই, শিকারীর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল; দাঁত-ঠক্‌ঠক্ করতে লাগলো; সারা শরীরে কম্পন। বললো,—ধন্যবাদ,—আমি সিংহের পায়ের ছাপ শিকার করছিলাম, সিংহ-শিকার নয়।

[কাপুরুষের আস্ফালন দূর থেকেই]

বানর এবং জেলে ॥ ২০২ ॥

কয়েকজন জেলে নদীতে জাল পাতছিল। এক বানর এক উঁচু গাছের ডাল থেকে ওদের কাজকর্ম লক্ষ্য করছিল। জেলেরা জাল পেতে,—একটু বিশ্রাম করার জন্য এবং কিছু খেয়ে নেবার জন্য একটু দূরে যেতেই, বানর গাছ থেকে নেমে জেলেদের মত কাজ করতে গেল, কিন্তু জালের মধ্যে এমন ভাবে আটকে পড়লো যে,—জলে হাবুডুবু খেতে খেতে দম বন্ধ হয়ে মরতে বসলো। তাই প্রাণের ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতে বাধ্য হল সে এই বলে—যে বানর-মাছ ধরার কি জানে, তার জালে হাত দেবারই বা কি প্রয়োজন ছিল, অতএব তার এই শাস্তিই যথার্থ।

ময়দাওয়ালা, তার ছেলে ও গাধা ।। ২০৩ ।।

এক ময়দাওয়ালা ও তার ছেলে, তাদের গাধাটিকে হাটে নিয়ে যাচ্ছিল, বিক্রি করার জন্য। কিছুদূরে একদল তরুণীব সঙ্গে দেখা ; হাসিঠাট্টা গল্প গুজব করতে করতে ওবা শহর থেকে ফিরছিল। পিতাপুত্রকে দেখে ওরা বললে,—আরে দ্যাখ্ দ্যাখ্, কেমন বোকা,—গাধার পিঠে না চড়ে, পায়ে হেঁটে চলেছে!

বুড়ো ময়দাওয়ালা এই কথা শুনে, ছেলেকে গাধার পিঠে চড়িয়ে ওর পাশে পাশে হেঁটে চললো। যেতে যেতে একদল বুড়োব সঙ্গে দেখা, ওরা তখন বেশ ভারিক্কি সব তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত ছিল। "ঐ দেখ" ওদের মধ্যে একজন বললো—"আমি যা—বলছিলুম, তার প্রমাণ দেখ ; বুড়োদের কী সম্মান দেওয়া হয় আজকাল,—তা দেখ। ছোঁড়াটা চলছে গাধার পিঠে চড়ে, বুড়ো বাপকে নিয়ে যাচ্ছে পায়ে হাঁটিয়ে! ওহে শয়তান, গাধাব পিঠে তুমি না চড়ে বুড়ো বাপকে চড়াও, বুড়োব পা দুটো একটু বিশ্রাম করুক।'

এই কথা শুনে, বুড়ো ছেলেকে নামিয়ে নিজেই গাধার পিঠে চড়ে বসলো। এই ভাবে কিছুদূর যেতে না যেতেই আবার একদল মেয়ের সঙ্গে দেখা। ওদের কোলে কাঁখে অনেক শিশুও ছিল।

ওরা চেঁচিয়ে বললো —নিষ্কর্মা বুড়ো, তুমি তো দিব্যি গাধার পিঠে চড়ে যাচ্ছ, এদিকে যে বেচারী ছেলেটা হাঁটতেই পারছে না।

সরল প্রাণ ময়দাওয়ালা তখন ওর ছেলেটাকেও ওর পেছনে চড়িয়ে নিল। এইভাবে ওরা যখন প্রায় শহরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, তখন একজন শহুরে লোক ওদের দেখে বললো,—ওগো ভালোমানুষের পো, গাধাটি তোমার নিজের? বুড়ো বিনীতভাবে বললো,—আজ্ঞে হাঁ।

শহুরে লোকটি বললো,—কিন্তু দেখলে কেউ ভাববে না যে, গাধাটি তোমার নিজের ; কেন না বেচারার গাধার পিঠে যা বোঝা চাপিয়েছ, ওর সাধ্য কি তা' বহন করে! একেবারে দু-দু জন লোক চড়ে বসেছ। তোমাদেরই তো উচিত ওকে বয়ে নিয়ে যাওয়া!

বুড়ো বললো, বেশ তাতে যদি খুশী হন, তাই করছি।

এই কথা বলেই, গাধার পিঠ থেকে নেমে, গাধার চার পা বেঁধে, একটা বাঁশে ঝুলিয়ে পিতাপুত্রে সেই ঝুলন্ত গাধাকে কাঁধে নিয়ে চললো। শহরের মধ্যে ঢোকার পথে একটা সাঁকোর উপর দিয়ে ওরা যখন যাচ্ছিল, তখন এই মজার দৃশ্য দেখে একদল লোক হেসে অস্থির ; ওরা হৈ হল্লা করে, হাততালি দিয়ে, বেশ মজা উপভোগ করছিল। গাধাটারও ঐ ঝুলন্ত অবস্থা মোটেই ভালো লাগছিল না, হৈ হল্লাও সহ্য করতে পারছিল না। তাই, সে পা ছুঁড়ে অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগলো। ফলে, পায়ের বাঁধন গেল ছিঁড়ে, আর গাধাটা ছিটকে গিয়ে পড়লো নদীর জলে।

হতভম্ব বুড়ো লজ্জায় মাথা নীচু করে বাড়ী ফিরে গেল। বুঝতে পারলো সবাইকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে, লাভের মধ্যে সে তার গাধাটি হারাল।

মোরগ ও শেয়াল ॥ ২০৪ ॥

এক শেয়াল এক মোরগের কাছে এসে বললো,—জানি না,—সত্যি তুমি তোমার বাবার মতো ভালো গান গাইতে পার কিনা ;—কি গানই না গাইতে পারতো তোমার বাবা!

মোরগ তখন চোখ বন্ধ করে জোর গলায় ডাক ছাড়তে সুরু করলো, আর সঙ্গে সঙ্গে শেয়াল ওকে খপ্ করে ধরে নিয়ে পালাতে লাগলো।

গ্রামের লোকরা তাই দেখে, চেঁচামেচি করতে লাগলো—গেল গেল, আমাদের মোরগটাকে ধরে নিয়ে গেল।

মোরগ তখন শেয়ালকে বললো,—শুনছো, কি বলছে ওরা : বলছে,—আমি নাকি ওদের।—বলে দাও,—আমি আর ওদের মোরগ নই, আমি তোমার।

শেয়াল বললো,—আচ্ছা।

মুখ খুলতেই, মোরগ উড়ে গিয়ে বসলো গাছের ডালে। তারপর শেয়ালকে বললো,—তুমি মিথ্যাবাদী, আমি ওদেরই ; তোমার নই।

শেয়াল তখন মাটিতে মুখ রগড়াতে লাগলো। শেয়াল বললো,—'মুখ, তুই বড্ড বেশী কথা বলিস্। যদি একটু চুপ করে থাকতিস্, তা'হলে ওই পাখিটা তোর ভোজেই লাগতো।'

মাছি ও টাকমাথা ॥ ২০৫ ॥

এক মাছি, এক টাকওয়ালা লোকের মাথায় হুল ফোটাচ্ছিল। লোকটি মাছি তাড়াতে গিয়ে, বারবার নিজের মাথাতেই চড় মারছিল। তখন মাছিটি হেসে বললো,—তুমি তো আচ্ছা লোক বাপু, সামান্য একটু হুল ফুটিয়েছি, বলে, তুমি একটি ছোট্ট আর নিরীহ মাছিকে একেবারে মেরে ফেলতে চাও! তা'হলে, সেরকম লোকের সঙ্গে আমি-ই বা কেমন ব্যবহার করবো, যে আমাকে আঘাতও করতে চায়, অপমানও করতে চায়!

লোকটি বললো,—আমি নিজেকে এর জন্য দোষ দিই না। কারণ আমি জানি, আমার মাথাকে আঘাত করার ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু তুমি? তুমি একটি নীচ আর শয়তান,—মানুষের রক্ত পান করেই তোমার আনন্দ। তোমাকে আমি আনন্দের সঙ্গেই হত্যা করতে পারি, এমন কি আরো বেশী কিছু করতে চাই।

[অনিচ্ছাকৃত অপরাধ মার্জনীয়, কিন্তু মনের মধ্যে শয়তানি পুষে যে অপরাধ করে, কোন শাস্তিই তার পক্ষে গুরুতর নয়।]

সারস, কাক ও কৃষক ॥ ২০৬ ॥

এক সারস প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল যে, কাককে সে অন্যান্য পাখিদের হাত থেকে রক্ষা করবে, আর কাকও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল যে, সে সারসকে ভবিষ্যৎ বাণী শুনিয়ে সাবধান করে দেবে। সারস এবং কাক—দু'জনেই এক কৃষকের ফসল খেত একসঙ্গে।

একদিন কৃষক তার ছেলেকে বললো,—দাও তো একটা পাথর, ওই সারসটার দিকে ছুঁড়ে মারি। কাক এই কথা শুনেই সারসকে সাবধান করে দিল। বেশ কয়েকবারই এইভাবে কাক তাকে সাবধান করে দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৃষকের সন্দেহ হল, কাকই সারসকে সাবধান করে দেয়। তাই সে তার ছেলেকে চুপিচুপি বলে রাখলো যে, এর পর আমি পিঠে চাইব,—পিঠে না দিয়ে তুমি ঢিল-ই দেবে।

ফল হল এই যে, সারসের দুটি পা-ই ভেঙে গেল। সারস বললো,—কি হল ভবিষ্যদ্বক্তা কাক, আমাকে সাবধান করে দিলে না কেন?

কাক বললো,—আমার বুদ্ধিকে দোষ দিও না ভাই; কি করবো বল—দোষ হচ্ছে মানুষের। মিথ্যাবাদী মানুষ নিজের মুখে বলে এক, কাজে করে আর।

ময়ূর ও ম্যাগপাই পাখি ॥ ২০৭ ॥

একবার সব পাখি, তাদের বিশৃঙ্খল অবস্থায় সন্তুষ্ট না হতে পেরে একজন রাজা নির্বাচন করতে মনস্থ করল। এই পদের একজন প্রার্থী ছিল ময়ূর। সে তার সুন্দর পুচ্ছের আড়ম্বর দেখিয়ে নিজের দাবী জানালে—সবাই তাকেই নির্বাচিত করল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটি ম্যাগপাখি হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললো,—মহারাজ, আমরা জানতে চাই—ঈগল পাখি যদি প্রায়ই আমাদের রাজ্য আক্রমণ করে, তা'হলে ঈগলের হাত থেকে কি ভাবে আমাদের রক্ষা করবেন?

গাধা, ষাঁড় এবং পাখি ॥ ২০৮ ॥

এক গাধা ও এক ষাঁড় একসঙ্গে একটা বোঝাই গাড়ি টানছিল। টানতে টানতে ষাঁড়ের একটা শিঙ ভেঙে গেল। গাধা বললো,—তুমি তো আচ্ছা দুর্বল দেখছি; আমাকেই সব বোঝা টানতে হবে নাকি? ষাঁড় তখন আরও জোরে গাড়ি টানতে গিয়ে আর একটা শিঙও ভেঙে ফেললো। ষাঁড় কিছুক্ষণ পরেই মাটিতে পড়ে মরে গেল। তখন, গাড়োয়ান মরা ষাঁড়ের শরীরটা গাধার পিঠেই চাপিয়ে দিল এবং বোঝাসুদ্ধ গাড়ি আরো জোরে টানবার জন্য তাড়া দিতে লাগলো। ফলে, কিছুদূর যেতে না যেতেই গাধাও রাস্তার উপর পড়ে মারা গেলো।

কতকগুলো পাখি গাধার মাংস খেতে এসে বললো,—তুমি যদি ষাঁড়ের প্রতি একটু করুণা দেখাতে, তা'হলে তোমারও এ অবস্থা হত না।

এক বৃদ্ধা ও ভুত ॥ ২০৯ ॥

কোন বিপদে-আপদে পড়লে, প্রায় সবাই বলে থাকে যে, এ হচ্ছে শয়তানের কারসাজি। একবার এক ভুত দেখতে পেল, এক বৃদ্ধা আপেল গাছে উঠেছে। তা দেখে, ভুত কয়েকজন লোককে বললো,—আপনারা দেখবেন, ঐ বৃদ্ধা গাছ থেকে পড়ে হাত-পা ভাঙবে এবং দোষ দেবে আমাকে। তাই আমি সবাইকে সাক্ষী মানছি,—আপনারা দেখুন এতে আমার কোন কারসাজি আছে কিনা।

কিছুক্ষণ পরে বুড়ী নিজেই গাছ থেকে পড়ে হাত-পা ভাঙলো। আর চেঁচাতে লাগলো— শয়তানের কারসাজি, শয়তানের কারসাজি।

কিন্তু ভুত সবাইকে সহজভাবেই বুঝিয়ে দিল যে, ওতে ওর কোন হাত ছিল না।

[নিজের দোষের জন্য পরকে দোষী করার আগে, ভেবে দেখবে, কেউ না কেউ একদিন সত্যি কথাটি ফাঁস করে দেবে।]

বক, রাজহাঁস ও বাজপাখি ॥ ২১০ ॥

এক বক একবার এক বড় দিঘিতে যায়; গিয়ে দেখে এক রাজহাঁস ঘন ঘন জলে ডুবছে আর উঠছে। বক বললো,—অমন করছো কেন? রাজহাঁস বললো, আমাদের নিয়মই এই; এইভাবেই আমরা ডুবে ডুবে পাঁকের মধ্যে খাবার খুঁজি। তা'ছাড়া, মাথার ওপরে যে শিকারী বাজ উড়ে বেড়ায়, তার হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়।

বক বললো, ওঃ তাই নাকি!—আমি তো বাজের চেয়ে ঢের বেশী শক্তিশালী; অতএব তুমি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব কর, তা'হলেই তুমি বাজকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারবে।

রাজহাঁস ওর কথায় বিশ্বাস ক'রে বকের সঙ্গে সঙ্গেই থাকতে লাগলো। অবশেষে বাজ এসে রাজহাঁসকে তার নির্মম নখে ধরে ফেলে, খেয়ে ফেললো। বক কিন্তু উড়ে পালালো।

মৃত্যুর পূর্বে রাজহাঁস এই কথা বলে গেল—'এক শক্তিহীন রক্ষককে বিশ্বাস করেই আমার এই অবস্থা হল।'

চাতক এবং দাঁড়কাক ॥ ২১১ ॥

এক চাতক তেরেউস-এর পুরোনো কাহিনী শুনিয়ে এক দাঁড়কাককে বললো—'আমি হচ্ছি এথেন্সের মেয়ে,—শুধু মেয়েই বা বলি কেন,—এক রাজকন্যা—এথেন্সের রাজার মেয়ে।' এই বলে সে তেরেউসের অপরাধের কাহিনী এবং কি ভাবে তার নিজের জিভ কাটা গেল, সে সব গল্প আগাগোড়া বলে গেল।

ওর কথা শুনে কাক বললো,—জিভ নেই বলেই এত কথা বলতে পারলে, জিভ থাকলে কত দুঃসাহসিকতার গল্পই না শোনাতে!

[যারা বক্‌বক্ করে, তাদের মিথ্যা ভাষণ তাদের মুখ থেকেই ধরা পড়ে ।]

ডাঁশ ও ষাঁড় ॥ ২১২ ॥

এক ডাঁশ একবার এক ষাঁড়কে শক্তিপরীক্ষায় আহ্বান করেছিল। যুদ্ধ দেখতে বিরাট জনতার ভীড় হয়েছিল। ডাঁশ বললো,—আমার পক্ষে এই-ই যথেষ্ট যে, তুমি আমার আহ্বান শুনে যুদ্ধ করতে এসেছ, এতেই বোঝা যাচ্ছে যে—আমার শক্তিকে তুমি অগ্রাহ্য কর না এবং আমার সম্পর্কে তোমার বেশ উচ্চ ধারণাই আছে। অবশ্য, আমি যদিও নিজের সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা পোষণ করি না।

এই বলেই সে সকলকে হতাশ করে এবং ষাঁড়ের ক্রোধ থেকে রক্ষা পেয়ে, উড়ে চলে গেল।

ষাঁড় যদি তার বিরাট শক্তির কথা মনে রাখতো এবং ডাঁশের মতো তুচ্ছ একটা প্রাণীকে অবজ্ঞা করতো, তা'হলে ডাঁশ কখনই বৃথা অহঙ্কার করতো না।

[আমরা যদি আমাদের চেয়ে নিম্নস্তরের লোকদের সমপর্যায়ে নামিয়ে আনি, তা'হলে আমরা আমাদের গুরুত্ব হারাবো।]

তিতির ও শেয়াল ॥ ২১৩ ॥

এক তিতির এক গাছে বসেছিল। ওকে দেখে এক শেয়াল ওর কাছে এসে বললো—ওগো সুন্দর পক্ষী,—আহা, তোমার ঠোঁট প্রবালের চেয়ে

লাল,—দুটি পাশ উজ্জ্বল হলুদে ; সত্যি, তুমি যখন ঘুমিয়ে থাকবে, তখন তোমার রূপের তুলনাই হবে না।

এই কথা শুনে তিতির তার চোখ দুটি বন্ধ করলো। কিন্তু চোখ খুলতে না খুলতেই দেখতে পেল, সে শেয়ালের মুখে ধরা পড়েছে। তিতিরও কম ধূর্ত ছিল না। সে শেয়ালকে বললো,—আমাকে খেয়ে ফেল, দুঃখ নেই ; কিন্তু তার আগে একটিবার মাত্র তোমার মুখে আমার নামটি শুনতে চাই।

শেয়াল মুখ খুলতেই তিতির উড়ে পালিয়ে গেল।

শেয়াল বললো,—হায় হায়, কেন আমি মুখ খুলতে গেলুম।

তিতির বললো,—হায় হায়, কেন আমি চোখ বন্ধ করেছিলুম।

[সব কাজেরই সময় আছে।]

ঈগল, কচ্ছপ ও কাক ॥ ২১৪ ॥

এক কচ্ছপ তার খোলের মধ্যে ঢুকে ভাবলো, কেউ ওর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এক ঈগলপাখি ওকে ছোঁ মেরে আকাশে তুলে নিল। আকাশে ঈগলের সঙ্গে এক কাকের দেখা হল। কাক বললো,—বাঃ খুব লোভনীয় খাদ্য তুমি নিয়ে যাচ্ছ ; কিন্তু কি করে কচ্ছপ খেতে হয় জান তো ? শুধু একটা ভার বহন করে উড়ে ফেরাই সার হবে।

ঈগল বললো,—কি করে খেতে হয় বলে দাও ; তা'হলে তুমিও তার ভাগ পাবে।

কাক বললো,—তুমি আরও উঁচুতে ওঠ, তারপর কচ্ছপটাকে আকাশ থেকে কোন বড় পাথরের উপর ফেলে দাও। তা'হলেই ওর খোলা ভেঙে যাবে এবং তুমিও ওর মাংস খেতে পারবে অনায়াসে।

কাকের উপদেশ অনুসারে ঈগল সব কিছু করলো এবং কাককেও কচ্ছপের মাংসের ভাগ দিল।

[শক্তিশালীর কাছে কেউই নিশ্চিন্ত নয়।]

মাছি এবং চাকা ॥ ২১৫ ॥

'ওঃ, কি ধুলোই না আমি ওড়াতে পারি'। ঘোড়ার গাড়িতে বসে এক মাছি ভাবলো।

সেই মাছিই ঘোড়ার পিঠে চড়ে বললো,—ওঃ, কেমন টগ্‌বগিয়ে চলতে পারি আমি!

কুকুর এবং কুমীর ॥ ২১৬ ॥

প্রচলিত ধারণা, নীল নদীতে জল খেতে গিয়ে কুকুর কোনদিন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জল খায় না—দৌড়তে দৌড়তেই জল খায়, পাছে ওকে কুমীরে ধরে।

এই রকম এক কুকুরকে এক কুমীর বলেছিল,—ভয় পেও না ভাই, তোমার যেভাবে খুশি সেইভাবে আরাম করে জল খাও।

কুকুর বললো,—তাই করতাম। কিন্তু, আমি কি আর জানি না যে, তুমি আমার মাংসের জন্য হাঁ করে বসে আছ!

[যারা কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে মন্দ উপদেশ দেয়, তারা নিজের সব তো নষ্ট করেই, হাস্যাস্পদও হয়।]

কুকুর, গুপ্তধন ও শকুনি ॥ ২১৭ ॥

এক কুকুর মানুষের হাড় টেনে টেনে বার করার সময় কিছু গুপ্তধন দেখতে পেল। এর ফলে কুকুরের এই অপরাধের জন্য পাতালের দেবতারা ক্রুদ্ধ হয়ে, কুকুরের মনে গুপ্তধনের প্রতি এমন লোভ জন্মিয়ে দিল যে, কুকুর ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে গিয়ে শুধু গুপ্তধনের কথাই ভাবতে লাগলো এবং ভাবতে ভাবতে সে মরে গেল।

এক শকুনি, কুকুরের মৃতদেহের উপর বসে বললো,—কুকুর মৃত্যুই তোমার যোগ্য শাস্তি। রাস্তায় তোমাদের জন্ম, গোবর গাদায় তোমরা বেড়ে ওঠ, অথচ তুমি রাজার সম্পদে আকৃষ্ট হয়েছিলে।

গাধা এবং সাইবেলের পুরোহিতগণ ॥ ২১৮ ॥

সাইবেলের পুরোহিতগণ একটি গাধা নিয়ে ভিক্ষায় বেরুতো ; তারপর যা পেত, সব গাধার পিঠে চাপিয়ে ফিরে আসতো। গাধাটা শেষ পর্যন্ত খাটতে খাটতে মারা গেল।

পরে যখন তারা গাধা ছাড়াই ভিক্ষা করতে গেল, তখন লোকে জিজ্ঞাসা করলো;—'পোষা গাধাটি গেল কোথায় ?'

ওরা বললো,—'গাধাটা ভেবেছিল যে, মরে গেলেই সে শান্তি পাবে, কিন্তু তা হয়নি, এই দেখ মরবার পরও তার চামড়ায় বারবার আঘাত পড়ছে।'—বলেই, গাধার চামড়াতে ছাওয়া বাদ্যযন্ত্র বাজাতে লাগল।

বন্ধুর প্রতি সক্রেটিস ॥ ২১৯ ॥

সক্রেটিস একবার ওঁর নিজের জন্য ছোট্ট একটি ঘর তৈরি করছিলেন। তা' দেখে, কয়েকজন পরিচিত নাগরিক বললো,—'কি আশ্চর্য! আপনার মতো বিরাট ব্যক্তি, এমন ছোট একটা ঘর তৈরি করছেন!'

তিনি বললেন, 'এই ঘরটাই যদি যথার্থ বন্ধু দিয়ে ভরে দিতে পারতুম!'

[অনেকেই বন্ধু বলে, কিন্তু বিশ্বস্ত হয় খুবই কম।]

একজন লোক ও উদ্‌বিড়াল ॥ ২২০ ॥

এক উদ্‌বিড়াল, এক ব্যক্তির হাতে ধরা পড়ে, প্রাণ বাঁচাবার জন্য বললো—'অনুগ্রহ করে আমাকে প্রাণে মারবেন না। কারণ, আমিই আপনার ঘরের আশপাশ বিষাক্ত কীট-পতঙ্গের হাত থেকে রক্ষা করি।

লোকটি বললো, —তা' যদি আমার জন্যই করে থাক, তা'হলে নিশ্চয়ই তোমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত এবং তোমার প্রার্থনা শুনে তোমাকে মুক্তি দেওয়াও উচিত। কিন্তু যেহেতু তুমি ইঁদুর ও বিড়ালের ভক্ষ্যগুলিকে শুধু মজা পাবার জন্যই মেরে ফেল, তখন তুমি যে আমাকে সেবা করার জন্য তা' কর না, সেটা নিশ্চিত। এই বলে, লোকটি উদ্‌বিড়ালটিকে মেরে ফেললো।

[এই কাহিনীটি তাদেরই মনে রাখা দরকার, যারা স্বার্থ ছাড়া কোন কাজ করে না, এবং যারা আসলে যে গুণ তাদের নেই, তাই নিয়ে অহঙ্কার করে।]

স্প্যানিয়েল* ও শূকরী ॥ ২২১ ॥

এক শূকরী, এক স্প্যানিয়েলকে বললো,—কি আশ্চর্য, যে লোকটি এত মারধোর করে তোমাকে, সেই লোকটিকেই তুমি দেখি বেশ আদর কর!

স্প্যানিয়েল বললো,—দেখ, তুমি যদি আমার মারের সঙ্গে আমার সুখাদ্য আর সুবাক্যের ওজন কর, তা'হলে দেখবে আমিই লাভবান হয়েছি।

মাছ ও মাছ-ভাজা চাটু ॥ ২২২ ॥

এক রাঁধুনী, কতকগুলো জ্যান্ত মাছকে একটি চাটুতে রেখে, ভাজতে আরম্ভ করলো। মাছগুলো যখনই উত্তাপ অনুভব করলো, তখন তাদের মধ্যে একটি মাছ চেঁচিয়ে বললো,—ও:, এ আর সহ্য করা যায় না। তখন সবাই লাফ দিয়ে উনুনে পড়লো। ফলে, আগের চেয়ে ওদের অবস্থা আরও খারাপ হল।

ব্যাঙ ও ষাঁড় ॥ ২২৩ ॥

এক ব্যাঙ জলাভূমির ধারে বসে দুটো ষাঁড়ের মধ্যে ভীষণ লড়াই বেধেছে দেখে, অন্যান্য ব্যাঙদের চেঁচিয়ে বললো,—খুব বিপদ আমাদের!

আর একটি ব্যাঙ বললো,—'কেন, বিপদ আবার কিসের? ওরা তো অনেক দূরে থাকে, আর ওদের যুদ্ধ হচ্ছে পালের কর্তা হবার জন্য; আমাদের সঙ্গে ওদের কি সম্পর্ক!'

ব্যাঙ বললো,—তা' জানি—ওরা আমাদের থেকে পুরোপুরি আলাদা এবং আমাদের প্রতিবেশীও নয়; কিন্তু যে হারবে, সে বিতাড়িত হয়ে এই নির্জন জলাভূমির দিকেই আসবে আর ওর ধারালো ক্ষুরের চাপে আমরা পিষে মরবো। তাই বলছিলুম, ওদের উন্মত্ততার অর্থই হচ্ছে, আমাদের বিপদ!

[রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলে উলুখাগড়ার বিপদ। শক্তিশালীদের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে দুর্বলদের বিপদই সবচেয়ে বেশী।]

* এক জাতের কুকুর।

সিংহ, দস্যু এবং পথিক ॥ ২২৪ ॥

এক সিংহ, এক ষাঁড়ের মৃতদেহ আগলে বসেছিল। সেই সময় একজন দস্যু এসে সিংহের কাছে ভাগ চাইল। সিংহ বললো,—হয়তো তোমাকেও ভাগ দিতাম, কিন্তু তুমি অপরের ধনসম্পদ কেড়ে নাও, তাই তোমাকে ভাগ দেব না। এই বলে সিংহ দস্যুকে তাড়িয়ে দিল। সেই সময় একজন পথিক ঐ পথ ধরে যাচ্ছিল—কিন্তু সিংহকে দেখতে পেয়ে পশ্চাদপসরণ করতে থাকলো। সিংহ বললো,—তোমার ভয় পাবার কিচ্ছু নেই, তুমি নির্ভয়ে চলে এস। তোমার বিনীত ব্যবহারের পুরস্কার হিসেবে তুমি এর অংশ পাবে।

এই বলে সিংহ, ষাঁড়ের মাংস দুভাগ করে এক ভাগ রেখে, নিজের ভাগ নিয়ে বনে চলে গেল, যাতে সেই পথিক নির্ভয়ে তার ভাগ নেবার জন্য আসতে পারে।

[লোভীকে প্রশ্রয় দিও না ; কিন্তু নির্লোভ, বিনীত লোককে না চাইলেও দিও।]

ঈশপের খেলা ॥ ২২৫ ॥

কতকগুলো বাচ্চা ছেলের সঙ্গে ঈশপকে মার্বেল খেলতে দেখে এথেন্সের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে পড়লো এবং ঈশপকে পাগল ভেবে বিদ্রূপ করতে লাগলো। কিন্তু বুড়ো ঈশপ মূর্খ ছিলেন না এবং সাধারণতঃ তিনি 'শেষের হাসি'টাই হাসতেন। ঈশপ লোকটিকে বললেন, –'মশাই, আসুন এদিকে, আপনি তো বিজ্ঞ ব্যক্তি—এই বস্তুটা কিসের প্রতীক বুঝিয়ে বলুন তো!'—এই বলে রাস্তার উপর তিনি একটা ছিলাহীন ধনুক পুঁতে দিলেন।

এথেন্সের লোকটি অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করলো, কিন্তু কিছুই বুঝতে না পেরে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল।

তখন বিজয়ী দার্শনিক বললেন,—যদি একটা ধনুককে বাঁকিয়ে রাখতে পারেন, তা'হলে যে-কোন সময় ওটাকে ভেঙে ফেলতে পারবেন। কিন্তু যেই ছিলা খুলে দেবেন, অমনি ওটাকে কাজের সময় কাজে লাগাতে পারবেন। মনও কিছুটা স্ফূর্তি চায়, আনন্দ চায় এবং গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য তার প্রয়োজনীয়তা আছে।

[বোকায় তিনবার হাসে। প্রথমে, না বুঝে অন্য সকলের হাসি দেখে, দ্বিতীয় বারে কিছুটা বুঝে, তৃতীয় বারে বোঝার আনন্দে।]

চোর এবং প্রদীপ ॥ ২২৬ ॥

এক চোর জিউস-এর মন্দিরে চুরি করতে এসে, বেদীর প্রদীপ থেকে নিজের লণ্ঠন ধরিয়ে ঘর আলোকিত করে দেবতার জিনিসপত্র চুরি করলো, অর্থাৎ দেবতার আলোতেই দেবতার জিনিস অপহরণ করলো। চোর যখন চলে যাচ্ছিল, তখন বেদী থেকে হঠাৎ এক কণ্ঠস্বর সে শুনতে পেল—'তুমি যা নিয়ে যাচ্ছ, সেগুলো পাপী লোকেরাই আমাকে উপহার দিয়েছিল ; আমি ওদের ভালোও বাসি না। অতএব, ওদের দেওয়া জিনিসের উপরও আমার কোন প্রীতি নেই। কিন্তু তুমি তোমার শয়তানির শাস্তি যথা-সময়ে পাবে।

এর পর থেকে বেদীতে আর প্রদীপ জ্বলবে না। কারণ, আগুন হচ্ছে দেবতাদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের প্রতীক ; আজ থেকে নিষিদ্ধ করে দিচ্ছি, বেদীতে আর কেউ প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবে না এবং এই কারণেই, এখনও বেদীতে কোন বাতি জ্বালিয়ে রাখা হয় না অথবা কোন দেব-উৎসর্গিত বাতি থেকে আর একটি বাতিও ধরানো হয় না।

জাহাজের চালক ও অন্যান্য নাবিকগণ ॥ ২২৭ ॥

ঈশপ শুনতে পেলেন, একজন লোক তার মন্দ ভাগ্যের জন্য অনুযোগ করছে। তা শুনে তিনি এই কাহিনীটি বলেছিলেন,—

একবার এক জাহাজ প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়েছিল। নাবিকরা সবাই মরণ আসন্ন ভেবে হাহাকার করতে লাগলো। হঠাৎ আকাশ পরিষ্কার হতে দেখে ওরা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

জাহাজের চালকের এ ধরনের অভিজ্ঞতা ছিল। তাই সে নাবিকদের বললো,—'কোন লোকের খুশিতে ডগমগ হওয়াও উচিত নয়, আর সঙ্গে সঙ্গে অভিযোগ করাও উচিত নয় ; কারণ, জীবন হচ্ছে সুখ-দুঃখের মিশ্রণ।

একজন লোক ও গাধা ॥ ২২৮ ॥

.বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করে, মানত রক্ষার জন্য এক ব্যক্তি হেরাক্লসের মন্দিরে একটি শুয়োর বলি দিয়েছিল। বেদীর উপর বলির

মাংসে যে সব যবের শিস্ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, লোকটি সেই শিস্-গুলোকে পরে তার গাধাকে খেতে দেবার জন্য আদেশ দিয়েছিল।

কিন্তু গাধা বললো,—ও আমি খেতে পারবো না। ওই জন্তুটির গলা না কেটে তার মাংসের ওপর যবের শিস্ ছড়িয়ে দিলে, আমি নিশ্চয়ই খেতাম।

সাইমনিদেসের জাহাজডুবি ॥ ২২৯ ॥

সিওসের বিখ্যাত কবি সাইমনিদেস অর্থ উপার্জনের জন্য একবার এশিয়ার বিভিন্ন নগরে পরিভ্রমণ করতে করতে, বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ্‌দের সম্পর্কে কবিতা রচনা করছিলেন এবং ঐভাবে অর্থ উপার্জনও করছিলেন। কিছুদিন পরে বেশ কিছু সম্পদ সঞ্চয় করে সমুদ্রপথে দেশে ফিরে আসার জন্য যে জাহাজে উঠলেন, সে জাহাজটি ছিল পুরোনো এবং জীর্ণ।

সমুদ্রপথে জাহাজটি এক ভয়ঙ্কর ঝড়ের মুখে পড়ে। জাহাজটি যখন ডুবতে বসেছে, তখন যাত্রীরা তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ এবং অন্যান্য মূল্যবান বস্তুগুলো একত্র করে পুঁটলি বাঁধছিল।

একজন সহযাত্রী সাইমনিদেসকে বললো—'তুমি কিছু সঙ্গে নেবে না?'

সাইমনিদেস বললেন—'আমার সঙ্গেই তো সব-কিছু আছে।'

সাঁতার কেটে তীরে যাবার সময় অধিকাংশ যাত্রীই তাদের পোঁটলা-পুঁটলির ভারে জলের তলায় তলিয়ে গেল। যারা তীরে উঠলো, তাদের সব-কিছু কেড়ে নিল দস্যুদল।

অদূরে পুরোনো শহর ক্লাজোমেনায়ে। যাত্রীরা সেই দিকেই যেতে লাগলো। সেই শহরে এক কবি বাস করতেন, তিনি আবার সাইমনি-দেসের খুব ভক্ত। কবিকে তিনি চাক্ষুষ কোনদিন দেখেননি বটে, কিন্তু তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচয় তাঁর ঘনিষ্ঠ।

ঐ সব দুর্দশাগ্রস্ত যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি সাইমনিদেসের সঙ্গেও কথা বলেন। ওর কথায় আকৃষ্ট হয়ে তিনি বুঝতে পারলেন, সাইমনিদেস ছাড়া এরকম কথা আর কেউ বলতে পারেন না।

কবিকে তিনি স্বগৃহে আমন্ত্রণ জানালেন এবং পোষাক-পরিচ্ছদ, অর্থ-ভৃত্যাদি দিয়ে তাঁর পরিচর্যা করলেন।

অন্য যাত্রীরা তখন জাহাজডুবির ঘটনা বলে, দরজায় দরজায় ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। সাইমনিদেস ওদের দেখে বললেন,—"আমি তো আগেই বলেছিলুম, আমার সব কিছুই আমার সঙ্গে আছে। আর, তোমরা যা-কিছু বাঁচাতে চেয়েছিলে, সে সবই হারিয়েছ।"

[বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে। বিদ্বানের সম্পদ বিদ্বান্ নিজেই]

পিঁপড়ে ও মাছি ॥ ২৩০ ॥

দারুন তর্ক। পিঁপড়ে এবং মাছির মধ্যে কে বড়—এই নিয়ে। বেশ তীব্র বাদ-বিসংবাদ।

মাছি বললো,—আমার সঙ্গে তোমার তুলনা! পূজাবেদীর চারদিকে আমার অবাধ গতি, দেব-দেউলের মধ্যে আমার বাসা! দেবতার কাছে যখন বলি দেওয়া হয়, তখন আমিই তো তার স্বাদ আগে পাই! রাজার মাথায় আমি বসি! সেবিকাদের সুন্দর ঠোঁটের উপরও বসতে পারি!—আর দেখতেই তো পাও কোন কাজ না করেও কেমন রাজার হালে থাকি! আর তুমি? কি জবাব দেবে অপদার্থ তুমি?

পিঁপড়ে বললো,—একথা অবশ্য ঠিক,—দেবতার সঙ্গে ভোজে বসতে পেলে কে আর গর্বিত হয় না, বল! হ্যাঁ,—তবে আমন্ত্রণ পেলেই সত্যিকারের গর্ব। না-ডাকলেও যে ভোজ খেতে যায়, তার আবার কিসের দেমাক?

আর যেন কি বললে? পুজোর বেদীতে বসতে পাও? তা হবে—! তবে, সঙ্গে সঙ্গেই তো তোমাকে তাড়ানো হয়, নয় কি?

আর কি বললে?—রাজার মাথা আর সেবিকাদের ঠোঁটের কথা!—তুমি অবশ্য ভব্যতা-ভদ্রতার কথা জানবেই বা কি করে।

আর কি? কাজ না করেও রাজার হালে থাক? তাই বুঝি সব সময় চাই-চাই খাই-খাই ভাব।

শীতের সময় আমি যখন শস্যের দানা সঞ্চয় করতে ব্যস্ত, তখন দেখি, শহরের আস্তাকুঁড়ে ময়লা ঘেঁটে বেড়াচ্ছো তুমি। শীতকালে যখন তুমি প্রায় মরতে বস, তখন কিন্তু আমি আমার সঞ্চয় নিয়ে সুখে বাস করি।

গ্রীষ্মকালে তোমার ভন্‌ভনানিতে সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠে, কিন্তু শীত-কালে তোমার মুখ বন্ধ কেন? তোমার দর্প চূর্ণ করার জন্য আর কিছু বলার দরকার আছে কি?

ডিমেট্রিয়াস ও মেনান্‌ডার ॥ ২৩১ ॥

ফ্যালেরাম-এর ডিমেট্রিয়াস এথেন্সের রাজ্যপাট জোর করে অধিকার করে নিলেন। তাঁর বিবাহ-তিথিতে এক উচ্ছৃঙ্খল ও অভব্য জনতা রাস্তায় ঠেলাঠেলি করতে করতে এবং 'ভগবান রাজাকে রক্ষা করুন' বলতে বলতে ছুটোছুটি করতে লাগলো। বিশিষ্ট নাগরিকগণ ছুটে এসে মৃদুকণ্ঠে বিলাপ এবং ভাগ্যের উপর দোষারোপ করতে করতে -যে হাতের দ্বারা তাঁরা নির্যাতিত, ডিমেট্রিয়াসের সেই হাতে চুম্বন করলো। এমন কি যারা জন-সাধারণের ব্যাপারে নির্বিকার, যারা নিজেদের সম্পত্তি নিয়েই ব্যস্ত, তারাও অবশেষে ডিমেট্রিয়াসের কাছে সংগোপনে হাজির হল,—পাছে তাদের না-আসাটা ডিমেট্রিয়াসের বিরাগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এদের মধ্যে বিখ্যাত কবি মেনান্‌ডার-ও ছিলেন। ডিমেট্রিয়াস মেনান্‌ডারের প্রতিভাকে প্রশংসা করতেন, কিন্তু এর আগে কবির সঙ্গে ওঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেনি।

মেনান্‌ডার অতি ধীর পদক্ষেপে হেঁটে গেলেন; শরীরে প্রসাধনের তীব্র সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ঢিলে পোষাক।

অত্যাচারী ডিমেট্রিয়াসের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো —সারির শেষের দিকে —যেখানে মেনান্‌ডার দাঁড়িয়েছিলেন। বললো,—কে ঐ মেয়েলী লোকটা —ঐ চেহারায় আমার সামনে আসতে সাহসী হয়েছে?

একজন পার্শ্বচর বললো,—উনি হচ্ছেন কবি মেনান্‌ডার।

এক মুহূর্তে ডিমেট্রিয়াসের চেহারা বদলে গেল। বললো—আশ্চর্য, কি অপূর্ব চেহারা! প্রশংসায় পঞ্চমুখ ডিমেট্রিয়াস।

দু'জন টাকমাথা লোক ॥ ২৩২ ॥

এক টেকো লোক পথের পাশে একটি চিরুণী কুড়িয়ে পেয়েছিল। এদিক থেকে আর একজন লোক এসে বললো,—সমান সমান ভাগ করে দাও যা-ই পেয়ে থাক না কেন।

এই লোকটির মাথাতেও চুলের চিহ্ন ছিল না।

প্রথম লোকটি চিরুণীটি দেখিয়ে বললো,—বন্ধু, ভগবান আমাদের মঙ্গল করেছেন কিন্তু ভাগ্য আমাদের প্রসন্ন নয়। কেননা, সেই যে প্রচলিত প্রবাদ আছে—গুপ্তধনের বদলে একঝুড়ি কয়লা পাওয়া!

জিউস এবং বানর ॥ ২৩৩ ॥

জিউসের একবার ইচ্ছে হল, তিনি নিজের চোখে দেখে বিচার করবেন কোন্ প্রাণীর বাচ্চা দেখতে ভালো। তাই তিনি একদিন যত পশুপাখি আছে সবাইকে এক সভায় আমন্ত্রণ জানালেন। বললেন, বাচ্চাসহ এসো সবাই।

সেই পশুপাখির ভীড়ে কে সবচেয়ে সুন্দর?

এক বানরী ও তার দুটি বাচ্চা।

মোম এবং ইট ॥ ২৩৪ ॥

একটা প্রশ্ন উঠেছিল, মোম এত নরম কেন এবং ইট-ই বা এত শক্ত কেন? মোম খোঁজখবর নিয়ে আবিষ্কার করলো যে, ইটের কঠিনতা ও স্থায়িত্ব—দুই-ই নির্ভর করে আগুনের উপর তখন মোম আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং ফলে সম্পূর্ণরূপে গলে গেল।

[একই বস্তু কাউকে শক্ত করে, কাউকে নরম]

ঈগল এবং পেঁচা ॥ ২৩৫ ॥

পাখির রাজা ঈগল ঠিক করলো —ওর প্রজাদের ব্যক্তিত্ব, চেহারা এবং কাজকর্ম দেখে, সেরা প্রজাকে সে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করবে।

ঈগল তখন সব পাখিকে ডেকে পাঠালো। বললো—কাচ্চাবাচ্চা সবাইকে নিয়ে এসো। সবাই কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে হাজির হল এবং সবাই তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলো।

শেষে এক পেঁচা এল,—বিনীতভাবে, মন্থরপদে। বললো —মহারাজ, যদি সুন্দর চেহারা আর বিনীত আচরণের জন্য কাউকে পুরস্কৃত করতে হয়,

তা'হলে, আমার সন্তানদের দিকেই আপনার করুণাদৃষ্টি পড়বে—নিশ্চয়ই! আমার বাচ্চারা ঠিক ওদের মায়ের মতো দেখতে।

সভায় যারা ছিল, পেঁচার কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। তারপর—পরের প্রার্থীকে ডাক দেওয়া হল।

সৈনিক ও দস্যু ॥ ২৩৬ ॥

দুজন সৈনিক এক দস্যুকে আক্রমণ করেছিল; কিন্তু একজন সৈনিক ভয়ে পালিয়ে গেল। পরে অবশ্য অপর সৈনিক ঘোরতর যুদ্ধ করে দস্যুকে নিহত করে। তখন সেই কাপুরুষ সৈনিকটি ফিরে এসে, তার তরোয়াল বার করে—পোশাক ছুঁড়ে ফেলে, চীৎকার করে বললো,– এইবার! এইবার বোঝ কার সঙ্গে লড়াই করতে নেমেছিলে!

অন্য সৈনিক বললো,—অন্ততঃপক্ষে আমার পেছনে দাঁড়িয়ে তখন এই কথাগুলোই যদি বলতে, তা'হলে—তোমার সেই কথাগুলোকেই সত্যি ভেবে, আরো বেশী উৎসাহ পেতাম, আরো বেশী সাহস পেতাম। এখন —তরোয়াল বন্ধ কর, আর ঐ জিভের বড়াই দেখিও না।

যারা তোমাকে জানে না, তাদের কাছে তুমি বড়াই করে বাহাদুরি নিতে পার, কিন্তু আমি তো স্বচক্ষে দেখেছি,—কত জোরে তুমি দৌড়ে পালাতে পার! তাতেই এই শিক্ষা পেয়েছি যে, তোমাকে তো বিশ্বাস করাই যায় না,– এবং তোমার সাহস তার চেয়েও অধম।

দেবরক্ষিত সাইমনিদেস ॥ ২৩৭ ॥

সাহিত্য মানুষের কাছে কত প্রিয়, তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি; সাহিত্য দেবতাদের কাছেও যে কত প্রিয়,—তারই বিবরণ এবারে দেওয়া হচ্ছে।

সাইমনিদেস একবার এক প্রায় অখ্যাত কুস্তিগির সম্পর্কে—যে হঠাৎ পুরস্কার লাভ করেছিল—এক ছন্দোবদ্ধ এবং প্রশংসাপূর্ণ কবিতা রচনা করতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন।

বিষয়-বস্তু অকিঞ্চিৎকর বলে, সাইমনিদেসের কল্পনা জাগরিত হচ্ছে

পারেনি; তাই তাঁকে এক সাধারণ রীতি মেনে চলতে হয় এবং তিনি কুস্তির আখড়ার দুজন দেবতার গুণ-বর্ণনাকে প্রাধান্য দেন।

কবিতা শেষ করার পর তাঁকে মাত্র চুক্তির এক-তৃতীয়াংশ অর্থ দেওয়া হয়। বাকী অর্থ চাইলে তাঁকে বলা হয়, "বাকী অর্থ স্বর্গের সেই দেবতাদের কাছেই পাওয়া যাবে, যাঁদের প্রশংসায় কবিতার দুই-তৃতীয়াংশই ভরা। এবং পাছে তাঁরা ভাবেন যে, তোমাকে মোটেই সমাদর করা হয়নি, তাই— তোমাকে আমার বাড়ীর ভোজে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি; আমার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে তুমিও হবে একজন।"

সাইমনিদেস যদিও অপমানিত বোধ করছিলেন, তবু তিনি তা প্রকাশ না করে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে তিনি তাঁর আসন গ্রহণ করলেন। আয়োজনের ক্রুটি ছিল না এবং ভোজসভাটি বেশ উৎসবমুখর ছিল।

হঠাৎ অপূর্বসুন্দর চেহারার দুজন লোক ঘর্মাক্তকলেবরে এবং ধূলি-ধূসরিত হয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে, ভৃত্যকে আদেশ করলো, সাইমনি-দেসকে ডেকে দেবার জন্য। বললো,—খুব জরুরী কথা আছে, ওঁকে এই মুহূর্তে আসতে বল।

ভৃত্যটি হতভম্ব হয়ে গেল। তবুও, ওদের আদেশ পালন করলো সে।

সাইমনিদেস ভোজকক্ষ থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘরটি হঠাৎ ভেঙে পড়লো এবং উপস্থিত সবাই মারা গেল।

সেই সুন্দর তরুণদের এর পর আর দেখা যায়নি এবং লোকের বিশ্বাস যে, স্বর্গ থেকে সেই দুজন দেবতাই এসেছিলেন; এসে সাইমনিদেসকে তাঁরা পাওনা দুই-তৃতীয়াংশ মুদ্রার বিনিময়ে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন।

ময়ূর এবং সারস ॥ ২৩৮ ॥

এক ময়ূর এবং এক সারস একত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ, ময়ূর তার পেখম মেলে, সারসকে বললো,—দেখাও দেখি তোমার পাখার বাহার।

সারস তখন অনেক উঁচুতে উঠে উড়তে উড়তে বললো,—"ওঠ দেখি

আকাশের এত উঁচুতে।—তোমার যে পাখার এত বড়াই করছো, দেখতে সুন্দর হলেও আসলে সেগুলি কোন কাজেরই নয়।"

এক লোভাতুর ও এক ঈর্ষ্যাতুর ॥ ২৩৯ ॥

এক লোভাতুর এবং এক ঈর্ষ্যাতুর ব্যক্তি দুজনেই জিউসের কাছে প্রার্থনা জানালো—তাদেব আকাঙ্ক্ষা যেন পূর্ণ করা হয়। জিউস অ্যাপোলোর মারফৎ বলে পাঠালেন যে, ওদের সব আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হবে, কিন্তু—এক ব্যক্তি যা চাইবে, আর ব্যক্তি না-চাইলেও তার দ্বিগুণ পাবে। লোভাতুর ব্যক্তি এমনিতে দরিদ্র; তাই একের পর এক খুশিমত জিনিস প্রার্থনা করলো—; কিন্তু—প্রতিবারেই দেখলো যে, ঈর্ষ্যাতুর ব্যক্তি একই বস্তু তার দ্বিগুণ পেয়ে যাচ্ছে।

এর পর ঈর্ষ্যাতুরের পালা। সে প্রার্থনা করলো, তার একটা চোখ যেন নষ্ট হয়ে যায়। তা'হলে ওর সঙ্গীর দু'টো চোখই নষ্ট হয়ে যাবে।

এক গেঁয়োলোক ও বাজপাখি ॥ ২৪০ ॥

এক গ্রাম্য কৃষক একবার হঠাৎ এক বাজপাখিকে ধরে ফেলে; বাজপাখিটি তখন এক পায়রাকে ধরবার জন্য তাড়া করেছিল। বাজ বললো—মশাই, আমি তো আপনার কোন ক্ষতি করিনি, আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন। কৃষক বললো—তাই নাকি; তা'হলে ঐ পায়রাটাই বা তোমার কি ক্ষতি করেছিল? তোমার নিজের কথাই তোমার মৃত্যুর পক্ষে যথেষ্ট।

[অপরের কাছে যেমন ব্যবহার আশা করেন, তেমনি ব্যবহার তাদের সঙ্গেও করুন।]

ষাঁড় এবং ইঁদুর ॥ ২৪১ ॥

এক ইঁদুর একবার এক ষাঁড়ের পায়ে কামড়ে দেয় এবং তারপরেই নিজের গর্তের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। ষাঁড় তো রেগে আগুন। মাটি খুঁড়ে গুঁতো মেরে সে তার শত্রুকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো, কিন্তু ইঁদুরের সাক্ষাৎ পেল না। ষাঁড় যখন রেগে প্রায় উন্মাদ, তখন ইঁদুর তার গর্তের ভেতর থেকে উঁকি দিয়ে হেসে হেসে বলতে লাগলো,—তোমার দেমাকের কোন

মানে হয় না। এক বেচারা ইঁদুর তোমার সঙ্গে এমন চালাকি খেলেছে যে, তুমি একেবারে অসহায় হয়ে পড়েছ!

কৃষক এবং ডিমেটার ॥ ২৪২ ॥

এক কৃষক একবার ডিমেটারের কাছে এই অভিযোগ করলো যে, শস্যের শিষে লম্বা লম্বা দাড়ি থাকার ফলে যারা শস্য বুনছে এবং কাটছে, তাদের আঙুল কেটে যাচ্ছে। তাই প্রার্থনা করলো যে, শস্যের সঙ্গে লম্বা লম্বা কাঁটার মতো দাড়ি যেন না থাকে। ওব প্রার্থনা পূর্ণ হল; কিন্তু পাখিরা তারপর থেকে অনায়াসে সব শস্যই খেয়ে ফেলতো।

কৃষকটি তখন বললো,—সত্যি, কি মূর্খ আমি! আমার চাকর-বাকরদের আঙুল বাঁচাতে গিয়ে আমিই অনাহারে মরবো!

গ্রাম্য ব্যক্তি ও নদী ॥ ২৪৩ ॥

এক গ্রাম্য লোক নদী পাব হবার জন্য,—নদীর যে অংশটায় হেঁটে পার হওয়া যাবে, সেই অংশটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করছিল।

পরে, বললো,—নদীব যে অংশে জল খুব শান্তভাবে বইছে, সেই জায়গাটা গভীর, আর যেখানে শব্দ হচ্ছে, সেই জায়গাটাই অগভীর।

[যাব মাথায় কিছু নেই, তারই বাগাড়ম্বর বেশী।]

সিন্দুকের ইঁদুর ॥ ২৪৪ ॥

এক ইঁদুরের জন্ম হয়েছিল সিন্দুকের মধ্যে। বাড়ীর মেয়েরা সেখানে যে সব জিনিসপত্র রাখতো, তাই খেয়েই সে বড় হচ্ছিল। একদিন সে হঠাৎ লাফিয়ে বাইরে চলে আসতে পারলো। তারপর যখন সেখানে ফিরে যাবার চেষ্টা করছিল, তখন হঠাৎ কিছু খাদ্যদ্রব্যের ওপর তার দৃষ্টি পড়ে। সেই খাদ্য সামান্য একটুখানি চেখে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে চেঁচিয়ে উঠে বললো,—ইস্—কী মূর্খই ছিলাম আমি; সিন্দুকের বাইরে আর কোন সুখের স্থান থাকতে পারে, এ-কথা কোন দিনই ভাবিনি।

মোটা এবং রোগাটে মোরগ ॥ ২৪৫ ॥

এক ছোট্ট খোঁয়াড়ে একগাদা মোরগ ঘুরে বেড়াত। কতকগুলো বেশ মোটাসোটা এবং কতকগুলো খুবই রোগাটে—গায়ে মাংস নেই

বললেও হয়। মোটা মোরগগুলো রোগাটে মোরগদের দেখে ব্যঙ্গ করে দুর্ভিক্ষপীড়িত বলে হাসলো। একদিন পাচকের কাছে নির্দেশ গেল, কয়েকটা সুপুষ্ট মোরগ রান্না করে ভোজের জন্য তৈরি করে রাখতে।

এর পরে অবশ্য মোটা মোরগগুলো তাদের মত বদলেছিল।

চাতক এবং মাকড়শা ॥ ২৪৬ ॥

এক চাতক উড়ে উড়ে মাছি ধরছিল। এক মাকড়শা তা লক্ষ্য করলো। তারপর বললো,—কি আশ্চর্য! এ যে আমার রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ। এই বলে সে চাতক পাখি ধরবার জন্য জাল বুনতে বসলো। কিন্তু চাতকগুলো জাল ছিঁড়ে, জালসহ অনায়াসে পালাতে পারত। তখন মাকড়শা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো,—না, পাখি ধরা বোধ হয় আমার কাজের মধ্যে পড়ে না। এই বলে সে আবার মাছি ধরার জন্য জাল তৈরি করতে বসলো।

মাছ ও পশু ॥ ২৪৭ ॥

একবার সব পশু, পাখিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য মাছদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করলো এবং তারপরেই যুদ্ধ ঘোষিত হল। কিন্তু মাছরা কোন সৈন্যবাহিনী না পাঠিয়ে বলে পাঠালো যে, তারা ডাঙায় কুচ-কাওয়াজ করতে পারবে না।

রাজহংস ও বক ॥ ২৪৮ ॥

এক বক, মুমূর্ষু রাজহংসের শেষ গান শুনছিল। শুনতে শুনতে বললে,—"এ সময়ে গান করার মতো অর্থহীন ব্যাপার আর হয় না। কিন্তু কেনই বা গান কর তুমি?"

রাজহংস বললো,—আঃ, আমি সেখানেই যাচ্ছি, যেখানে কোন তীর আর আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। কোন খাঁচা আর আমাকে আবদ্ধ রাখতে পারবে না; কোন ক্ষুধাই আমাকে আর পীড়িত করবে না। এমন মুক্তিতে কার না আনন্দ হয় বল!